গহিন হৃদয়

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

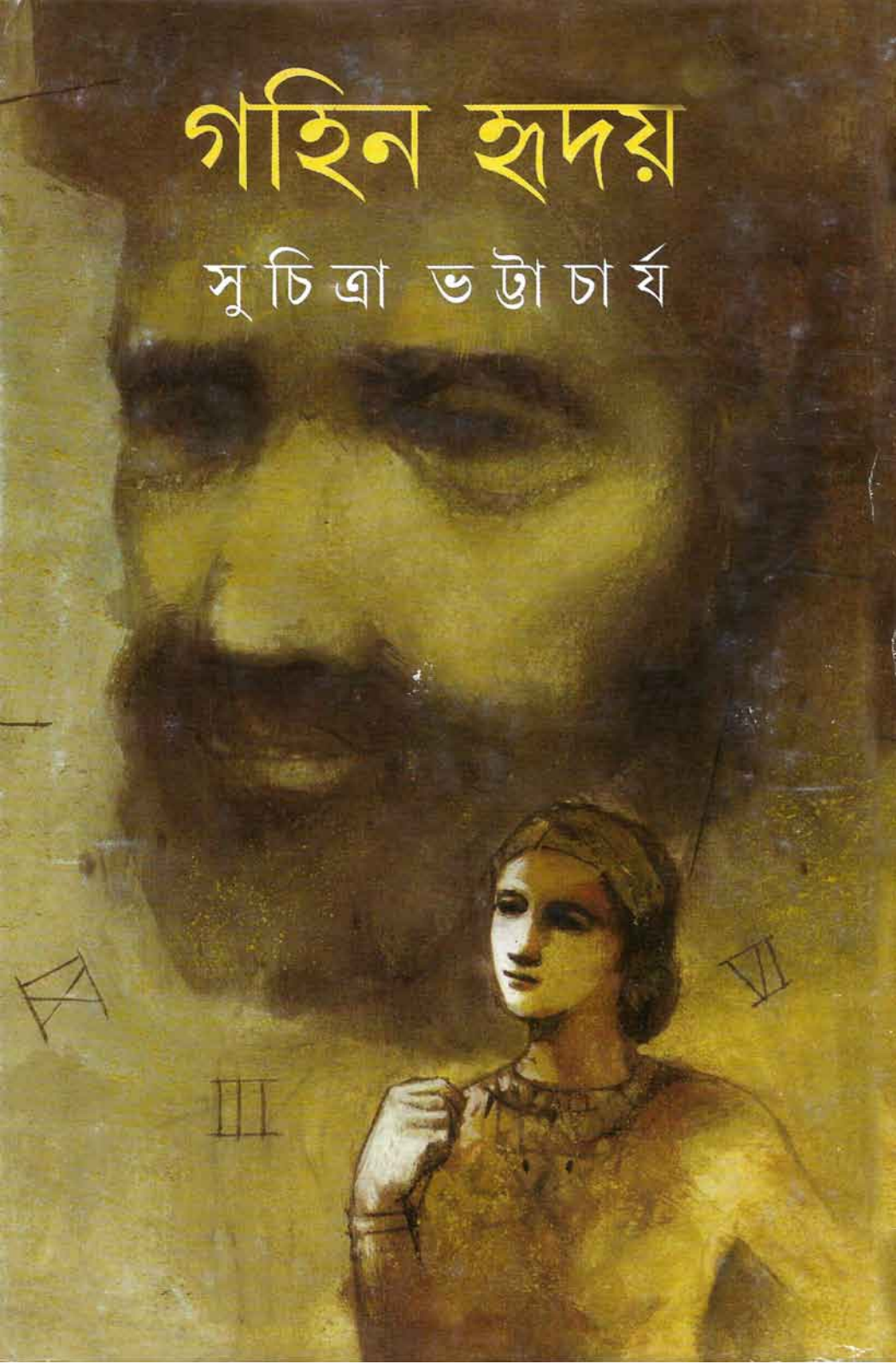

বিদেশে বিয়ে ভেঙে যায় অনুপমের। মেয়ে লীনার অধিকার পায় তার মা। দেশে ফিরে আসে অনুপম। অধ্যাপনা শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ে। অনুপমের বন্ধু ভাস্করের স্ত্রী সোহিনীর সঙ্গে ক্রমে গড়ে ওঠে তার বিশেষ অন্তরঙ্গতা। একসময় তারা সিদ্ধান্ত নেয় একত্রে বাকি জীবন কাটাবার। দাম্পত্য জীবনে তিতিবিরক্ত সোহিনী ভাস্করকে জানিয়ে দিতে চায়, সে পাপানকে নিয়ে চলে যাবে এবার। ঠিক এই সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে ভাস্কর। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা যায়, ভাস্কর ক্যানসারে আক্রান্ত। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে সোহিনীর। অনুপম তাকে আশ্বস্ত করে। মরণাপন্ন ভাস্করের ব্যয়বহুল চিকিৎসা-পর্বে দায়িত্বশীল স্ত্রী-র ভূমিকায় জড়িয়ে পড়ে সোহিনী। কী হবে সোহিনী-অনুপমের সম্পর্ক? ভাস্করের মৃত্যু কি কোনও মুক্তি আনবে ক্লান্ত-বিধ্বস্ত সোহিনীর জীবনে? সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'গহিন হৃদয়' উপন্যাসে মৃত্যুর গহিন গন্ধ ছায়া ফেলে আছে সম্পর্ক-জটিল হৃদয়ের ওপর।

১৫০.০০

ISBN 978-81-7756-973-5

গহিন হৃদয়

গহিন হৃদয়

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

আনন্দ

সদ্যপ্রয়াত জেঠিমা
অন্নপূর্ণা দেবীর স্মৃতির উদ্দেশে

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই

অর্ধেক আকাশ
অন্য বসন্ত
আঁধারবেলা
আয়নামহল
আলোছায়া
উড়ো মেঘ, অলীক সুখ
কাচের দেওয়াল
কাছের মানুষ
গভীর অসুখ
চার দেওয়াল
ছেঁড়াতার
জলছবি
দশটি উপন্যাস
দহন
নীলঘূর্ণি
পরবাস
পালাবার পথ নেই
ভাঙনকাল
ময়না তদন্ত (গল্প)
রঙিন পৃথিবী
রূপকথা নয়
হেমন্তের পাখি

দরজা থেকে অনুপমকে দেখছিল সোহিনী। অপলক চোখে। ঈষৎ ঝুঁকে থাকা ওই দেহকাণ্ড, চওড়া কাঁধ, রুপোর কুচি মেশানো একমাথা ঘন চুল, তাকে যেন চুম্বকের মতো টানছিল। খাটে বসে কী যেন লেখালিখি করছে অনুপম, ল্যাপটপে আঙুল চলছে দ্রুত লয়ে। সোহিনী মাত্র কয়েক হাত তফাতে দাঁড়িয়ে, অথচ অনুপম এখনও টেরই পেল না! ওই নিমগ্নতাও কম সম্মোহক নয়। অজান্তেই দুর্বল হয়ে আসে পা, কাঁপন জাগে দেহে।

আশ্চর্য, ভাস্করকে তো সে কত রূপে দেখেছে। ঘরোয়া ভাস্কর, দলের মাঝে ভাস্কর, সুটেড-বুটেড ভাস্কর, কেজো ভাস্কর, নিরাবরণ ভাস্কর...কখনও কি সোহিনীর এ হেন আলোড়ন জেগেছে?

সোহিনী ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল। কেন এই মানুষটা আগে তার জীবনে আসেনি? কেন সে এতগুলো বছর নষ্ট করল ভাস্করের সংসারে?

একটা মাত্র নিশ্বাসের অভিঘাতেই বুঝি ঘরের ভারসাম্য টলে গেল। অনুপমের হাত থেমেছে, একটু যেন আনমনা সহসা। ল্যাপটপ বন্ধ করল, চশমা খুলে রগড়াচ্ছে দু'চোখ। হাত দু'খানা মাথার পিছনে একত্র করে বার কয়েক চাপ দিল ঘাড়ে। পা টানটান হল, মাথা উঠছে, নামছে হেলছে ডাইনে বাঁয়ে। দৃশ্য বটে একখানা।

আচমকাই ঘুরে তাকিয়েছে অনুপম। কপালে নরম বিস্ময়, কখন এলে? বেল বাজাওনি তো?

সোহিনী ভ্রূভঙ্গি করল, চাবিটা তা হলে রেখেছি কেন মশাই? একা একা কী করো দেখব বলেই তো?

কী দেখলে?

উঁহু, দেখিনি তো কিছু। বুঝলাম।

কী?

মুনিঋষিদের ধ্যান ভাঙানোটা ঠিক নয়। পাপ হয়।

দারুণ একখানা সার্টিফিকেট দিলে তো! অনুপম ঘুরে বসল। খাটের

বাইরে পা ঝুলিয়ে লম্বা শ্বাস টানল। মুচকি হেসে বলল, ধ্যান আমার আগেই ভেঙেছে। কোত্থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে আসছিল, উৎসটা ধরতে পারছিলাম না। কী করে বুঝব, এ তোমারই স্মেল!

শুনতে মজাই লাগল সোহিনীর। অফিস থেকে বেরোনোর মুখে সদ্য কেনা পারফিউমটা ছড়িয়েছিল গায়ে, অটোরিকশায় ঠাসাঠাসিতেও সুবাস যায়নি তা হলে! নাহ্, আড়াই হাজার টাকা খরচটা বৃথা হয়নি।

মুখে অবশ্য খুশিটুকু ফুটতে দিল না সোহিনী। ঠাট্টার সুরে বলল, আমার গন্ধ তা হলে এখনও তুমি চেনো না?

চেনার কোনও শেষ নাই সখি। চিনিতে চিনিতে জীবন যায়।

খুব যে ডায়ালগের বহর!...মনোযোগ দিয়ে কী করছিলে শুনি?

বক্সে একগাদা ই-মেল জমেছিল। চেক করে করে জবাব দিচ্ছিলাম।

তোমার মেয়ের মেল এল?

কই আর। লীনা বোধহয় আমায় ভুলেই গেছে।

তুমি তাকে লিখেছ?

আজকেও একটা পাঠালাম। দেখি কবে মেয়ে রিপ্লাই দেয়। অনুপমের মুখে পলকা ছায়া পড়েও মিলিয়ে গেল। পূর্ণ চোখে দেখছে সোহিনীকে। একটু যেন উৎকণ্ঠা নিয়েই বলল, তোমার মুখচোখ এত কালো দেখাচ্ছে কেন? অফিসে খুব ধকল যাচ্ছে বুঝি?

কিছুই কি অনুপমের দৃষ্টি এড়ায় না? সোহিনীর শ্রান্তি যেন জুড়িয়ে গেল। ভালবাসার জনের কাছে এটুকুই তো আশা করে মানুষ।

রঙ্গ করার সুরে সোহিনী চোখ পাকিয়ে বলল, আমার তো তোমার মতো আরামের জীবন নয় স্যার। গ্যারাজ থেকে এসি গাড়িটি বার করে হুস ইউনিভার্সিটি, একটা-দুটো ক্লাস নিয়ে ব্যাক টু নিজের গুহা...

ফর ইয়োর ইনফর্মেশন, আজ আমার ডে অফ। বিছানা থেকে নামল অনুপম। কাছে এসে সোহিনীর গালে টোকা দিয়ে বলল, সারাদিনই আজ গড়াগড়ি খাচ্ছি।

জানি, জানি। আজ তো তোমার সুখই সুখ। অনুপমের কাঁধে আলগা চাপড় দিল সোহিনী। ভুরু বেঁকিয়ে বলল, আমাদের রীতিমতো খেটে খেতে হয়, বুঝলে।

ব্যাঙ্কের চাকরি তো মোটামুটি আয়েশের কাজ বলেই জানি।

ক্যাশ কাউন্টারে বসতে হলে ওই বাক্যটি মুখ দিয়ে বেরোত না মশাই।

আজকাল কাউন্টার থেকে কেউ টাকা তোলে নাকি? সবাই তো এটিএম-এই...

বুড়োগুলো ব্যাঙ্কেই ভিড় জমায়। যা জ্বালায় না এক-এক জন! কেউ হয়তো বড় নোট নেবে না, কারও আবার ছোট নোটে অরুচি...

উম, বুঝলাম। অনুপম আরও ঘন হল। সোহিনীর কাঁধে হাত রেখে বলল, বুড়োরা তোমার সব এনার্জি নিংড়ে নিয়েছে। এখন এই আধবুড়োর হাতের এক কাপ গরম কফি দরকার।

অনুপমের স্পর্শে সোহিনীর শরীর ঝনঝন। ব্যাগখানা ছুড়ে দিল বিছানায়। জড়িয়ে ধরেছে অনুপমের গলা। গাঢ় স্বরে বলল, শুধু কফি?

এ প্রশ্নের উত্তর শব্দে হয় না। অনুপমের ঠোঁট নেমে এল সোহিনীতে। দু'জোড়া ওষ্ঠ শুষে নিচ্ছে পরস্পরকে। তীব্র আশ্লেষে অনুপমের বুকে মুখ ঘষল সোহিনী। সর্বাঙ্গে অনুভব করছে পুরুষালি চাপ, রমণীয় হ্লাদে যেন গলে যাচ্ছে হাড়পাঁজরা।

অনুপমই আস্তে আস্তে সরাল নিজেকে। সোহিনীর নাকে নাক ঘষে বলল, শুধু আদর খেলে কি পেট ভরবে?

উমম।

স্যান্ডুইচ বানিয়ে দেব?

উমম।

পাগলামি করে না, ছাড়ো। কফির জলটা বসাই।

চটি গলিয়ে অনুপম রান্নাঘরে। সোহিনী স্খলিত পায়ে বিছানায়। বসেও হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প। এখনও শরীর জুড়ে কী তাপ! রক্তকণিকারা ছোটাছুটি করছে শিরা উপশিরায়।

উত্তেজনা সংযত করার চেষ্টা করল সোহিনী। ধমকাল নিজেকে। সাঁইত্রিশ বছর বয়স হল, এখন কি আর কচি খুকিদের মতো উদ্দাম প্রেম তাকে মানায়? কিন্তু করবেই বা কী? এই নিরালা...অনুপমের মতো এক মায়াবী পুরুষ...মাথার ঠিক থাকে না যে। নিষিদ্ধ প্রণয়ের রোমাঞ্চ কি পুলকের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়?

বেডরুমখানা কিঞ্চিৎ এলোমেলো হয়ে আছে। সোহিনী শুয়ে পড়ল খাটে। প্রকাণ্ড ইংলিশ খাট, ছত্রি লাগানো, অনুপমের ঠাকুরদার আমলের।

শিকাগো থেকে পাকাপাকি চলে এসে বাড়ির একতলার এই পিছন ভাগটা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে অনুপম, সঙ্গে কিছু সাবেকি আসবাব। যেটি যেমন দশায় ছিল, প্রায় তেমনই রেখেছে। ঘরদোরের এই পুরনো চেহারাটাই বুঝি অনুপমের বেশি প্রিয়। সোহিনীরও বেশ লাগে। শুধু অনুপমকে নয়, শুধু অনুপমের শয্যাটিকে নয়, আলোছায়া মাখা অনুপমের বাসস্থানটিকেও সে যেন ভালবেসে ফেলেছে। চোখ বুজে সোহিনী বলে দিতে পারে এ বাড়ির খুঁটিনাটি। কড়িবরগাওয়ালা এই বিশাল কক্ষটির কোথায় কাঠের আলমারি, কোথায় ড্রেসিংটেবিল, কোথায় দেরাজ, নীল কাচের ঢাকনা পরানো বাহারি টেবিল ল্যাম্পটিই বা কোথায়, কিংবা পাশের ঘরের শোকেসে ক'খানা চিনেমাটির পুতুল সাজানো, দেওয়ালে কার কার ছবি ঝুলছে, সোহিনীর সব মুখস্থ। অভিজাত অস্ট্রিয়ান পিয়ানো, চওড়া প্যাসেজে ল্যাজারাসের খাওয়ার টেবিল, ইটালিয়ান কাচের রঙিন শার্সি, জানলার খড়খড়ি, দরজার খিল, ছোট-বড় পেন্টিং, পিছনের এজমালি জমিটায় আপন খেয়ালে বেড়ে ওঠা কামিনী গাছ—প্রতিটি এখন সোহিনীর অতি চেনা। পাপানকে নিয়ে সে এবার পাকাপাকি চলে আসবে এখানে, ভাবলেই যেন গায়ে কাঁটা দেয়।

দু'হাত বিছানায় ছড়িয়ে দিল সোহিনী। হ্যাঁ, পাপান তার মায়ের কাছেই থাকবে। ভাস্করের মতো ছ্যাবলা, আত্মসুখপরায়ণ লোকের হাতে মোটেই সে ছেলেকে ছাড়বে না। প্রয়োজনে লড়বে আদালতে, দাঁতে দাঁত চেপে।

কিন্তু পাপানের এ বাড়ি ভাল লাগবে তো? আছে তো ফ্ল্যাটের দশ বাই বারো কামরায়। এত বড় বড় ঘর তো পাপানের অপছন্দ হওয়ার কথা নয়। অনুপমের সঙ্গেও তার যথেষ্ট দোস্তি। স্টোরি বুক, গেমস কিনে নিয়ে যায় বলে অনুপম আঙ্কলকে দেখামাত্র চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পাপানের। তবু তাকে বাবা হিসেবে মেনে নেওয়া...! নয় পুরে দশে পড়বে ছেলে, এখনই অনেক ব্যাপারে তার মতামত তৈরি হয়েছে। সুতরাং...। বোঝাতে হবে, বোঝাতে হবে। তা ছাড়া মাকে ছেড়ে পাপান থাকতেই পারবে না।

এরকম ভাবনায় একধরনের ছটফটানি আছে। সোহিনী ব্যাগ খুলে মোবাইল বার করল। বাড়ির নম্বর টিপছে। কে ধরবে ফোন? ঠাকুমা? না নাতি?

যাক, নাতিরই গলা, হ্যালো?

কী করছ বাবু?

টিভি দেখছি।

নিশ্চয়ই সিআইডি?

একটু আগে খুলেছি মা।

উফ, সারাক্ষণ ওই এক সিরিয়াল। কখন পড়তে বসা হবে, শুনি?

আর পাঁচ মিনিট।

আমাকে যেন আবার তাড়া লাগাতে না হয়।...বিকেলে আজ কী করলি?

রাজিদের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম। স্ক্র্যাব্‌ল্ খেলতে।

ফোন ঠাম্মা কোথায়?

বোধহয় ঘরে। পুজো করছে।

মুখমামাসি বিকেলে এসেছিল?

বোধহয়।

কিছু খবর রাখিস না। বলতে বলতে সোহিনী দেখল অনুপম ট্রে নিয়ে ঢুকছে। ইশারায় মিল্কপটটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, কফিতে দুধ দেবে কিনা। ঘাড় নেড়ে সায় দিল সোহিনী। এক আঙুলে চিনির পরিমাণ দেখিয়ে ফের ছেলেকে বলল, সময় নষ্ট কোরো না কিন্তু। পটাপট হোমওয়ার্ক সেরে ফেলো। আমি গিয়ে চেক করব।

তুমি কখন ফিরছ মা?

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে।

একটা ড্রাই পেপার কিনে এনো। কাল স্কুলে লাগবে।

এতক্ষণে সেটা মনে পড়ল? ঠিক আছে। ছাড়ছি।

মোবাইল বন্ধ করে সোহিনী অনুযোগের সুরে বলল, পাপানটা মহা বিচ্ছু হয়েছে। পড়তে বসাতে ঘাম ছুটে যায়।

কফি মগে চামচ নাড়ছিল অনুপম। হেসে বলল, সবে তো ক্লাস ফোর, এখনই এত প্রেশার তৈরি করছ কেন?

নইলে ছেলে আরও পেয়ে বসবে। ঠাম্মাকে তো ট্যাঁকে গোঁজে। কাজের কাজ তো তিনি কিছুই করেন না, সারাক্ষণ নাতিকে মাথায় তুলে নাচছেন! আর বাবার তো হুঁশই নেই। তিনি থাকেন নিজের জগতে। ...কাউকে না কাউকে তো নজরদারির ভারটা নিতেই হয়।

বটে? অনুপম ট্রে-টা এগিয়ে দিল, নাও, স্টার্ট করো। পেটে কিছু না পড়লে মাথা আরও গরম হবে।

ভারী পরিপাটি ভাবে স্যান্ডুইচ বানিয়েছে অনুপম। পাতলা পাঁউরুটির ধার সযত্নে ছাঁটা, ভেতরে মেয়নিজের আস্তরণ, মাঝখানে পুরু হ্যাম। সোহিনী হাক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলে ভাস্কর তার সামনে এভাবে খাবার ধরছে...স্বপ্নেও ভাবা যায়? হাহ্, ভাস্করের এসব বোধই নেই। এখানেই অনুপমের সঙ্গে তার বিরাট তফাত। অনুপমের মধ্যে যে-সংবেদনশীলতা আছে, ভাস্করের সেটা তৈরিই হয়নি। সোহিনীর ভাল লাগা, মন্দ লাগা নিয়ে কোনওদিন মাথা ঘামিয়েছে ভাস্কর?

একখানা স্যান্ডুইচ তুলে কামড় বসাল সোহিনী। হঠাৎই হাসছে ফিকফিক।

অনুপম কফিতে চুমুক দিচ্ছিল। ভুরু নাচিয়ে বলল, কী হল?

তোমার মেমবউটা কী বুদ্ধু গো! এমন গৃহকর্মনিপুণ বরকেও ছেড়ে চলে গেল?

ধুৎ, বিদেশে এসব কোনও গুণই নয়। সবাইকে ওখানে কাজ করতে হয়। না পারলে শিখে নেয়।

তুমি কি বলতে চাও, বাইরে-টাইরে থাকলে ভাস্করও শিখত? অসম্ভব। এক গ্লাস জল পর্যন্ত যে ঢেলে খায় না, সে কিনা ঢুকবে রান্নাঘরে! যদি বা দায়ে পড়ে করতেও হত, দেশে ফিরে ওমনি স্বমূর্তি ধরত। গরগর করত মেল ইগোয়।

যাহ্, তুমি কিন্তু ভাস্করের একটু বেশিই নিন্দে করছ। অনুপম চোখ টিপল, আরে বাবা, বাড়ির অ্যাটমসফিয়ারের ওপরও তো অনেক কিছু নির্ভর করে, না কী? মাসিমা মাটির মানুষ, উনি কখনও ছেলেকে দিয়ে...

বন্ধুর হয়ে সাফাই গেয়ো না তো। ওর নেচারটাই ওরকম। তোমার মধ্যে ফিলিংস বলে একটা ব্যাপার আছে, ভাস্করের সেটি এগজিস্টই করে না। এক এক সময়ে তো রীতিমতো নিষ্ঠুর মনে হয়। ভাবতে পারবে না...প্রচণ্ড মাথা ধরেছে, অফিস থেকে ফিরে শুয়ে পড়েছি...বাবু ঢুকে একবার দেখলেন, শুনলেন প্রবলেমটা...তারপরেই উপদেশ, কড়া করে এক কাপ চা বানিয়ে খাও, মাইগ্রেন-টাইগ্রেন পড়পড়িয়ে পালাবে! আর হ্যাঁ, আমার জন্যও এক কাপ বানিয়ো! কফি শেষ করে পোরসেলিনের সুদৃশ্য মগখানা নামাল সোহিনী। ঠোঁটের কোল আলগা মুছে নিয়ে ফের বলল, কত শোনাব! এবার শীতে...জানুয়ারির শেষে যে বিচ্ছিরি ঠান্ডাটা পড়ল...একদিন ভোরবেলা

কাজের মেয়েটা কলিংবেল বাজাচ্ছে...বাবুর ঘুম ভেঙে গেছে, আমি তখনও ঘোর নিদায়...আমাকে ঠেলে তুলে বলল, দরজাটা খুলে দিয়ে এসো না...!

ভাস্করটা চিরকালই একটু আয়েশি টাইপ। হস্টেলে তো ওর ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে দিতে হত। অনুপম মিটিমিটি হাসছে, তবে সত্যি বলতে কী, অ্যাভারেজ বাঙালি ছেলেই তো এই গোত্রের।

কথাটা তেমন পছন্দ হল না সোহিনীর। এখন সে ভাস্করকে ত্যাগ করার জোরালো কিছু কারণ খুঁজছে বলেই হয়তো। এবং এই দোষত্রুটিগুলোই তো সেই যুক্তি, যার ওপর ভিত্তি করে তার আশু পদক্ষেপটি নৈতিক বৈধতা পায়। অন্তত তার নিজের কাছে। একটা সম্পর্ক ছেঁড়ার ক্ষেত্রে এর মূল্য নেহাত কম নয়।

ভেতরে ভেতরে সোহিনী যেন তেতেই গেল একটু। গুমগুমে গলায় বলল, আমি কিচ্ছু শুনতে চাই না। আমি আর ওকে বরদাস্ত করতে পারছি না, ব্যস।

সেটাই বলো। যাকে সহ্য করতে পারছ না, তার সঙ্গে আর থাকবে না, এটাই তো যথেষ্ট।

এ কথাটাও সোহিনীর যেন হজম হল না। কেন যেন মনে হল, তার যুক্তি আবার প্রমাণ হওয়ায় অনুপমের কাছে সে বুঝি একটু ছোট হয়ে গেল। নাকি নিজের কাছেই?

সোহিনীর খারাপ লাগাটুকু বোধহয় টের পেয়েছে অনুপম। ট্রেখানা মেঝেতে নামিয়ে সোহিনীর গা ঘেঁষে বসল। কপালে ছোট্ট চুমু খেয়ে বলল, আমিও তো কিছু শুনতে চাই না। আমারও তো তোমাকে চাই, ব্যস।

যেন এইটুকুনিরই প্রতীক্ষায় ছিল সোহিনী। নাকের পাটা ফুলে উঠল, গরম হতে কান, ফের জাগছে শরীর। নিপুণ হাতে সোহিনীকে উন্মোচিত করল অনুপম। কামিজ সালোয়ার ব্রা প্যান্টি সরে গেল বিছানায় প্রান্তে। অনুপমও নগ্ন এখন। শুইয়ে দিয়েছে সোহিনীকে, সর্বাঙ্গ তার ভরিয়ে দিচ্ছে চুমুতে চুমুতে। নারীপুরুষ মাতল আদিম খেলায়।

রমণ শেষে শুয়ে আছে ক্লান্ত অনুপম। সোহিনী উঠে বসল। অনুপমের চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলল, অ্যাই, এবার তো আমায় যেতে হয়।

চোখ বুজে অনুপম বলল, থেকে যেতে পারো না?

আসব গো আসব। এবার একেবারেই চলে আসব।

কবে?

একটু তো সময় লাগবে। সোহিনী নামল বিছানা ছেড়ে। পোশাক পরতে পরতে বলল, আইনি ফ্যাকড়াগুলো আগে কাটিয়ে নিই।

অনুপম পাশ ফিরল। নেশা নেশা চোখে দেখছিল সোহিনীকে। ঈষৎ জড়ানো গলায় বলল, দুটো প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ একসঙ্গে থাকবে...এর মধ্যে আবার আইনকে টানার দরকার কী?

বা রে, পাপান আছে না!

হুম। তা তোমার কোন ল'ইয়ার বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করবে বলেছিলে...কী হল?

ও নেই। রিলেটিভের বিয়েতে দিল্লি গেছে। নেক্সট উইকে ফিরলেই মিট করব। সম্ভবত জুডিশিয়াল সেপারেশনই সাজেস্ট করবে। বাই মিউচুয়াল কনসেন্ট।

ভাস্কর রাজি হবে?

কী জানি! গড়বড় করলে তো মুশকিল। বেরিয়ে এসে ডিভোর্সের মামলা ঠুকতে হবে তখন। তারও তো প্রচুর হ্যাঙ্গাম। সলিড গ্রাউন্ড লাগবে...

কীসের গ্রাউন্ড? একজন আর একজনের সঙ্গে থাকবে না, এটাই তো সাফিশিয়েন্ট। শুধু এটুকু বলেই তো মারিয়া আমার সঙ্গে কাটান-ছেঁড়ান করে নিল।

এটা আমেরিকা নয় মশাই, দেশটার নাম ভারতবর্ষ। এবং হিন্দু বিবাহ অতি সনাতন প্রতিষ্ঠান। একে ভাঙা অত সহজ নয়।

কথাটা ছুড়ে দিয়ে সোহিনী সোজা বাথরুমে। রান্নাঘর, আর এই লাগোয়া বাথরুমটাই যা এ বাড়িতে আধুনিক। নতুন টাইলস-ফাইলস লাগিয়ে, হাল ফ্যাশানের সরঞ্জামে রীতিমতো ঝাঁ-চকচকে। বেসিনের আয়নায় সোহিনী দেখল নিজেকে। খুব বেশি ধ্বস্ত লাগছে না তো? কেশদাম যথেষ্ট অবিন্যস্ত, আঙুল চালিয়ে ঠিকঠাক করল। মুখে-ঘাড়ে জল ছেটাল অল্প, রডে ঝুলন্ত অনুপমের তোয়ালেতে মুছল চেপে চেপে। বুঝি বা নতুন করে মেখে নিল অনুপমের ঘ্রাণ।

বেরিয়ে দেখল, পাজামা-পাঞ্জাবি চড়িয়ে সিগারেট ধরিয়েছে অনুপম। নেশা নেই, ইচ্ছে হলে খায় দু'-একটা। তামাকের ওই কটু গন্ধটা এ বাড়িতে সোহিনীর উপরি পাওনা। কেমন একটা আবেশ জাগে যেন।

জোরে নাক টেনে সোহিনী ব্যাগ কাঁধে তুলল, আজ তা হলে চলি?

অনুপম কী যেন ভাবছিল। মাথা সামান্য ঝাঁকিয়ে বলল, চলি বলতে নেই। বলো, আসি।

সোহিনী হেসে বলল, বেশ, তাই।

বাড়ির বাইরে পা রেখে অভ্যেস মতো একবার ঊর্ধ্বপানে ঘাড় ঘোরাল সোহিনী। সামনের দিকের দোতলা তিনতলা অনুপমের জেঠতুতো দাদাদের। গ্যারেজ বাদে একতলার বাকিটাও। আর অনুপমের মাথার ওপর তার বড়দা-মেজদার অধিষ্ঠান। সোহিনী এলেই অনেকগুলো মুখ উঁকিঝুঁকি দেয় এদিক ওদিক থেকে। বিশেষত, অনুপমের ফুলবউদির তো অসীম কৌতূহল। দোতলার বারান্দা বেয়ে প্রায় ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ে। আজ বাঁচোয়া, বউদিটি অলিন্দে নেই।

ফাল্গুন প্রায় ফুরিয়ে এল। দিনমানে রোদ বেশ চড়া, তবে সন্ধে থেকে চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে। শুকনো শুকনো, মিঠে বাতাস। হাঁটতে হাঁটতে সোহিনী বাস স্টপে এল। আটটা বেজে গেছে, ট্যাক্সি ধরে নেবে নাকি? তা কলকাতায় ঠিকঠাক ট্যাক্সি মেলা তো প্রায় ঈশ্বরপ্রাপ্তির সমতুল, শেষমেশ মিনিবাসেই উঠতে হল। কপাল খুব মন্দ নয় আজ, ড্রাইভারের পাশের টানা সিটটায় জায়গাও মিলে গেছে।

সামনের কাচে চোখ রেখে আবার অনুপমকেই ভাবছিল সোহিনী। কী যে হয়েছে তার, ওই একটা মানুষই তাকে দখল করে থাকে সারাক্ষণ। অথচ মাত্র বছর দুয়েক আগেও অনুপমের তেমন কোনও অস্তিত্ব ছিল না তার কাছে। প্রথম দর্শনেও প্রেম-টেম কিছু জাগেনি। ভাস্করের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বন্ধু, আমেরিকা গিয়ে মেম বিয়ে করে থিতু হয়েছিল, বউয়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পর এখন কলকাতায়, মাঝেসাঝে বন্ধুর ফ্ল্যাটে গল্পগুজব করতে আসে—ব্যস, সম্পর্ক তো ছিল এইটুকুই। গত বছরের গোড়ার দিকে অনুপমের মা মারা গেলেন, তখনই বুঝি মানুষটার জন্য একটু একটু মায়া জেগেছিল। শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন করতে এসে চুপ মেরে বসে, কাছা-টাছা নেয়নি তবু চেহারাটা ভারী শুকনো দেখায়, চুল উসকোখুসকো, না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি...! দুই দাদা থাকা সত্ত্বেও ফস করে শ্বাস ফেলে বলেছিল, এবার আমি সত্যিই একদম একা হয়ে গেলাম!

বাক্যটা এক অচিন অনুরণন সৃষ্টি করেছিল সোহিনীর বুকে। সেদিনের মায়াই কি দিনে দিনে বদলে গেল ভালবাসায়? সোহিনীর চোখে বোধহয়

কোনও আমন্ত্রণের ইঙ্গিত ছিল, এরপর অনুপম যখন-তখন চলে আসত তাদের ফ্ল্যাটে। ভাস্কর নেই তো কী, সোহিনীর সঙ্গে গোটা সন্ধে বকবক করছে। রাতে খেয়েও যায় কোনও কোনও দিন।

তারপর হঠাৎই এক দুপুরে অফিসে হানা। ছুটি হতে তখন ঢের বাকি, ঠায় বসে রইল অনুপম। সোহিনীর সঙ্গে নাকি জরুরি কথা আছে!

নাহ্, কথাটা এখনও জমাই রয়েছে। বলার প্রয়োজনই বা কী, যখন এমন এক উজ্জ্বল পুরুষের জন্য সোহিনীও তৃষ্ণার্ত ছিল এতকাল! ভাস্কর এত সাধারণ, এত বেশি ম্যাড়মেড়ে!

আপন মনে হাসল সোহিনী। জীবন যে কখন কোন বাঁকে মোড় নেয়!

বাস থেকে নেমে সামান্য হাঁটা। জোরে পা চালিয়ে সোজা তিনতলার ফ্ল্যাটের দরজায় এসে একটুক্ষণ দাঁড়াল সোহিনী। তারপর বেল বাজাচ্ছে। একবার... দু'বার...তিনবার...! ব্যাপারখানা কী?

অবশেষে সাড়া মিলল। ভাস্কর দরজা খুলেছে। পরনে হাঁটুঝুল শর্টস, ঊর্ধ্বাঙ্গ যথারীতি অনাবৃত। লোমশ বুকে থাবা ঘষতে ঘষতে বলল, আজ এত লেট?

লোকটাকে দেখামাত্র সোহিনীর অন্তরাত্মা খিঁচড়ে গেল। ঢুকে চটি ছেড়ে বলল, কান দুটো কি একেবারেই গেছে?

পাপান খুলবে ভাবছিলাম। ব্যাটা এমন ঝুল দিল...বেরোলই না। ফের সোফায় গিয়ে পজিশন নিয়েছে ভাস্কর। দৃষ্টি দেওয়ালে টাঙানো বড়সড় এলসিডি-তে। রিমোট হাতে নিয়ে বলল, মেজাজ আজ সপ্তমে কেন? ইয়ার এন্ডিং-এর বাম্বু শুরু হয়েছে বুঝি?

সোহিনী অপ্রসন্ন মুখে একবার দেখল টিভিটা। ফুটবল চলছে। গম্ভীর মুখে বলল, পাপান কী করছে? হোমটাস্ক শেষ?

বইখাতা নিয়ে তো বসেছিল। মাঝে শুধু ঘ্যানঘ্যান করছিল, মা এখনও চার্টপেপার নিয়ে এল না...

এমা, সোহিনী তো বেমালুম ভুলে গেছে! আত্মহারা থাকার ফল? নিজের দুর্বলতা ঢাকতেই বুঝি সোহিনী ঝেঁঝে উঠল, তুমি তো বসে আছ, এনে দিলেই পারতে!

ধুস, একবার বাড়িতে বডি ফেলে দিলে আর বেরোতে ইচ্ছে করে! যা থকে যাচ্ছি আজকাল, ওফ।

রান্নার অভাব নেই! সোহিনী কথা না বাড়িয়ে ঘরে গেল। ঘড়ি-টড়ি খুলে ছেলের কামরায় উঁকি দিয়েই চক্ষু স্থির। দ্যাখো কাণ্ড, স্টাডিটেবিলে বই খাতা পেনসিল বক্স-ইরেজার ছত্রাকার, ওদিকে পাপান নিজের খাটটিতে চিতপাত! এখন ওই ছেলেকে ঠেলে ঠেলে জাগানো কি সহজ কাজ? কালকের বইটইগুলো গুছিয়ে দিতে হবে স্কুল ব্যাগে, তারপর টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে বসানো... কম হ্যাপা!

গমগমে মুখে সোহিনী ডাইনিং স্পেসে এল। ফ্রিজ খুলে দেখছে কী কী রান্না হয়েছে। মুরগির মাংসর পাত্রখানা রাখল টেবিলে। কাচের বাটিতে খানিকটা তুলে ঢোকাল মাইক্রোওভেনে। কাজের তালে তালে উচ্চগ্রামে গজগজ চলছে, এটা কি একটা বাড়ি? একজন হাত-পা ছড়িয়ে খেলায় মশগুল, আর একজন সিরিয়াল গিলছেন...এদিকে যে ছেলেটা না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, সেদিকে কারও হুঁশ আছে! সবার মুখের ডগায় সব কিছু জুটে যায় তো...!

তিন যথাস্থানে বিঁধেছে। বনানী বেরিয়ে এসেছে নিজের ঘর থেকে। সন্ত্রস্ত স্বরে বলল, অমন রাগারাগি করছ কেন? কী হল?

আপনাদের আক্কেলটা দেখছি। আপনার ছেলে নয় নড়ে বসে না, আপনি তো একটু নজর রাখতে পারেন। নাতিকে নিয়ে এত সোহাগ...ছেলেটা রাতে উপোস করলে আপনার ভাল লাগবে?

পাপান শুয়ে পড়ল নাকি? এমা, ছি ছি।...তুমি জামাকাপড় বদলে নাও, আমি দেখছি।

পাঁজাকোলা করে তুলে আনব? ওদিক থেকে ভাস্করের গলা উড়ে এল, না উঠলে মাথায় জল ঢেলে দিচ্ছি।

নিজে যা নিয়ে আছ, থাকো। বাড়াবাড়ি করতে হবে না।

ঝামটা মেরে সোহিনী ফের ঘরে। একটু বসল বিছানায়। দিনকে দিন ভাস্কর যেন আরও বিরক্তিকর হয়ে উঠছে। লোকটার হ্যাহ্যা হিহি, চাষাড়ে বোলচাল, সহ্যসীমার বাইরে ক্রমশ। কবে যে সে ভাস্করের কবল থেকে মুক্তি পাবে?

নাহ্, খোলাখুলি কথা হয়ে যাওয়া দরকার। আজই বলবে? শুনে কী প্রতিক্রিয়া হবে ভাস্করের? হাত-পা ছুড়বে রাগে? ষাঁড়ের মতো চিল্লাবে? এগুলো প্রত্যাশিত, কিন্তু যদি চুপসে যায়? যদি দুম করে কান্নাকাটি জোড়ে?

হাতে-পায়ে ধরে বলে, যেয়ো না সোহিনী, আমি নিজেকে শুধরে নেব? তুমি যেমনটি চাও, তেমনটিই হয়ে উঠব?

ভাবনার বিষয়। ওরকম কোনও পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তো আর এক বিপদ। সোহিনী অবশ্য ভালমতোই জানে, সাত জন্ম চেষ্টা করলেও ভাস্করের পক্ষে অনুপম হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও পাপানকে নিয়ে তখনই বেরিয়ে যাওয়া কি কঠিন হয়ে পড়বে না?

ধুৎ, উলটোপালটা চিন্তাকে বড্ড বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছে সোহিনী। সিদ্ধান্ত যখন নিয়েছে, চলে সে যাবেই। অনুপমকে তার চাই। চাইই।

নাইটি নিয়ে সোহিনী বাথরুমে ঢুকল। গরম তেমন নেই, তবু গায়ে একটু জল ঢালতে ইচ্ছে করছে। নিজেকে নিরাবরণ করে দেখল খানিকক্ষণ। দেহে তার মেদ জমেনি সেভাবে, যতটুকু আছে তাতে পুরুষের চোখে এখনও সে ঘোরতর আকর্ষণীয়। তার মসৃণ ত্বক, যথেষ্ট আঁটোসাঁটো বুক, কদলীকাণ্ডসদৃশ ঊরু, নয়নের মদিরতা, পাতলা পাতলা ঠোঁট, যে-কোনও তরুণীর চেয়ে কম মোহনীয় নয়। এই শরীরটাকেও কি সেভাবে মর্যাদা দেয় ভাস্কর? দিয়েছে কোনওদিন? নিজের ভোগটুকু সারা, তো ওমনি ভোঁস ভোঁস নাকডাকা শুরু। সোহিনী তৃপ্ত হল কি হল না, ভাবেইনি কখনও। শুধু এই অপরাধেই তো স্বচ্ছন্দে ভাস্করকে পরিত্যাগ করা যায়, নয় কি?

রাতে খেয়েদেয়ে টিভির সামনে বসল সোহিনী। দেখছে না কিছুই, ঘুরছে এ চ্যানেল, ও চ্যানেল। মনে মনে সাজাচ্ছিল, কীভাবে পাড়া যায় কথাটা। আজ কি ভাসিয়ে দেবে আলগাভাবে? তারপর আস্তে আস্তে ভাঙবে? নাকি যা হয় হোক, একবারেই...?

টিভি বন্ধ করে অন্যমনস্ক পায়ে সোহিনী ঘরে এল। লাইট নিভিয়ে শুয়ে পড়েছিল ভাস্কর, খটাস করে জ্বেলেছে বাতি।

সঙ্গে সঙ্গে ভাস্করের গলা, আহ্, আলো ভাল্লাগছে না। ঘাড়ে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।

হঠাৎ? সোহিনী ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ভাস্করকে, এতক্ষণ তো দিব্যি ছিলে।

কী জানি, খাওয়ার পর থেকেই...

আরও বসে বসে টিভি দ্যাখো!

টিভির জন্য নয়। মনে হচ্ছে সেই স্পন্ডিলাইটিসের ব্যথাটা...

এক্সারসাইজ না করলে তো বাড়বেই।

জ্বালা মেরো না তো। ভাস্কর কপাল টিপে ধরল, কোনও পেনকিলার আছে কিনা দ্যাখো। মনে হচ্ছে এখনই মরে যাব।

উঁহু, আমার কি সেই কপাল হবে! বলতে গিয়েও সামলে নিল সোহিনী। ড্রয়ার খুলে ওষুধের বাক্সটা বার করল বিরস মুখে।

দুই

ড্রাফটটা ড্রয়িংখানা টেবিলে ছড়ানো। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিদ্যুৎ সরবরাহ পদ্ধতিতে নতুন কিছু সংযোজন ঘটবে, তারই নকশা। বারোটায় চিফ ইঞ্জিনিয়ারের ঘরে মিটিং, পরিকল্পনাটা নিয়ে নিজস্ব মতামত জানাতে হবে সেখানে।

ঝুঁকে নকশাটা পর্যবেক্ষণ করছিল ভাস্কর, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। হঠাৎই টের পেল ব্যথাটা ফিরে আসছে। ঘাড়ের ওপর দিকটায় সেই বিশ্রী টনটনানি, মাথা জুড়ে সেই অসহ্য ঝিমঝিম।

হচ্ছেটা কী? ব্যথাটা এভাবে জ্বালাচ্ছে কেন? ভাস্কর রীতিমতো বিরক্ত হল। কাল রাতের ওষুধে দিব্যি উবে গিয়েছিল, সুন্দর ঘুম হল...। সকালে অবশ্য বেশ ভার ছিল মাথাটায়। তা এই সিজন চেঞ্জের সময়ে তো এমনটা হয়ই। তা ছাড়া সোহিনীর গরম বেশি, সারারাত ফুলস্পিডে পাখা চলে, পরিণামে প্রভাতী মাথাধরাটা যেন নিত্যনৈমিত্তিক। ওই নিয়েই তো খানিক গাঁইগুঁই করে বাজার গেল ভাস্কর। তারপর থেকে তো মোটামুটি স্বাভাবিক। নিয়মমাফিক স্নান, খাওয়া, সোহিনীর প্রায় পিছন পিছন অফিস বেরোনো... তেমন কোনও সমস্যা তো ছিল না! এখন আবার একটা দরকারি কাজের সময়ে...! কী যে এক মেয়েলি রোগে ধরল, কথায় কথায় মাথাব্যথা!

সোজা হয়ে ঘাড়টাকে এদিক-ওদিক ঘোরাল ভাস্কর। চিড়িক চিড়িক লাগছে ব্রহ্মতালুতে। ওষুধ খেয়ে নেবে? ইস, কেন যে কালকের ট্যাবলেট একটাও সঙ্গে রাখেনি? বদ্‌রিকে দিয়ে অবশ্য আনানো যায়। আধা সরকারি অফিসের গ্রুপ ডি স্টাফরা আজকাল কথাই শোনে না, ভাস্করের কপাল ভাল, তার অধস্তনটি বেশ বাধ্য। বয়স্ক লোক তো, ওপরওয়ালাকে অমান্য করার অভ্যেসটুকু রপ্ত করতে পারেনি।

বেল বাজাতেই বদ্‌রিপ্রসাদ হাজির। খসখস ওষুধের নাম লিখে চিরকুট বাড়িয়ে দিল ভাস্কর, চটপট একপাতা নিয়ে এসো তো।

চোখের খানিক তফাতে রেখে কাগজটা পড়ল বদ্‌রি। চোখ কুঁচকে বলল, ফির মাথাব্যথা?

হুঁ।

এত অ্যালোপ্যাথি দাওয়াই খাবেন না স্যার। কমবে, ফির আসবে, পুরা সারবে না। আমি একটা তেল এনে দেব, সাতদিন মালিশ করবেন। ব্যস, জিন্দেগিভর দর্দ গায়েব।

আপাতত এটা তো আনো। নইলে মাথাটা ফেটেই যাবে।

বদ্‌রি যেতে রগ দুটো টিপে বসে রইল ভাস্কর। যন্ত্রণায় গা গুলোচ্ছে। বমিটমি হবে নাকি? চোরা অম্বল টম্বল ধরেনি তো? সেরকম তেলমশলাদার কিছু তো খায়নি আজ। সকালে তো স্রেফ ডাল, আলুসেদ্ধ, মাছের ঝোল। ক'দিন ধরে আড়মাছ খেতে খুব ইচ্ছে করছিল। সোহিনী নাক সিঁটকোয় বলে আজও কাটাপোনা। সুষমার হাতের ট্যালটেলে মাছের ঝোলে ভাস্কর চ্যাটার্জির অম্লশূল?

নিজেকে অন্যমনস্ক রাখতে ভাস্কর আবার ড্রয়িং-এ চোখ রাখল। নাহ্, সম্ভব নয়, কিছুই ঢুকছে না ঘিলুতে। বদ্‌রি ফিরতেই টপাটপ দু'খানা পেনকিলার গিলে নিল। চোখ বুজে বসে রইল চেয়ারে। মিনিট পনেরো পর আস্তে আস্তে ছাড়ছে মাথা। গা-গুলোনো ভাব কমল যেন। আহ্, ঘাড়ের টনটনানিও অনেক কম। বেশ নির্ভার লাগছে নিজেকে।

আবার বদ্‌রির শরণাপন্ন হল ভাস্কর, এক কাপ চা খাওয়াবে?

ক্যান্টিনে বলে দিয়েছি স্যার। এখনই দিয়ে যাবে।

সত্যি বদ্‌রি, তোমার জবাব নেই। তুমি রিটায়ার করলে আমার যে কী হবে!

ছোটখাটো চেহারার পাকানো গোঁফ বদ্‌রিপ্রসাদ লজ্জা পেয়েছে। ঘাড় নামিয়ে বলল, এখনই তো রিটায়ার হচ্ছি না স্যার। এখনও চার বছর বাকি।

জানে ভাস্কর, তবু হেসে ফেলল। দেখেই মালুম হয় বদ্‌রির বয়স ছেষট্টি-সাতষট্টির কম নয়। বদ্‌রির নাতিরই তো গত বছর বিয়ে হল। চাকরিতে ঢোকার জন্য কত যে জল মিশিয়েছিল বয়সে! কম করে বছর দশেক।

ভাবতে গিয়ে ভাস্কর উদাস সহসা। জল কে না মেশায়? বদ্‌রির তো

শুধু বয়স, ভাস্করদের মতো মানুষদের জীবনটাই তো ভেজালে ভরা। সুখে ভেজাল, দুঃখে ভেজাল, ভালবাসায় ভেজাল, ঘেন্নাতেও ভেজাল। দুনিয়ায় কোথাও কিছু নির্ভেজাল আছে কি?

ভাস্কর আপন মনে মাথা দোলাল। মাত্র দু'খানা ব্যথা নিরোধকের কী গুণ! ভাস্কর চ্যাটার্জিও কিনা দার্শনিক বনে গেল!

চা এসেছে। কাপে চুমুক দিয়ে ভাস্কর ফের কাজে মনোযোগী। স্বচ্ছ মস্তিষ্কে নিরীক্ষণ করছে নকশাখানা। গ্রিড লাইন টানায় বেশ কিছু অসংগতি চোখে পড়ছে, পয়েন্টগুলো সংক্ষেপে নোট করল ডায়েরিতে। মিটিং-এ দেখাতে হবে।

মোবাইল বাজছে। বাড়ির ফোন। ভাস্কর সেটটা কানে চাপল, হ্যাঁ, বলো?

ওপারে বনানীর গলা, আজ টিফিন নিয়ে যেতে ভুলে গেছিস রে বাবুন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। বাক্স তো দেখছি রান্নাঘরে পড়ে।...সুষমারও কী আক্কেল, হাতে ধরিয়ে দিতে পারত।

অফিসের দ্বিপ্রাহরিক জলযোগটি বনানীই বানায় রোজ। ছেলে, ছেলের বউ, আর নাতির। সকালে প্রায় একসঙ্গে তিনজনের বেরোনোর তাড়া, সুষমা ছোটাছুটি করে সামাল দিতে পারে না। তাই পছন্দমতো টিফিন তৈরির দায়িত্ব বনানীরই। এবং হাতে হাতে তুলে দেওয়ারও। বেচারা মা নিজের ত্রুটি সুষমার ঘাড়ে চাপাতে চাইছে!

ভাস্কর বেশ মজাই পেল। হেসে বলল, তা আজ কী মিস করলাম শুনি?

পরোটা-আলুচচ্চড়ি ছিল। সঙ্গে সন্দেশ।

বাহেহে, গ্রেট লস্। রেখে দাও; গিয়ে খাব।

তুই আজ তা হলে ক্যান্টিনেই চালিয়ে নিস।

হুম।

খাস কিন্তু। ক'দিন ধরেই তো দুর্বল দুর্বল লাগছে বলছিস...খালি পেটে থাকিস না।

ঠিক আছে। আর কিছু বলবে?

ওপ্রান্তে বনানী ক্ষণকাল চুপ। ভাস্কর বুঝে গেল, এখনও মা'র কথা ফুরোয়নি। ঈষৎ তাড়া লাগাল, কী হল ঝেড়ে কাশো।

একটু বেহালায় যাব ভাবছিলাম...

দিদির বাড়ি?

হ্যাঁ রে। ভাবছি ক'টা দিন খুকুর ওখানে কাটিয়ে আসি।

হঠাৎ এ হেন মনোবাসনা? তুমি তো ঘাঁটি ছেড়ে নড়তেই চাও না!

না মানে...খুকু অনেকদিন ধরে বলছে...বনানীর স্বরে ইতস্তত ভাব, চিন্তা করিস না, পাপানের ব্যবস্থা করেছি। সুষমা এখন ক'টা দিন তাড়াতাড়ি আসবে। পাপান স্কুল থেকে ফেরার আগেই। থেকেও যাবে, তোরা কেউ একজন না ফেরা পর্যন্ত।

বটে?...তা সোহিনীকে জানিয়েছ?

ওপ্রান্ত আবার নীরব। জবাবটা বুঝে গেল ভাস্কর। হেসে বলল, অল রাইট। আজই যাচ্ছ?

হ্যাঁ। যদি খেয়ে উঠে রওনা দিই...! তুই একটু ম্যানেজ করে নিস, কেমন?

ফোন ছেড়ে একটুক্ষণ ঠোঁট ছুঁচলো করে বসে রইল ভাস্কর। সোহিনীর ব্যবহারে আহত হয়েই কি মা...? কাল রাতে খুব বিচ্ছিরি ভঙ্গিতে মাকে কথা শোনাচ্ছিল সোহিনী। মা যতই শান্ত হোক, চুপচাপ থাকুক, ভাস্করের মতো মোটাচামড়া তো নয়। সোহিনী যেন কেমন হয়ে গেছে ইদানীং। বড্ড বেশি খিটখিটে। পান থেকে চুন খসলে মেজাজ। অবশ্য বরাবরই তো একটু নাক উঁচু। বিয়ের পর যখন চারু মার্কেটের ভাড়াবাড়িতে এসে উঠল, তখনই বেশ অস্বচ্ছন্দ যেন। ভাস্করদের বাড়ির পরিবেশ, জীবনযাপনের ধারা, এমনকী ভাস্করের বাবা-মাকেও একটু হেলাফেলার চোখে দেখত সোহিনী। যেন শোভাবাজারের গাঙ্গুলি বাড়ির শান্তিনিকেতনে পড়া মেয়ে চ্যাটার্জি-পরিবারের বউ হয়ে সবাইকে ধন্য করে দিয়েছে, এমনই এক হাবভাব। তার ওপর চাকরি করে বলে আলাদা একটা গুমোরও ছিল যেন। মুখে কখনও প্রকাশ করেনি, তবে ঠিকঠাক খেয়াল করলে বোঝা যেত।

ভাস্করকেও কি পছন্দ হয়েছিল সোহিনীর? ধন্দ আছে। হানিমুনটাই তো কেমন কেমন কেটেছিল। তারা দার্জিলিং গেছিল, কত সুন্দর জায়গা, চমৎকার চমৎকার বেড়ানোর স্পট...হোটেল ছেড়ে সোহিনী নড়তেই চায় না! জানলা দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখাতেই তার নাকি বেশি আনন্দ! তাও টেনে টেনে টাইগার হিল নিয়ে গেছে ভাস্কর, জোর করে ঘুম-সোনাদা ঘুরিয়েছে। খুশি

তো হয়নি, উলটে হোটেলে ফিরে অনুযোগ, আমরা হানিমুনে এসেছি, না রুটিন ভ্রমণে? এত ভিড়ভাট্টা, লোকে হাঁ করে নতুন কাপল্ দেখছে...আমার ভালো লাগে না। রুচিতে বাধে।

তারপর থেকে তো অভ্যেসই হয়ে গেল খুঁত ধরা। শব্দ করে খাও কেন! খাকখাক হাসো কেন! খকখক কাশো কেন! বিকট আওয়াজ মেরে তুড়ি বাজিয়ে হাই তোলো কেন! অফিস পিকনিকে গিয়ে অমন ভালগার জোক্স শোনাচ্ছিলে কেন! আমার কলিগদের সঙ্গে চ্যাংড়ামি মারছিলে কেন! একটু ভালো কালারের জামা পরতে পারো না? আমার জন্য এই ক্যাটকেটে-রং শাড়ি আনলে?

যাক গে যাক, এভাবেই বারোটা বছর কেটে তো গেল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটুও অমিল না থাকলে বেঁচে থাকাটাই তো আলুনি হয়ে যায়। সোহিনী যেরকম, থাক না সেরকমই। ভাস্কর থাকুক ভাস্করের মতো। একটাই আফশোস, সোহিনী যদি ভাস্করের মা-বাবা সম্পর্কে একটু বুঝদার হত। নিজে পছন্দ করে সোহিনীকে ছেলের বউ করে এনেছিল বাবা। পুত্রবধূ চাকরি-বাকরি ছেড়ে শ্বশুরসেবা করবে, এমন দুরাশা করেনি কখনও। তবু চাইত সোহিনী দু'দণ্ড কাছে বসুক, দু'-চারটে গল্পগাছা করুক...তা পুত্রবধূটি কোনওদিন তাকে পাত্তাই দিল না। সোহিনী আসার পর কতদিনই বা বেঁচে ছিল বাবা? বছর তিনেক। তার মধ্যে অর্ধেক দিন সোহিনী তো বাপের বাড়িতে। আর মা? সে তো ভিতুর ডিম। প্রথম থেকেই বউয়ের সামনে জোড়হস্ত। এই যে এখন বউয়ের ওপর অভিমানে ছুটছে মেয়ের বাড়ি, জোর গলায় সেটি উচ্চারণ করারও সাহস আছে নাকি?

কী ব্যাপার চ্যাটার্জি? তুমিও শেষে অফিসে ঢুলছ, অ্যাঁ?

চমকে সিধে হল ভাস্কর। তুহিন বেরা। বয়সে ভাস্করের চেয়ে সামান্য বড়, তবে পদমর্যাদায় সমান। ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার।

মাথা ঝাঁকিয়ে ভাস্কর বলল, না না, চিন্তা করছিলাম।

চিন্তা? তোমার?

বাহ, আমার বুঝি চিন্তা থাকতে নেই?

কী নিয়ে ভাববে, বলো? টাকা? আস্ত ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারই তো তোমার ঘরে মজুত।

হা হা, বেড়ে বলেছ তো! সকালে সোহিনীর নিমপাতা খাওয়া মুখখানা

পলকের জন্য মনে পড়ল ভাস্করের, পলকে মুছেও ফেলেছে ছবিটা। ভুরু নাচিয়ে বলল, কফি চলবে?

দরকারটা কী! মিটিং-এ তো বার দুই গিলতেই হবে। মুখোমুখি বসল তুহিন, ডিস্ট্রিবিউশনের প্ল্যানটা দেখলে?

মোটামুটি চোখ বুলিয়েছি। বহুত ভুলভাল আছে। ঘাড়টাকে অল্প নাড়িয়ে নিল ভাস্কর। তারপর চোখ টিপে বলল, আচ্ছা, এইসব মিটিং টিটিং করে সত্যিই কি কোনও লাভ হয়?

আজকাল তো এই সিস্টেমই চলছে ব্রাদার। অনেকগুলো মাথা একত্র হয়ে মতামত দিলে সিদ্ধান্ত নাকি অনেক গণতান্ত্রিক হয়। তা ছাড়া নতুন নতুন আইডিয়া তো মেলে।

ঘোড়ার মাথা। আসলে এ হল দায়িত্ব এড়ানোর একটা কৌশল। কিংবা ভুলচুকের দায়টাকে সকলের ঘাড়েই খানিকটা করে চাপিয়ে দেওয়ার ট্যাকটিক্স।

তা কেন, আজ যে মিটিংটা হচ্ছে...

এটার হয়তো প্রয়োজন আছে।...তবে দেখছি তো, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ডিসিশন আগেই নেওয়া থাকে, মিটিং ডেকে শুধু একগাদা লোককে ছুঁইয়ে রাখা হয়। টু সেভ ওন হেড। কিংবা বলতে পারো, গোটা প্রসেসটা লিংগার করার এটা একটা তরিকা।

দিস ইজ ইয়োর ভিউ। অথরিটি মে ডিফার।

অথরিটি দেখিয়ো না। আজকাল যা সব কারণে কর্তারা মিটিং ডাকছে...! যেমন ধরো, আমাদের প্ল্যান্ট ওভারহলিং। পাওয়ার সেক্টরের শিশুরাও জানে, ওটি একটি রুটিন জব। বছরে একবার প্ল্যান্ট শাট-ডাউন করে বয়লার, কুলিং টাওয়ার, টারবাইন, বাগারা বাগারা থরো চের-আপ করতে হবে। এ ব্যাপারে জিএম অর্ডার ইস্যু করবে, ইঞ্জিনিয়াররা লোকলশকর নিয়ে ফিল্ডে নেমে পড়বে, এই তো নিয়ম। এর মধ্যে এত মিটিং আসে কোত্থেকে? আবার ঘাড়টাকে ওপর-নীচ ডাইনে-বাঁয়ে করল ভাস্কর। খানিকটা বুঝি অজান্তেই। ফের বলল, এরপর দেখব টয়লেট কেন পরিষ্কার নেই, তার জন্য মিটিং! পিছনের আমগাছে কেন বোল এল না...!

তুমি ঘাড়টাকে বারবার ওরকম করছ কেন বলো তো? তুহিনের ভুরুতে ভাঁজ, স্টিফ নেকের প্রবলেম?

বুঝতে পারছি না। তবে ভোগাচ্ছে মাঝে মাঝে। মাথাটাও ঝিনঝিন করছে।

প্রেশার চেক করিয়েছ?

অফিসেই করিয়েছিলাম। মাস দেড়েক আগে। নরমাল।

চোখ? চালশে পড়ার বয়সে একটু প্রবলেম হয় কিন্তু।

না না, আই-সাইট ঠিকই আছে। কাগজ-টাগজ তো এখনও দিব্যি পড়ি। একসময়ে স্পন্ডিলাইটিস মতন ছিল, বোধহয় ওটাই আবার চাগাড় দিচ্ছে।

খুব বাজে রোগ। নো দাওয়াই। একমাত্র সলিউশন বাবা বামদেব।

ওই দেড়েল সাধুটা? টিভিতে যে নানা কসরত দেখায়?

অত ক্যাসুয়াল রিমার্ক কোরো না চ্যাটার্জি। হি ইজ আ জেম অফ যোগা থেরাপিস্ট। ওঁর নির্দেশ মতো দাঁতে দাঁত ঘষে আমার কনস্টিপেশন সেরে গেল।

অনেকক্ষণ পর, আজ এই প্রথম, ভাস্কর হা হা হেসে উঠল। তার অট্টহাসির সামনে একটু বুঝি মিইয়ে গেছে তুহিন। ক্ষুণ্ণ গলায় বলল, বিশ্বাস হল না তো?

ভাস্কর হাসি থামিয়েছে। দু'হাত তুলে বলল, না, না। বলছ যখন, একটা ট্রাই দেওয়া যাবে। যদি কোনও লিটারেচার থাকে তো এনো, পড়ে দেখব।

কষ্ট করে সকাল সকাল উঠে টিভি খুলো, আপনা-আপনি শিখে যাবে। তুহিন ঘড়ি দেখল, পৌনে বারোটা বাজে, এবার যাবে তো? চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বোধহয় কনফারেন্স রুমে ঢুকে পড়েছেন।

চলো।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক চলল মিটিংটা। ভাস্কর যা ভেবেছিল, তাই ঘটল অবশ্য। অজস্র কথার ফুলঝুরি, বাদানুবাদ, কিন্তু নিট ফল শূন্য। প্রত্যেকের মতামত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, এরপর ছোট্ট কমিটি পর্যালোচনা করবে সেগুলো, তারপর নতুন করে সংশোধিত আকারে ফের প্রস্তুত হবে প্ল্যান। আর যুক্তিগুলো গ্রাহ্য না হলে এটাই চলবে। যাই হোক, ব্যাপারটা নিয়ে আবার মিটিং বসছে। মাসখানেক পরে।

সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে ভাস্কর একটা বড় হাই তুলল। তুড়ি মেরে। খিদে পাচ্ছে। কাগজপত্র চেম্বারে রেখে এসেছে ক্যান্টিনে।

কাউন্টারের পাশে, ব্ল্যাকবোর্ডে খাবারের লম্বা ফিরিস্তি। আলগা চোখ

বুলিয়ে চিকেন স্টু আর টোস্টের অর্ডার দিল ভাস্কর। শরীরের গতিক সুবিধের নয়, হালকা হালকাই চলুক।

কোণের টেবিলে দেবজিৎ আর সুগত। ভাত খাচ্ছে। ভাস্কর গিয়ে বসল সেখানে, কী খবর? সব ঠিকঠাক?

চলছে একরকম। দেবজিৎ হেসে তাকাল, আপনি আজ ক্যান্টিনে যে বড়?

ফুডের কোয়ালিটি টেস্ট করতে এলাম।

খুব খারাপ হয়ে গেছে ভাস্করদা। মাছের পিস ক্রমশ ছোট হচ্ছে।

সুগত হাত চাটছিল। টুপুস ফোড়ন কাটল, আরে বাবা, ক্যান্টিনওয়ালাকেও তো লাভ করতে হবে, নাকি? অফিস সাবসিডি বাড়াবে না, বাজারদর চড়চড় বাড়ছে...

যা বলেছ। স্টান্ডার্ড সাইজের কইমাছ চারশো টাকা! হাত ছোঁয়ালে ছ্যাঁকা লাগে।

গল্পে মেতে গেল ভাস্কর। প্রশাসনিক বিভাগের এই ছেলে দুটোর সঙ্গে তার জমে বেশ। বছর দশেক আগে স্পোর্টস কোটায় চাকরি পেয়েছিল দু'জনে, তখন থেকে খাতির। অফিসের হয়ে তো খেলতই, ময়দানেও মাঝারি ফুটবল টিমের ফরোয়ার্ড ছিল দেবজিৎ, আর সুগত ডিফেন্ডার। এখন বয়স বেড়েছে, ফুটবলের পাট প্রায় শেষ, দুই মূর্তি এখন অভিযান-টভিযান করে বেড়ায় নিয়মিত।

কথায় কথায় দেবজিৎ বলল, এবার জুলাইতে ট্রেকিং-এ যাচ্ছি ভাস্করদা।

ভাস্করের টোস্ট-স্টু দিয়ে গেছে। খেতে খেতে ভাস্কর জিজ্ঞেস করল, কোথায়?

সিকিমে। নতুন একটা রুট খুলেছে। ইয়ক্সাম থেকে যেতে হয়।

কঠিন জার্নি?

গেলে বুঝব। শুনেছি ওদিকে খুব তুষারঝড়-টড় হয়। সুগত ঢকঢক জল খেল, যাবেন নাকি?

আমি? খেপেছ?

কেন নয়? আপনি তো ট্রেক করেছেন।

ধুস, জন্মের মধ্যে কর্ম, একবার বদরিনাথ থেকে কেদার। খুব একটা ঝুঁকি ছিল না...বয়সটাও তখন কম...জোশের মাথায় বন্ধুদের সঙ্গে চলে গিয়েছি।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বন্ধু?

উঁহুঁ, পুরনো পাড়ার। চারু মার্কেট।

আর একবার জয় মা বলে লড়ে যান না। খুব কাছ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে পাবেন। হিমালয়ের সেকেন্ড হাইয়েস্ট পিক্।

ভাস্করের মন ঈষৎ দুলে গেল। ওই একবার গিয়ে কী যে হয়েছিল, চোখের সামনে হিমালয় ঘুরত সারাক্ষণ। বরফের মুকুট পরা শিখর, সোনালি রোদে তুষার ঝিকমিক...কী ভীষণ যে ইচ্ছে জেগেছিল পর্বতারোহী হওয়ার! স্বপ্নটা বেশিদিন টেকেনি অবশ্য। তাদের মতো ঘরের ছেলের কী ওই সব শখশৌখিনতা মানায়? বাবা রেলের কেরানি, পিসিদের বিয়ে দিয়ে সেই যে দেনার দায়ে ডুবেছিল তার নাগপাশ থেকে তখনও মুক্ত হতে পারেনি। তার মধ্যেই দিদির বিয়ের ভাবনা করতে হচ্ছে, সঙ্গে ভাস্করের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার খরচখরচা...। পাশ করে কোনওমতে একটা চাকরিতে যুতে যাওয়া ছাড়া আর কিছু ভাবার কি ভাস্করের অবকাশ ছিল? এখন অবশ্য আর্থিক সমস্যা নেই, তার বিয়াল্লিশ বছরের শরীর যথেষ্ট সক্ষম, চূড়ায় না উঠুক, হিমালয়ের পথে পথে তো ঘোরাই যায়।

কী ভাবছেন ভাস্করদা? বউদি আপত্তি করবেন?

আরে না। ভাস্কর কৌতুক জুড়ল, ক'দিন এই থোবড়াখানা না দেখতে হলে সে বোধহয় হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

তা হলে আর কী, লোটাকম্বল নিয়ে রেডি হয়ে যান। কয়েকটা জিনিসের লিস্ট দিয়ে দেব, সেগুলো শুধু কিনে নেবেন।

আর একটা কাজ কিন্তু করা দরকার। দেবজিৎ বিজ্ঞ স্বরে বলল, হিমালয়ে যাওয়ার আগে মন থেকে পিছুটানগুলো ঝেড়ে ফেলতে হবে। যদি ওই নব-কার্তিকের মতো হন, তা হলেই গুবলেট।

কে নবকার্তিক?

ওই যে দেখুন...। তিন-টারটে টেবিল তফাতে অ্যাকাউন্টসের সজল ভৌমিকের পানে চোখের ইশারা করল দেবজিৎ। বঙ্কিম হেসে বলল, হাটের মালোপ শুঁশ নেই। অফিসে আসাটাই ওর ফাউল। সর্বক্ষণই তো কানে মোবাইল! গলায় এরকম চেন বাঁধা থাকলে হিমালয়ে এন্ট্রি নেই কিন্তু।

ভাস্কর হো হো হেসে উঠল, আমাকে কি ওইরকম মনে হয়?

না না, আপনি তো বিন্দাস। সুগত খুকখুক হাসছে। সামান্য গলা নামিয়ে

বলল, পুরনো বউয়ের সঙ্গে সজলটার এত কী গুজগুজ! ব্যাটা পরকীয়া চালায় না তো?

কে জানে! দেবজিৎ টিপ্পনী জুড়ল, ওর ডিপার্টমেন্টের লোকরা তো বলে এক ম্যারেড মহিলার সঙ্গে নাকি ওর হেভি দোস্তি। দু'জনকে যত্রতত্র দেখা যায়।

ইঙ্গিতটা এবার যেন একটু খারাপই লাগল ভাস্করের। এই কিসিমের পরচর্চা তার বিলকুল না-পসন্দ। কেউ কারওর সঙ্গে ঘুরলেই তাকে সন্দেহ করতে হবে? সোহিনী আর অনুপম তো হুটহাট থিয়েটারে যায়, শীতে দু'জনে সারা রাত মিউজিকাল কনফারেন্স শুনল...ওমনি কি ধরে নিতে হবে দু'জনের ইয়ে চলছে? যত সব উলটোপালটা ধারণা। ভাস্করের আঁতুমার্কা নাটক কিংবা কালোয়াতি গানের আসর গেলার ধৈর্য নেই, তা বলে কি অন্য কারও সঙ্গে সোহিনী যেতে পারবে না? স্বাভাবিক ব্যাপারকে বেঁকিয়ে দেখা মানুষের যে কী বদভ্যাস!

একটা বেদনা অবশ্য ভাস্করের আছে। ইস, অফিসে যদি সোহিনীর ফোন পেত এক-আধটা! কেজো নয়, অকারণ ফোন। তুহিনদের বউরা যেমন করে। ফিরছ কখন, টিফিনে কী খেলে, কী করছ...! তা বিশেষ প্রয়োজন বিনা সোহিনীর স্বর কি কদাচ বাজে মোবাইলে? কে জানে, চাকুরে বউরা হয়তো এরকমই হয়। তা ছাড়া অজস্র কাস্টমার নিয়ে কারবার, বেচারির তেমন ফুরসতই বা কোথায়।

চেটেপুটে স্টুয়ের বাটি শেষ করল ভাস্কর। দুলে দুলে ফিরছে নিজের গলতায়। প্যাসেজ ধরে হাঁটতে হাঁটতে মাথাটা যেন টলে গেল। পেটে গ্যাস-ট্যাস হল নাকি? খেতে তো দিব্যি লাগল, স্টু-টা বাসি ছিল না তো? খুবই সম্ভব। প্রাইভেট কেটারার ক্যান্টিন চালায়, দিনের ঝড়তিপড়তি মাল কি ফেলে দেয় রোজ? টোস্টের সঙ্গে ডিমসেদ্ধ আর কলা নিলেই আজ ঠিক হত।

খুঁতখুঁতুনিটুকু সরাতেই বুঝি দেবজিৎদের প্রস্তাবটা আর একবার স্মরণ করল ভাস্কর। ছুটি তো জমে জমে পচছে, ওদের সঙ্গে একবার গেলে হয়। কতকাল যে পাহাড়ে যাওয়া হয়নি। সোহিনী তো ইদানীং নড়তেই চায় না। আগে যাও বা গেছে, পাহাড় আর নৈব নৈব চ। বড়জোর কোনও সি-সাইট। সেখানেও জলে নেমে হুটোপুটিতে নেই, চুপটি করে বসে থাকবে সমুদ্রের পাড়ে। আহা রে, হিমালয়ের কোনও উপত্যকায় দলবেঁধে তাঁবু খাটিয়ে

[illegible] ভাস্কর, সন্ধেবেলা চলছে আগুন-টাগুন জ্বেলে হুল্লোড়, সকালে ফের [illegible] উতরাই, রাতে কনকনে বাতাস আর হুইস্কির গ্লাস...!

স্বপ্ন স্বপ্ন ছবিখানা চোখে নিয়ে ভাস্কর এসেছে চেম্বারে। ব্রিফকেস খুলে অ্যাপয়েন্টমেন্টের পাতাটা বার করল। দু'খানা ট্যাবলেট কচর কচর চিবিয়ে গুছিয়ে বসল কম্পিউটারের সামনে। তখনই টের পেল, ব্যথাটা আবার ফিরছে। মহা জ্বালাতন হল তো! যাবে একবার মেডিকেল অফিসারের কাছে? তিনটে বাজে, আর কি সেই মক্কেল অফিসে আছে? তা ছাড়া অমিত ডাক্তারের ওপর কি ভরসা করা যায়? পশার জমাতে পারেনি বলেই না চাকরিটা নিয়েছে! [illegible]দাকে একটা ফোন লাগাবে? দিদির বরটি আছে ওষুধ কোম্পানিতে, বহু ডাক্তারের সঙ্গে তার দহরম-মহরম। নিশ্চয়ই একটা কোনও বন্দোবস্ত করতে পারবে তরুণদা। যদি আজই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেখিয়ে নিতে পারে...

নাহ, ব্যথাটা অগ্রাহ্য করা বোধহয় উচিত হচ্ছে না। মোবাইল হাতে তুলল ভাস্কর।

ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরোতে রাতই হল। বাড়ি ঢুকতে ঢুকতে প্রায় পৌনে দশটা। ভাস্কর অন্দরে পা রাখামাত্র বিস্ফোরণ। তীক্ষ্ণ স্বরে ঝাঁঝিয়ে উঠেছে সোহিনী, আমি জানতে চাই, এভাবে আমাকে অপমান করার কী অর্থ?

খানিক আগে একখানা ওষুধ খেয়েছে ভাস্কর। মাথা এখন ঈষৎ ফুরফুরে। হেসেই বলল, হঠাৎ বোম ফাটাচ্ছ কেন ম্যাডাম?

তোমার মা তাঁর মেয়ের বাড়ি গেছেন, খবরটা কাজের লোকের মুখে জানতে হবে? বাড়ির কাউকে না জানিয়ে উনি যা ইচ্ছে তাই করবেন?

না না, মা আমাকে অফিসে ফোন করেছিল।

ও। তুমি তা হলে জানো? ক্ষণকাল থামল সোহিনী, পরক্ষণে ঝামরে উঠেছে, আমাকে ইনফর্মেশনটা দেওয়ার তুমি প্রয়োজন বোধ করোনি?

ভুল হয়ে গেছে। সরি। এমন এক শিরঃপীড়ার গাড্ডায় পড়েছি...! সারাটা দিন ভোগাচ্ছে। শেষে তো মরিয়া হয়ে...

নো গপপো। নো ফালতু টক। আই অ্যাম রিয়েলি ডিজ্‌গাস্টেড।

দেবী তো আজ জোর চটিতং! সুড়ুৎ ঘরে ঢুকে গেল ভাস্কর। শার্ট ছাড়তে ছাড়তে সতর্কভাবে গলা ওঠাল, মা'র একটু কন্যাগৃহে যাওয়ার শখ জাগতে পারে না?

যাক না। আমি কি আপত্তি করেছি?

ভাস্কর বলতে পারত, মা আজকাল পাশের ফ্ল্যাটে গেলেও তোমার গাল ফোলে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি। বলার সাহস পেল না। চুপচাপ পোশাক বদলাচ্ছে।

নীরব হয়েও নিস্তার নেই। সোহিনী দরজায় হাজির। কোমরে হাত রেখে বলল, তোমরা দু'জনে মিলে যা করছ, তাকে কিন্তু মেন্টাল টর্চারই বলে।

ওভাবে বলছ কেন? ভাস্কর সোহিনীর কাছে এল। কাঁধে সামান্য চাপ দিয়ে বলল, কুল। কুল। তোমার টেনশানের কারণটা বুঝতে পারছি। পাপান। তা মা তো সেই অ্যারেঞ্জমেন্ট করেই গেছে। সুষমা তো...

থাক। সুষমা আমায় বলেছে। কিন্তু সে যদি একদিন ডুব মারে, কী হবে, অ্যাঁ? সোহিনী ছিটকে সরে গেল, কে তখন অফিস ডুব মেরে বাড়ি সামলাবে?

আমি আছি তো। কথা দিচ্ছি, মা যদ্দিন না আসে, আমি ছুটি নেব। প্রবলেম সল্‌ভড?

এমন একখানা সমাধানের জন্য সোহিনী বুঝি প্রস্তুত ছিল না। তেরিয়া চোখে দেখছে ভাস্করকে। তারপর সরে গেছে ঘর থেকে।

ভাস্কর বাথরুমে গেল। বেরিয়ে আর অন্য দিনের মতো ড্রয়িংহলে টিভি খুলে বসল না, শুয়ে পড়েছে বিছানায়। ওষুধটায় কাজ হচ্ছে, ঘুম পাচ্ছে অল্প অল্প।

টিউব জ্বলছে ঘরে। আড়াআড়ি হাত চোখে রাখল ভাস্কর। বুক বেয়ে হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস গড়িয়ে এসেছে। তার বউটা আগে তাও খানিক নরম-সরম ছিল। যতই ক্ষোভ থাক, মুখে প্রকাশ করত কি? অন্তত এমন রণরঙ্গিনী মূর্তি তো অকল্পনীয় ছিল। মেলে না, সোহিনীর সঙ্গে মেলে না। ইদানীং মেজাজ যেন চড়া তারে বাঁধা সর্বদা। সোহিনীর শরীরটা কি ভাল নেই? ভেতরে ভেতরে যদি কোনও অসুস্থতা থাকে, তা হলে তো স্নায়ুর নিয়ন্ত্রণ হারানো অসম্ভব নয়। নাহ্, কায়দা করে সোহিনীর প্রেশারটা চেক করাতে হবে। মোড়ের সুকুমার কম্পাউন্ডারকে যদি বলে দেয়, সে তো বাড়ি এসেই...

আবার সোহিনীর পদশব্দ। হাত সরাতেই ভাস্কর দেখল সোহিনীর খর চোখ তাকেই নিরীক্ষণ করছে।

ভাস্কর গলা ঝেড়ে বলল, কিছু বলবে?

ঢঙ করে এখন শুলে কেন? ঘড়ির কাঁটাটা দেখেছ? দয়া করে খেয়ে নিয়ে আমায় উদ্ধার করো।

ইচ্ছে করছে না। ভাবছি পেটটাকে আজ রেস্ট দিই।

আগে বলা উচিত ছিল। তোমার খাবারটা গরম করতাম না। সোহিনীর জিভে ফুল্‌কি ছিটল, যেমন মা, তার তেমনই ছেলে! দু'জনে যে কীভাবে আমাকে...!

থামো রে বাবা, থামো। ভাস্কর উঠে বসল, যাচ্ছি।

ডাইনিং টেবিলে যাওয়ার আগে ছেলেকে একবার দেখে এল ভাস্কর। চেয়ার টানতে টানতে বলল, কখন ঘুমোল পাপান?

উত্তর নেই। ক্যাসারোল খুলে রুটি বার করছে সোহিনী।

ভাস্কর ফের বলল, তুমি আসা পর্যন্ত সুষমা ছিল নিশ্চয়ই?

এবারও জবাব নেই সোহিনীর। ভাস্করের প্লেটে পটলের ডালনা দিচ্ছে। হঠাৎই বলে উঠল, আমার কিন্তু সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেছে।

এখনও রাগ পড়েনি?

রাগের কথা নয়। আমি আর পারছি না। এবার এই সংসার থেকে চলে যাব।

সর্বনাশ করেছে! ভাস্কর তামাশা জুড়ল, তুমি গেলে এই অভাগার কী হবে ডার্লিং?

আমি কিন্তু সিরিয়াস। আই অ্যাম গোয়িং টু লিভ দিস হাউস। পাপানকে নিয়ে।

ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে। কালই মাকে চলে আসতে বলছি। ভাস্কর রুটি ছিঁড়ল, এবার একটা দরকারি কথা শোনো তো। নইলে পরে আবার বলবে আমি জানাইনি।...আজ একজন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। তরুণদাই অ্যারেঞ্জমেন্ট করল। ওষুধ-টষুধ দিয়েছেন ডাক্তারবাবু। সঙ্গে ব্রেনের একটা সিটি স্ক্যানও করাতে বললেন। প্লাস, সাতদিন নো অফিস। বেডরেস্ট।

সোহিনীর আঙুল থেমেছ। ভুরু কুঁচকে তাকাল।

এখানেই পারছ, কিস্যু মিলবে না, মাঝখান থেকে চার-পাঁচ হাজার টাকা গচ্চা। বোঝো, মাথাব্যথার কী মহিমা! ভাস্কর এক ঢোক জল খেল, করিয়েই নিই, কী বলো?

সোহিনীর কোনও জবাবও নেই, প্রশ্নও নেই। আবার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল ভাস্করের। কেন যে পড়ল?

তিন

গাড়ি গ্যারেজে তুলে শাটার টানল অনুপম। ঝুঁকে তালা লাগিয়ে পুরনো একটা হিন্দি গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে সরু গলিটা দিয়ে ঢুকছিল, সামনে বড়দা।

দেবোপমের পরনে যথারীতি ঢোল্লা পাজামা, বুশশার্ট। গালে যথারীতি এক-দু'দিনের না কামানো দাড়ি। হাতে যথারীতি জ্বলন্ত সিগারেট। প্রশ্নটাও প্রায় রীতিমাফিক, কী রে, ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরছিস?

দাদার সঙ্গে বাক্যালাপ বাড়াতে চায় না অনুপম। ছোট্ট একটা আওয়াজ করল, হুঁ।

আজ এত দেরি যে? সন্ধে অবধি তোর ক্লাস হচ্ছে নাকি?

ডিপার্টমেন্টে কাজ ছিল।

ও। সিগারেটে ভুসভুস টান দিল দেবোপম, এখন ঘরে আছিস তো?

হুঁ।

আমি একবার আসব ভাবছি। তুই একটু ফ্রেশ হয়ে নে...

অনুপম কিছু বলার আগেই বড়দাটি হাওয়া। পাশ কাটিয়ে সোজা বাড়ির বাইরে।

প্রমাদ গুনল অনুপম। বড়দার প্রবেশ মানেই সন্ধেটার বারোটা। গ্যাঁট হয়ে বসলে আর উঠতেই চায় না। প্রথমে খানিক ভ্যাজর ভ্যাজর, তারপর চলে আসবে নিজের লাইনে। আমার দিকটাও একটু ভাব অন্তু! ব্যাঙ্কে কেন ফেলে রাখছিস টাকা, আমার অ্যাডভাইস শোন, কোথাও একটা লাগিয়ে দে! তোরও লাভ, আমারও টু পাইস আসে! ভাইকে কিছুতেই জপাতে না পেরে শেষে ব্রহ্মাস্ত্র ঝাড়বে, শ'চারেক মতো টাকা হবে তোর কাছে? ইলেকট্রিক বিল জমা দিতে হবে, কম পড়ে যাচ্ছে...! অথবা টেলিফেন বিলের দোহাই, কিংবা ঝিনির কলেজের মাইনে। একেবারে কাঙাল টাইপ। দশ বছরের বড় দাদাটিকে মুখের ওপর কিছু বলতে পারে না অনুপম, মাঝখান থেকে মেজাজটা কষাটে মেরে যায়।

ঘরে এসে অনুপম ঝুম বসে রইল একটুক্ষণ। বড়দাটা কিছুই করে উঠতে পারল না জীবনে। লেখাপড়ায় তেমন খারাপ ছিল না। মাধ্যমিকে স্টার পেয়েছিল। হায়ার সেকেন্ডারিতে ফার্স্ট ডিভিশান। কমার্সে। কিন্তু কলেজে

ছেলেই কেমন বিগড়ে গেল। কী যে করত কে জানে? সম্ভবত কুসঙ্গের পরিণাম। আনার্সটাও রাখতে পারল না, টায়েটুয়ে গ্র্যাজুয়েটটি হয়ে মা সরস্বতীকে বিদায়। প্রেম যে একটা করত, তাতে সন্দেহ নেই। বেকার দশাতেই হুট করে মাকে একদিন সিঁদুর-টিঁদুর পরিয়ে বাড়িতে হাজির। বাবা তো চটে গিয়ে জুতো খুলে এই মারে তো সেই মারে, মা হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসল, তারপর কী অদ্ভুতভাবে মেনেও নিল বউদিকে। ব্যস, আর বড়দাকে পায় কে, দাদা পায়ের ওপর পা তুলে কাটাতে লাগল দিন। টুকটাক কোনও চাকরি ধরে হয়তো করল দু'-তিন মাস, তারপর হুট করে অফিস-টফিস ছেড়ে ফের মৌজমস্তিতে কাল কাটাচ্ছে। আবার হয়তো একটা কাজে ঢুকল, আবার ছাড়ল...। মাথার ওপর ডাক্তার বাবা মজুত, তেমন পশার না থাকলেও পাড়ার চেম্বার থেকে তাঁর মোটামুটি একটা রোজগার আছে, অতএব পেটের ভাবনা নেই, ছেলেমেয়ে দুটো কীভাবে মানুষ হবে সে চিন্তাও নেই, থাকো দেদার ফুর্তিতে। আরামে গড়াচ্ছে, চায়ের দোকানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা, ফুটবল-ক্রিকেট দেখতে ছুটছে, পাড়ার পুজো নিয়ে হয়তো মেতে রইল...। বছর আষ্টেক আগে বাবা গত হওয়ার পর অবশ্য খানিক টনক নড়ল। অনুপম তখনও শিকাগোয়। মাকে ডলার টলার পাঠাত, মেজদা পৃথগন্ন হয়ে গেলেও মা'র হাতে কিছু কিছু দেয়, বাবার সঞ্চয়ের ঠেকনাটুকুও ছিল, তবু জীবনবিমা আর মিউচুয়াল ফান্ডের এজেন্সি নিয়ে রোজগার শুরু করল বড়দা। দেশে ফিরে অনুপম মাকে নিয়ে একতলায় নেমে এল, দেবোপম মিত্র পড়ল আরও গাড্ডায়। বাড়িভাড়া হয়তো লাগে না, কিন্তু সংসারের হাঁ তো কম নয়। ছেলেমেয়ের পড়ার খরচই তো রাশি রাশি। জ্যেষ্ঠপুত্রের ওপর চিরকাল মা'র অসীম দুর্বলতা, অনুপমের কাছে এসেও একটা পয়সাকড়ির জোগান মা চালু রেখেছিল, এখন তো সেটিও গন। সুতরাং এই অহরহ হাত পাতা ছাড়া বড়দার আর উপায়ই বা কী!

অনুপমের খারাপ লাগে বউদির জন্য। বিয়ে হয়ে আসা ইস্তক শ্বশুর-শাশুড়ির মন জোগানোর চেষ্টা চালিয়েছে, কিন্তু লাভ হল না। বউদি চিরকালই মা'র চক্ষুশূল। মা'র বদ্ধমূল ধারণা ছিল, তার সোনার চাঁদ ছেলেটি ভিখারিবাড়ির মেয়েতে মজেই অকর্মা হয়েছে। অবশ্য বউদিরও দোষ আছে। স্বামীকে যে ধমকে-ধামকে কিছু করতে বলবে, সে সাহসই নেই। মা যা অপমান করত বউদিকে, অন্য কোনও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মেয়ে হলে কবেই

ছেলেমেয়ে নিয়ে বেরিয়ে যেত। তার বাপের বাড়িরও জোর নেই, বিদ্যেতেও ঢনঢনে, অতএব দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকতে হল বেচারাকে। মাথার ওপর একটা ছাদ তো আছে, সেটুকুই বা কে খোয়াতে চায়!

ধুস, পরের সংসার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে হবেটা কী? কোনও সমাধান আছে তার হাতে? অনুপম গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল। রান্নাঘরে গ্যাস জ্বেলে চায়ের জল চাপিয়েছে। আপন মনে মাথা নাড়ল দু'দিকে। যে নিজের ঘরই টিকিয়ে রাখতে পারে না, অন্যকে নিয়ে ভাবনা কি তার সাজে? তা ছাড়া বড়দা-বউদির সঙ্গে একত্রে সে থাকতে পারবে কি? বরং মেজদা-মেজবউদির মতো হাঁস হয়ে থাকাই তো শ্রেয়। লেখাপড়ায় তেমন চৌকশ না হয়েও ধরে-করে মোটামুটি একটা চাকরি বাগিয়ে ফেলেছে মেজদা। বাবার কথামতো বিয়ের পিঁড়িতে বসেও মোটেই ঠকেনি। স্কুলটিচার বউ, শ্বশুরবাড়ি মোটামুটি পয়সাওয়ালা...। নিজেও মেজদা যথেষ্ট গুছোনো। মোটে একটি সন্তান, খরচ করে মেপে, সঞ্চয়ও মাপা, সন্ধেবেলা হুইস্কিটুকুও খায় নিখুঁত মাপমতন। নিরুপম মিত্তির খাসা আছে।

নাহ্, অতটা স্বার্থপর অনুপম হতে পারবে না। বড়দাকে সাবসিডি তাকে দিয়ে যেতেই হবে। সোহিনীর হয়তো বড়দার এই নিত্যকার খুচখাচ প্রার্থনা ভাল লাগবে না, তার চেয়ে একটা মাসিক বরাদ্দ হাতে ধরিয়ে দিলে কেমন হয়?

জল ফুটছে। টি-পটে চা-পাতা ভিজিয়ে অনুপম বিস্কুটের কৌটো খুলল। ফ্রিজ থেকে মাখন বার করে ঘুরিয়ে নিল মাইক্রোওয়েভ ওভেনে। দুটো বিস্কুটের মাঝে মাখন লাগাচ্ছে। খিদে পাচ্ছে অল্প অল্প, আপাতত চায়ের সঙ্গে বিস্কুটই পেটে যাক।

পেয়ালায় দামি সুগন্ধী চা ঢেলে নিয়ে অনুপম শোওয়ার ঘরে ফিরল। দুধবিহীন, চিনি ছাড়া উষ্ণ পানীয় এখন তাকে খানিক সঞ্জীবিত করবে। ল্যাপটপ খুলে বসল বিছানায়। মেল বক্সে চোখ রেখেই টানটান। লীনা উত্তর দিয়েছে! সংক্ষিপ্ত বৈদ্যুতিন চিঠি। হাই পপ, গেটিং অ্যালং ফাইন। জয়েন্ড পিয়ানো ক্লাস লাস্ট উইক। গ্রেট ফিলিং। হোপ ইউ আর ও-কে।

কী মেয়ে, আরও দুটো-চারটে লাইন কি লিখতে ইচ্ছে করে না! জানুয়ারিতে বারো পূর্ণ করল লীনা, এবার যে-কোনও দিন আস্ত এক নারী বনে যাবে। কে জানে হয়তো হয়েও গেছে। অনুপমের আর জানা হল না। ছোট্ট খরগোশের

মতো সেই মেয়েটা, পাতলা পাতলা ঠোঁট, কুচকুচে কালো চোখের মণি, তুলতুলে হাত-পা, টুকটুকে ফোলা ফোলা গাল, যার বেড়ে ওঠার প্রতিটি পল তিলে তিলে অনুভব করবে ভেবেছিল অনুপম, সে বুঝি আর কোনও কালেই তাকে দেখা দেবে না। এখন লীনা একশো ভাগ মারিয়ারই মেয়ে। নইলে একবারও কি লিখত না, আই মিস ইউ, পপ!

লিখবেই বা কেন? নিশ্চয়ই জোহান আর মারিয়ার সংসারে দেবলীনা মিত্র নামের মেয়েটা অসুখী নেই! উঁহু দেবলীনা মিত্র নয়, ডেবোলিনা মিট্‌রা। মেয়েটা নিজের নামের মানেই হয়তো কোনওদিন জানবে না। তবু ওই নামটুকু তো বহন করছে, এটাই যা অনুপমের সান্ত্বনা।

শ্বাস গোপন করে মেয়েকে একটা প্রত্যুত্তর লিখল অনুপম। সংক্ষেপেই। মিছিমিছি বেশি মায়া বাড়িয়ে কী লাভ, এবার ক্রমশ বিযুক্ত করতে হবে নিজেকে। মেয়ে যে আর অনুপমের নেই, এ তো খোলামনে মেনে নেওয়াই ভাল। পুরনো সম্পর্কগুলোকে পুরোপুরি ছিঁড়তে না পারলে নতুনে কি স্থিত হওয়া যায়?

মোবাইলে কুককুক ধ্বনি। সোহিনী? টেবিল থেকে সেলফোনখানা তুলে অনুপম সামান্য হতাশ। গলা গম্ভীর করে বলল, হ্যালো?

স্যার, আমি শুভম বলছি। শুভম রায়চৌধুরী। সেকেন্ড ইয়ার।

অনুপমের চট করে মনে পড়ল না ছেলেটাকে। গলা আরও ভারী করে বলল, হ্যাঁ, বলো?

আপনি স্যার আজ নেটওয়ার্ক থিয়োরিটা পড়িয়েছেন...আমি ক্লাসটা করতে পারিনি...

কেন পারোনি?

নেক্সট উইকে যে ইলেকশন, স্যার। দেখেছেন তো এবার কী হাড্ডাহাড্ডি লড়াই...!

এতক্ষণে স্মরণে এল ছেলেটাকে। রোগা, লম্বা, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, প্রতিদিন আলাদা আলাদা রঙের টিশার্ট পরে আসে। অতি ফাঁকিবাজ, কামাই করে প্রায়ই, এলেও লেটে ঢোকে ক্লাসে। অনুপম একটু বিরক্তির সঙ্গেই বলল, সারাদিন ইউনিয়ন রুমে বসে ছিলে তো?

থাকতেই হবে স্যার।... তা কোন বইটা ফলো করব...

ক্লাসে আমি রেফারেন্স বুকের নাম দিয়ে এসেছি।

সে তো স্যার তিনটে বই।

হ্যাঁ। তিনটেই পড়তে হবে।

বলছিলাম কী স্যার... এখন তো ক'দিন ব্যস্ত থাকব... যদি একটা নোট মতন দিয়ে দেন... আপনারও সুবিধে, আমাদেরও সুবিধে।

চড়াং করে মাথা গরম হয়ে গেল অনুপমের। কী স্পর্ধা! ইউনিয়নের নেতা বলে মাথা কিনেছে নাকি? রুক্ষ স্বরে অনুপম বলল, শোনো, আমি কীভাবে পড়াব, আমিই স্থির করব। তোমার ক্লাস করতে ইচ্ছে না হয়, কোরো না। ডোন্ট অ্যাডভাইস মি এগেন।

বলেই অনুপম খটাস করে কেটে দিয়েছে লাইন। কপাল টিপে মাথা নাড়ছে দু'দিকে। এখানে পড়ানোর অভিজ্ঞতাটা খুব সুখকর হচ্ছে না। কলকাতা যে রাজনীতির আখড়া, তা সে জানে। স্কুল-কলেজগুলোও যে দলবাজির প্রভাবমুক্ত নয়, তাও। তবু চাকরিটায় যোগ দেওয়ার আগে পর্যন্ত অনুপমের ধারণা ছিল, প্রযুক্তিবিদ্যার পাঠশালাগুলো হয়তো একটু অন্যরকম। হা হতোঽস্মি, এসে অবধি দেখছে এখানেও রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষ। প্রথম ধাক্কাটা খেয়েছিল ডিপার্টমেন্টে। সহকর্মীরা তাকে কেমন সন্দেহের চোখে দেখত। ঠারেঠোরে বুঝতে চাইত, পার্টির কোন কেষ্টবিষ্টুর খুঁটির জোরে সরাসরি প্রফেসর পদে বহাল হল সে! এই শহরে রাজনৈতিক দাক্ষিণ্য ছাড়া উপাচার্য থেকে পিয়ন, কোনও চাকরিই জোটা কঠিন, এ অনুপম জানবে কোত্থেকে! কিছুকাল যেতে তবে না টের পেল, যে পোস্টে সে এসেছে সেখানে সুপারিশ করার মতো দলীয় লোক পাওয়া যায়নি বলেই, এবং অনুপমের যোগ্যতা অনেকখানি বেশি ছিল বলেই, শিকেটা তার ভাগ্যে ছিঁড়েছিল। অ্যাকাডেমিক রেকর্ড, বিদেশের নামী জার্নালে প্রকাশিত অজস্র গবেষণাপত্র, বিদেশে দীর্ঘকাল পড়ানোর অভিজ্ঞতা, সব মিলিয়ে অনুপমের ব্যক্তিগত তথ্যপঞ্জিও যথেষ্ট ওজনদার। নির্বাচকমণ্ডলী তাকে বাতিল করার সুযোগ পায়নি। আর কাজে ঢোকা ইস্তক দেখছে, ছাত্রদের মধ্যে এ-দলে ও-দলে মারপিট লেগেই আছে। ইউনিয়নের দখল পাওয়া যেন সাম্রাজ্য জয়ের শামিল। এতে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বনেদটা ক্রমে ঝুরঝুরে হয়ে যাচ্ছে, তা নিয়ে কারওই হুঁশ নেই যেন। না ছাত্রছাত্রীদের, না কর্তৃপক্ষের। মরুক গে যাক। একা অনুপম ভেবে কী করবে!

চায়ের কাপ ডাইনিং টেবিলে রেখে আবার একবার ফ্রিজ খুলল অনুপম।

রাত্তিরের জন্য খুব একটা কিছু নেই, কালকের রাঁধা ডাল আর মুরগির মাংস পড়ে আছে সামান্য। কলকাতায় ফেরার পর মা রান্না করত প্রথম প্রথম, পরে একটি কাজের মেয়ে। এখন অবশ্য রাঁধুনি টাধুনি নেই। সে নিজেই রাখেনি। এক মহিলা সকালে শুধু ঘরদোর মুছে-টুছে যায়, ব্যস। আহারের মতো একটা সাদাসাপটা ব্যাপারে পরনির্ভর হওয়াটা অনুপমের আঁতে লাগে। আজ রাতে শুকনো কিছু বানিয়ে নেবে? আর মোড়ের দোকান থেকে হাতে গড়া রুটি? নাহ্, থাক। আজ ভাত, আলুসেদ্ধ, ডিমসেদ্ধ। ঘি-মাখন খাওয়া ইদানীং বেশিই হচ্ছে, তবু আর একটা দিন নয় অনিয়ম হোক।

সরল সমাধানটা পেয়ে অনুপম ঈষৎ উৎফুল্ল বোধ করল। ইদানীং ভাতটাই তার বেশি মনোমতো হচ্ছে। সে কি এবার পুরোদস্তুর ভেতো বাঙালি বনে যাবে? মন্দ কী...নয় একটু নেয়াপাতি ভুঁড়িই গজাল! সোহিনী শুনলে অবশ্য মোটেই প্রসন্ন হবে না। ভাস্করের ভুঁড়ি দিন দিন ফুলছে, এটাও নাকি বরের প্রতি বীতরাগের অন্যতম কারণ! পাগলি কোথাকার!

দরজায় বেল। পলকের জন্য অনুপমের হৃৎপিণ্ড ছলাৎ। পরমুহূর্তে মনে পড়ল, সোহিনী তো বেল বাজাবে না! তা হলে কি বড়দা...?

বেজার মুখে অনুপম দরজা খুলল। যা ভেবেছে তাই। দেবোপম মিত্তির উপস্থিত।

একগাল হেসে দেবোপম বলল, কী রে, এখনও জামাপ্যান্ট বদলাসনি?

একবারেই চেঞ্জ করব। একটা শাওয়ার নিয়ে।...এসো।

আমি অবশ্য আজকাল রাত্তিরে স্নানটা করতে পারি না। ঠান্ডা লেগে যায়। বলতে বলতে বসার ঘরে গিয়ে সোফায় আসীন হয়েছে দেবোপম। পকেট থেকে সিগারেট-দেশলাই বার করে সেন্টারটেবিলে রাখল। ভাইয়ের মুখটা ঝলক দেখে নিয়ে বলল, এক কাপ চা খাওয়াবি রে? তোর পাতা-চায়ের টেস্টটা দারুণ। তুই বানাসও চমৎকার।

অত সুখ্যাতির প্রয়োজন নেই। করছি।

রান্নাঘরে যাওয়ার আগে অ্যাশট্রেখানা টেবিলে তুলে দিয়ে গেল অনুপম। হাতের সামনে না পেলে ঘরময় সিগারেটের ছাই ফেলে বড়দা। বলতে গেলে হা হা হাসে! আরে বোকা, চতুর্দিক একটু নোংরা না হলে মাইনে দিয়ে ঝি রাখার দরকার কী!

চায়ের সঙ্গে প্লেটে খানিকটা কাজুবাদামও নিল অনুপম। ফিরে দেখল,

বড়দা বসে বসে ঢুলছে। একটু মায়াই হল দেখে। রোদ্দুরে খুব ঘোরাঘুরি করে নাকি আজকাল? নাকি সুগার-ফুগার ধরল? মা'র তো ভালই সুগার ছিল, সেই ধাতটাই পেল না তো? অতি রূপবান ছিল এক সময়ে, এখন এই বাহান্নতেই গাল-টাল ভেঙে প্রায় বুড়োমানুষের হাল।

অনুপম সামান্য গলা-খাঁকারি দিল। ওমনি ধড়মড়িয়ে সোজা হয়েছে দেবোপম। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, একা বসে থাকলেই আমার এই হয়, বুঝলি। চোখটা জড়িয়ে আসে।

স্বাভাবিক। চব্বিশ ঘণ্টা দঙ্গলের মধ্যে থাকা যার স্বভাব...!

আজকাল আড্ডায় আর যাই কই! খপ করে এক মুঠো কাজুবাদাম তুলে নিল দেবোপম। একটা-দুটো মুখে ফেলে বলল, তোর এখন কোনও জরুরি কাজ নেই তো?

অনুপম মুচকি হাসল, যদি থাকে?

তা হলে বেশি সময় নেব না। দেবোপম একটুক্ষণ জুলজুল তাকিয়ে থেকে বলল, একটা বৈষয়িক ব্যাপারে তোর সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি।

কীরকম?

ঝন্টু আর রন্টু একটা প্রস্তাব দিয়েছে। বলছে, বাড়িটার দশা তো ভাল নয়, আগাপাশতলা মেরামত করতে অনেক খরচ, ছাদেও ফাটল ধরেছে... যদি সবাই মিলে বাড়িটা নিয়ে একটা জয়েন্ট ভেঞ্চারে নেমে পড়ি...

কী ভেঞ্চার? কীসের ভেঞ্চার?

ধর যদি কোনও প্রোমোটারকে দিই! ল্যান্ডটা হবে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট, আর বাড়ি ভেঙে নতুন করে বানানোর খরচা দেবে প্রোমোটার। জমি বাড়ি মিলিয়ে আমাদের আছে মোট সাত কাঠা। আর বাড়ির সামনে যা রাস্তা, স্বচ্ছন্দে জি প্লাস ফোর হয়ে যাবে। রন্টু হিসেব করে দেখাল, পার ফ্লোর তিনটে করে ফ্ল্যাট তোলাই যায়। আমরা একটা ফ্লোর, জ্যাঠামশাইদের তরফের একটা, বাকি দুটো তলা প্রোমোটার বেচুক।

অনুপম রীতিমতো চমকিত। চোখ কপালে তুলে বলল, তোমরা বাড়িখানা ভাঙার প্ল্যান করছ নাকি?

বাহাত্তর বছর তো বয়স হল, এবার তো এটাকে ছুটি দেওয়াই যায়। প্রচুর জল-ঝড়-বৃষ্টি তো খেয়েছে। সশব্দে চায়ে চুমুক দিয়ে দেবোপম ঝুঁকল সামনে। প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে ধরিয়েছে। দেশলাইকাঠি নিভিয়ে

বলল, ঠাকুরদা অনেক স্বপ্ন নিয়ে বাড়িটা বানিয়েছিল রে। এখন তো সে ওপর থেকে দেখছে, উত্তরাধিকারীরা খুব একটা আরামে নেই। নিশ্চয়ই তারও মনখারাপ হচ্ছে। নির্ঘাত ভাবছে, পণ্ডিতিয়ায় এমন একটা অ্যাসেট ছেড়ে এলাম, কিন্তু নাতিরা প্রপারলি ইউজ করতে পারছে না!

বড়দা এমন সরলভাবে বলে! যেন চর্মচক্ষে দেখতে পাচ্ছে বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট উঠলে স্বর্গধাম থেকে পুলকে পুষ্পবৃষ্টি করবে ঠাকুরদা! কেজো সুরে অনুপম বলল, মেজদার কাছে পেড়েছ প্রোপোজালটা?

ঝন্টু বলেছে।

মেজদার কী মত?

সে তো ও তরফের চেয়েও এক কাঠি সরেস। বলেছে, প্রোমোটার ডাকো, তার সঙ্গে এস্টিমেটে বসতে হবে। ফ্ল্যাট তুলতে কত কস্ট পড়বে, সে জানাক। তারপর টোটাল বারোটা ফ্ল্যাটের হিসেব হোক। তৈরির দাম নয়, বিক্রির দাম। এই সব কিছু ক্লিয়ার হলে তবে জয়েন্ট ভেঞ্চারের প্রশ্ন।

মেজদার কাছে এমন একটা কূটবুদ্ধিই প্রত্যাশিত ছিল। শুধু ফ্ল্যাটই নয়, সঙ্গে সম্ভবত কিছু ক্যাশ বাগানোর ধান্দা আছে মেজদার। চুলচেরা পাইপয়সার হিসেব না বুঝে মেজদা এ-বাড়িতে কোদাল-গাঁইতি মারতেই দেবে না।

দেবোপম অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়ল, তা তোর কী মতামত?

উঁ? অনুপম ঠোঁট টিপল, হুঁ।...ঠিক আছে, কথাবার্তা তো এগোক।

অর্থাৎ তোর দিক থেকে গ্রিন সিগনাল?

সবাই মিলে একটা কিছু করতে চাইলে আমি কেন ডগ ইন দা মেন্‌জার হব!

না না, তুই আমার সোনা ভাই, আমি জানি না!

সম্বোধনটায় একটু যেন মেদুর হল মন। বড়দা ছোটবেলায় অনুপমকে ওই নামেই ডাকত কিনা। বাবার শাসনে যদি সামান্য ঠোঁট ফুলল অনুপমের, ওমনি দাদা চুল ঘেঁটে দিত, আহা রে, আমার সোনা ভাইকে কে বকল রে...!

দেবোপম ভারী পরিতৃপ্ত মেজাজে সোফায় হেলান দিয়েছে, আমাদের তো নো প্রবলেম। তিন ভাই, তিনটে ফ্ল্যাট। ঝন্টুদেরই ফ্যাসাদ। বড়দি-ছোড়দি কি ভাগ ছাড়বে? দু'বোনকে অংশ দিতে হলে তিনটে ফ্ল্যাটকে চারখানা করতে হবে না?

যাদের সমস্যা, তাদেরই বুঝতে দাও।

দ্যাখ না তুই, লাঠালাঠি বেধে যাবে। ঝন্টুর যা মেন্টালিটি, ও দিদিদের এন্ট্রি দেবে বলে মনে হয় না। কেনই বা দেবে বল? বড়দি-ছোড়দি তো জ্যাঠামশাইয়ের অসুখের সময়ে...

অনুপম আর শোনার আগ্রহ বোধ করছিল না। পারিবারিক এইসব কূটকচালি থেকে সে বহু কালই দূরে দূরে। এখনও দূরেই থাকতে চায়। দেবোপমকে মাঝপথে থামিয়ে বলল, তোমার দরকারি কথা হয়ে গেছে তো?

হ্যাঁ।...কেন?

এবার আমি একটু কাজে বসব। ক্লাস টেস্টের খাতা দেখতে হবে।

ও। তা হলে তো এবার উঠতে হয়। বলল বটে, দেবোপমের তবু নড়ার লক্ষণ নেই। ফের একখানা সিগারেট ধরিয়ে বলল, আমার ওই বিষয়ে কিছু ভাবলি?

কোনটা বলো তো?

বললাম না... সম্প্রতি একটা ভাল মিউচুয়াল ফান্ড বেরিয়েছে। ভেরি সেফ ইনভেস্টমেন্ট। চোখ বুজে দু'-চার লাখ লাগিয়ে রাখতে পারিস।

এখনই হবে না গো। একটু অসুবিধে আছে।

তোর আবার কীসের অসুবিধে রে অন্তু? ঝাড়া-হাত-পা মানুষ, লাখ লাখ ডলার ব্যাঙ্কে পচছে... এখানেও মোটা মাইনে পাচ্ছিস...!

অনুপম বলতে পারল না, সবাই তাকে যতটা অর্থবান ভাবে ততটা সে নয়। স্টেটসে যেটুকু সঞ্চয় করেছিল, তার একটা মোটা অংশ দিয়ে আসতে হয়েছে মারিয়াকে। বিবাহ বিচ্ছেদের খেসারত। মেয়েকে মারিয়াই পেল কিনা। শুধু তাই নয়, এখনও মেয়ের খরচা বাবদ তাকে নিয়মিত টাকা পাঠাতে হয়। ডলারের হিসেবে হয়তো অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু ভারতীয় মুদ্রায় নেহাত কম নয়। তা এসব গল্প বড়দাকে শুনিয়ে লাভ আছে কোনও? অনুপম বলবেই বা কেন?

অল্প হেসে অনুপম বলল, না বড়দা, এখন পারব না। প্লিজ।

ঠিক আছে, আমারও কোনও জোরাজুরি নেই। দেবোপম গাত্রোত্থান করেছে। দরজায় গিয়ে বলল, তোর রাত্তিরের রান্না হয়ে গেছে?

ভাতে ভাত বসিয়ে দেব।

যদি বলিস তো মাছের ঝোল পাঠিয়ে দিতে পারি। তোর বউদি আজ কাতলা মাছের ঝালটা বেশ রেঁধেছে।

কিচ্ছু দরকার নেই।

ঝটিতি নাকচ করে দিল অনুপম। এধরনের আদান-প্রদানে সে একদম নেই। বড়দা-বড়বউদি বেশ কয়েকবার একত্রে খাওয়া-দাওয়ার প্রস্তাব তুলেছে। তাতে হয়তো বড়দারও সুসার হয়, অনুপমেরও কিঞ্চিৎ হ্যাপা বাঁচে। তবু অনুপম সম্মত হতে পারেনি। কোথায় যেন একটা আটকায়। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা থেকে ধীরে ধীরে একটা বাধ্যবাধকতা তৈরি হতে পারে, সেই আশঙ্কাতেই কি...? তা ছাড়া নিজের স্বাধীনতাও তো খানিক খর্ব হয়। আত্মীয়পরিজনদের সঙ্গে বেশি মাখামাখিতে নৈকট্য হয়তো বাড়ে, আবার একটা মানসিক ব্যবধানও তো গড়ে ওঠে। নয় কি?

দেবোপম বুঝি ক্ষুন্ন হয়েছে সামান্য। ঘাড় দুলিয়ে বলল, যা তোর ইচ্ছে।... তবে দিনের পর দিন হাত পুড়িয়ে খাচ্ছিস, আমাদের দেখতেও তো খারাপ লাগে।

রান্নার অভ্যেস আমার আছে বড়দা। রাঁধতে ভালওবাসি।

তবু...। দেবোপম হঠাৎই থমকাল। ভাইকে আগাগোড়া জরিপ করতে করতে বলল, বয়স তো এমন কিছু হয়নি, আবার একটা বিয়ে করছিস না কেন?

দেখি।...ভাবছি।

পছন্দ হয়েছে বুঝি কাউকে?

প্রশ্নটা যথেষ্ট অর্থবহ। এ-বাড়িতে সোহিনীর যাতায়াত নিয়ে ইঙ্গিত আছে কি কোনও? থাকলে আছে। অনুপম ঢ্যাঁড়া পেটাতে যাচ্ছে না, আবার তার লুকোছাপাও নেই। মা'র শ্রাদ্ধে ভাস্কর আর সোহিনী এসেছিল, তারপর থেকে তো সোহিনীর একাই আনাগোনা—এই ঘটনাপরম্পরা থেকে বাড়ির লোক যদি কোনও ধারণা তৈরি করে, অনুপম তো তাদের দোষ দিতে পারে না!

আলগা হেসে অনুপম উত্তরটা এড়িয়ে গেল। বড়দা যাওয়ার পর দরজা বন্ধ করে সত্যি সত্যি বসল খাতার গোছা নিয়ে। দুটো-তিনটে দেখেই স্থৈর্যে চিড়। সব একরকম, সব একরকম! এত টোকাটুকি করলে ক্লাস টেস্টের কোনও গুরুত্ব থাকে? নাহ্, এবার ওপেন বুক এগ্‌জ্যাম চালু করতে হবে। খানপাঁচেক প্রবলেম ধরিয়ে দেবে, সবাই মিলে মাথাখুঁড়ে মর!

চশমা খুলে চোখ মুছল অনুপম। ফের ডাঁটি কানে লাগাচ্ছিল, তখনই উন্মন সহসা। কোত্থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসে না? বাড়ির সামনেটায়

ছাতিমগাছে ফুল ফুটেছে, বাতাস কি সেই সৌরভই বয়ে আনল? গন্ধটা তো সন্ধে থেকেই ছিল, এতক্ষণ সেভাবে নাকে লাগেনি, হঠাৎই যেন ঝাপটা মারছে। মাতাল করা ছাতিম ফুলের সুবাসে এখন সোহিনীর ঘ্রাণ।

চার-চারটে দিন দর্শন নেই সোহিনীর, কোনও মানে হয়? ঘাড়ে ব্যথা বলে বর নয় ছুটিতে, তা বলে সোহিনী সোজা বাড়ি ফেরে কেন? কীসের দায়? ভাস্করকে তো সোহিনী বলেই ফেলেছে, তার সঙ্গে আর থাকবে না...! ভাস্কর নাকি এতই বোদা, শুনেও নাকি মগজে ঢোকেনি!

সত্যিই কি ভাস্কর নির্বোধ? সোহিনী-অনুপমের সম্পর্ক কিছুই আঁচ করতে পারে না? নাকি বউ আর বন্ধুর ওপর অগাধ বিশ্বাসের কারণে সন্দেহটাকে আমল দিতে চায় না?

কথাটা মনে হতেই বুকে একটা পেরেকের খোঁচা। বন্ধুর সারল্যের সুযোগ নিয়ে অনুপম তাকে প্রতারণা করছে না কি? তা কেন, সোহিনী আর ভাস্করের মাঝে বড় একটা ফাঁক ছিল বলেই তো...। নাহ্, ভাস্করকে সোহিনী কোনওদিনই ভালবাসতে পারেনি। শুধুমাত্র সামাজিক বিধির কারণে সোহিনী অনুপমকে চাইতে পারবে না, এমন দাবিও তো হাস্যকর। মন তো ক্রীতদাস নয়, নিয়মের শৃঙ্খলকে সে থোড়াই পরোয়া করে! স্বয়মাগতা সোহিনীকে অনুপমই বা কেন ফেরাবে? আজ যদি সে সরেও আসে, তা হলেই কি ভাস্করের জীবনে সুখের বন্যা বইবে? নাকি সোহিনী ভাল থাকবে? অতএব সে নিজেকে দায়ী ভাবছে কেন? সে তো নিয়তির হাতের পুতুল মাত্র। যেভাবে সুতো নড়ছে, সেভাবেই নাচছে। মারিয়া যে তাকে ছেড়ে দিল, তাও তো ওই সুতোর খেলা। কলকাতায় ফিরে কেনই বা যোগাযোগ করল ভাস্করের সঙ্গে? কে তাকে বাধ্য করল ভাস্করের বাড়ি যেতে? সোহিনীকে দেখে কেন তার মনে হল, বিয়ের বাঁধনে আটকে থেকেও ওই নারী একা, ভয়ংকর একা? প্রায় অনুপমের মতোই?

নাহ্, সবই সেই বাজিকরের কারসাজি। অনুপম নেহাতই নিরুপায়।

নিজের পক্ষে এভাবে যুক্তি সাজিয়েই তো স্বস্তি পায় মানুষ। মনকে চোখ ঠেরে নিজেকে ভারমুক্ত করার এ এক সূক্ষ্ম কৌশল। আসলে অনুপমের কাছে এখন সত্যি তো একটাই। সোহিনী তার সমস্ত শূন্যতা ভরিয়ে দিয়েছে। সোহিনী বিনা অনুপমের গতি নেই।

উদাসী পায়ে অনুপম পায়চারি করল খানিকক্ষণ। সিগারেট ধরাল একটা। আনমনে অন্দরের চওড়া প্যাসেজে হাঁটছে। প্যাসেজের প্রান্তে অনুপমের

লাগানো গ্রিল দরজা, ওপারে গাছ-আগাছার জঙ্গল। পাঁচিলঘেরা জমিটায় এক টুকরো আলো এসে পড়েছে, ঝোপঝাড়ে এখন এক রহস্যময় আবছায়া। আলো আর অন্ধকারের ওই মায়াজাল সোহিনীর ভারী প্রিয়।

হঠাৎই অনুপমের মনে হল, বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট উঠলে পিছনের জমি তো থাকবে না! সোহিনীর হয়তো খারাপ লাগবে। খবরটা জানাবে সোহিনীকে? এখনই?

কী কাণ্ড, ঘরে ফিরতে না-ফিরতে সোহিনীর ফোন! অনুপম উল্লসিত স্বরে বলল, এ যে দেখি মেঘ না চাইতেই জল!

থাক। নিজে থেকে তো খবর নাও না! একা একা কী ধ্যানে আছ মশাই?

তোমার শরীরের ঘ্রাণ নিচ্ছি, প্রিয়ে। সামনের ছাতিমগাছ তোমার সুরভি পাঠাচ্ছে।...তুমি করছটা কী?

আমার তো কাব্য করার জো নেই। এখন বাড়িতে নীরস গদ্য। শাশুড়ি ফিরলেন। সঙ্গে ননদ। ভাস্করকে নিয়ে প্রচুর আহা-উহু চলছে।

ভাস্কর এখন আছে কেমন?

শুয়ে-বসে সময় কাটাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে পেন-কিলার গিলছে।

ব্যথা এখনও যায়নি?

বাড়ে...কমে...বাড়ে...কমে...। আজ বিকেলে তো স্ক্যান রিপোর্টটা নিয়ে এলাম।

কিছু পাওয়া গেল?

বুঝতে পারছি না। দিদি নিয়ে যাচ্ছে রিপোর্টটা। তরুণদা কাল ডাক্তারকে দেখাবে। ব্রেনে বোধহয় কিছু স্পট-টট আছে। কী সব ওপাসিটিজ ইন ফ্রন্টাল লোব অফ ব্রেন...ইন্ট্রাটেনিয়াল টেনশন...এই সবই তো লেখা।...খারাপ কিছু কি?

অনুপম জোর চমকেছে। সোহিনী যা বলছে...খারাপ তো বটেই! লক্ষণ তো আদৌ ভাল নয়! ঘাড়ে যন্ত্রণা...ব্রেন-স্পট, যা সম্ভবত ইডিমা...মস্তিষ্কের সম্মুখভাগে অস্বচ্ছতা...প্রতিটি ফাইন্ডিংস তো একটা নির্দিষ্ট অভিমুখে আঙুল দেখায়!

ফের সোহিনীর গলা, কী গো, চুপ মেরে গেলে কেন? কী বুঝছ? ব্রেন-টিউমার নয় তো? অপারেশন-টপারেশনে যেতে হবে?

জানি না। ডাক্তার বলতে পারবে।...কে যেন বেল বাজাচ্ছে। ছাড়ছি।

আচমকা ফোন কেটে দিয়ে অনুপম একটু দম নিল। হে ঈশ্বর, সন্দেহটা যেন সত্যি হয়।

পরক্ষণে মনকে চাবুক কষাল। ছিঃ, এমনটা ভাবতে আছে? হে ঈশ্বর, সন্দেহটা যেন মিথ্যে হয়।

চার

সোহিনীর কাউন্টারে তেমন ভিড় ছিল না আজ। মাসের তৃতীয় সপ্তাহ, পেনশনারদের চাপ নেই বললেই চলে, সকালে তাও খানিক লাইন পড়েছিল, টিফিনের পর তো বিলকুল ফাঁকা। সাড়ে তিনটে নাগাদ সোহিনীর মনে হল, এবার ঝাঁপ নামালেই হয়।

অতএব প্রস্তুতি শুরু। ড্রয়ারের টাকাগুলো তুলে সোহিনী জড়ো করছে টেবিলে। কাজ এখনও অনেক বাকি, তবু যতটুকু যা এগিয়ে রাখা যায়। দশ, বিশ, পঞ্চাশ, একশোর নোট আলাদা আলাদা করে বান্ডিল বাঁধল। গোছা ধরে ধরে গুনে নিচ্ছে কাউন্টিং মেশিনে।

কাচের খোপের ওপারে রূপক, খুব ব্যস্ত নাকি, সোহিনীদি?

একটা পঞ্চাশ টাকার বাণ্ডিলে গার্ডার লাগাচ্ছিল সোহিনী। চোখ তুলে বলল, তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?

কাজেই ঘুরছি। বছর বত্রিশের রূপক ফিক করে হাসল, একটা উপহার দেওয়ার ছিল।

হঠাৎ? আমাকে?

সবাইকে দিচ্ছি। একটা দুঃসাহসিক কাজ করে ফেলেছি কিনা।

পাশের খোপ থেকে অনুশ্রী গলা তুলেছে, অত ভ্যানতাড়া করছে কেন? বলো না, তোমার গানের সিডি বেরিয়েছে।

তাই বুঝি? সোহিনী ঈষৎ কৌতূহলী, কই, দেখি।

খাপসুদ্ধু ডিস্‌কটা বাড়িয়ে দিল রূপক। রবীন্দ্রসংগীত। রূপকের এ গুণটা তো সোহিনীর জানা ছিল না! নিজের খরচায় বার করেছে?

রূপক আবার বলল, বারোটা গান আছে। ক্লাসিক্যাল বেসের। আপনি তো ক্লাসিক্যাল ভালবাসেন, কাইন্ডলি একটু শুনবেন।

অবশ্যই। আজই চালাব।

আপনার বাবাও তো নাকি ক্লাসিক্যালের খুব সমঝদার? এক সময়ে চর্চা-টর্চা করতেন...

ভোকাল নয়। বাবা সেতার বাজাত। বহু কাল ছেড়ে দিয়েছে।

তবু...ওঁদের কানটা তো খুব তৈরি...উনিও যদি শোনেন...। বলেন তো ওঁর জন্যও একটা...

না না। এটাই বাবাকে দেব।

মতামত জানার অপেক্ষায় রইলাম কিন্তু।

রূপক সরে যেতে সিডিটা ব্যাগে ভরে সোহিনী ফিরেছে নোট গণনায়। বাবা কি আর সেই ধ্যানস্থ হয়ে গান শোনার বাবা আছে? কেমন যেন বুড়িয়ে গেল বাবা। চাকরির পাট চোকার পরেও প্রথম ক'বছর বেশ তড়বড়ে ছিল। মাকে নিয়ে হইহই করে গোটা ভারত ঘুরল, ছাদে বাগান করছে, গানের আসরে ছুটছে নিয়মিত, তাসের আড্ডাতেও হাজিরায় ছেদ পড়ে না...। ইদানীং সেই বাবার শরীরেও যেন প্রবল ভাঁটির টান। হাঁপানি তো ভালই বেড়েছে, সিগারেট খেয়ে খেয়ে ফুসফুসের দফারফা। রবিবার দাদা এসেছিল, ভাস্করের শরীর খারাপ শুনে। বলছিল, এত নিশ্বাসের কষ্ট, তবু নেশাটি বাবা ত্যাগ করবে না। সারারাত খকখক কাশি, উঠে বসে থাকছে...। সঙ্গে মা'রও ভোগান্তি। সমানে জেগে। আর মা বেচারিও তো সুস্থ নয়। সেই যে বছর সাত-আট আগে হাঁটুর সমস্যাটা ধরল, সে তো আর কমার কোনও লক্ষণ নেই। গাদা গাদা ওষুধ, ইঞ্জেকশন, ফিজিওথেরাপি, তবুও কোঁকাচ্ছে। এবার বোধহয় হাঁটু দুটো বদলাতেই হবে। প্রায় দিন পনেরো শোভাবাজারের পথ মাড়ানো হয়নি। একবার যাওয়া উচিত। নিজের বাড়িতে অসুখ, বাপের বাড়িতে অসুখ...উফ্, সোহিনী কী যে করে! ভাস্করের রোগটা তো ডাক্তার ধরতেই পারছে না। তরুণদা একবার বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ টিউমার! একবার বলে, না না টিউমার নয়! কাল তো ভাস্করকে চেস্ট এক্স-রের করাতে নিয়ে গেল। ঘাড়ের যন্ত্রণার উৎস খুঁজতে বুকের ছবি তোলাতে হয়...? অনুপম অবশ্য বোঝাল, ব্রেনের স্পটগুলোর নেচার জানার জন্য ফুসফুসের এক্স-রে নাকি জরুরি!

কে জানে কী হচ্ছে! সোহিনীর ভাল লাগছে না। এতরকম চিন্তা মাথায় কিলবিল করে আজকাল! শেষ পর্যন্ত অনুপমের কাছে যদি সে চলে

যায়...যদি কেন, যাবেই...কেমন দাঁড়াবে ব্যাপারটা? তাদের শোভাবাজারের বাড়ি এখনও অতি রক্ষণশীল। গাঙ্গুলি বাড়ির মেয়ে, যে কিনা একটা দামড়া বাচ্চার মা, ডিভোর্স নিচ্ছে অন্য একজনকে বিয়ে করবে বলে...! বাবা-মা তো ইহজন্মে আর সোহিনীর মুখদর্শন করবে না। দাদাও না। নিকটতম মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রায় দ্বীপের মতো বাস...ভাবলেই কেমন বুক টিপটিপ।

ম্যাডাম, এই চালানটা নেবেন।

সোহিনী নড়ে উঠল। কাউন্টারে চেনা মুখ। মধ্যবয়সি সরকারি অফিসার। ট্রেজারি চালানে টাকা জমা দিতে এসেছে। এই শেষবেলায়।

লোকটা সব সময়ে সোহিনীর কাউন্টারেই দাঁড়ায়। বেজার মুখে চালানটা হাতে নিয়ে টাকার পরিমাণ দেখল সোহিনী। চার লক্ষ বিরাশি হাজার। হয়ে গেল, এখন বসে নোংরা নোংরা নোট গোনো! পারেও বটে লোকটা! পাঁচশো-হাজারের বান্ডিল প্রায় আনেইনি, শুধু গাদা গাদা পঞ্চাশ আর একশো। কেন আনে? বেশিক্ষণ সোহিনীকে দেখবে বলে? ঝটপট কাউন্টিং মেশিনে চাপিয়ে যে কাজ সারবে, সে উপায়ও নেই। আজকাল জাল নোটের যা রমরমা, পঞ্চাশ-একশোর গোছা ভাল করে পরখ করতে হয়।

পাক্কা চোদ্দো মিনিট সময় লেগে গেল। তার মাঝে অন্তত দু'বার ওড়না টানতে হল বুকে। অবশেষে কার্যটি যখন সমাধা হল, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত দপ্তরে সোহিনী টিপটিপ ঘামছে, মুখখানা তোলো হাঁড়ি।

লোকটা কাউন্টার ছাড়তেই 'ক্লোজড' বোর্ড টাঙিয়ে দিল সোহিনী। ঘড়ি দেখল, চারটে দশ। মাথা ঝাঁকিয়ে উঠল সিট ছেড়ে। ড্রয়ারে তালা মেরে সোজা টয়লেট। মুখে জল ছেটাচ্ছে, পিছনে মালবিকা।

মুচকি হেসে মালবিকা বলল, দারুণ একটা দিওয়ানা জোগাড় করেছিস তো!

সোহিনী অন্যমনস্ক ছিল, চোখ কুঁচকে বলল, আমি?

না তো কে!...ইস, লোকটা পুরো পতঙ্গের মতো আসে। তুই একটা কটাক্ষ হানলেই লোকটা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

ও, তুই ওই সরকারি ঢ্যামনাটার কথা বলছিস? খিস্তিটুকু মারতে পেরে একটু যেন প্রশমিত হল সোহিনী। চোখ বেঁকিয়ে বলল, দ্যাখ, না, নেক্সট দিন মালটাকে কেমন টাস্ট দিই!

কী করবি?

দেখলেই কাউন্টার ছেড়ে কাট্। পাঁচটার আগে ফিরব না।

বেচারা তখন গেটে ধর্না দেবে রে!

লঘু আলাপচারিতায় মেজাজ হালকা খানিক। হাসতে হাসতে সোহিনী স্বস্থানে ফিরল। এবার ঠান্ডা মাথায় কাজ গোটানোর পালা। সারা দিনের জমাখরচের হিসেব মেলানো তো আছেই, এ ছাড়া দেখতে হবে প্রতিটি চেক-ভাউচার-ডিপোজিট স্লিপ কম্পিউটারে ঠিকঠাক এন্ট্রি হল কিনা। তারপর দীপকদার হাতে নগদ টাকা বুঝিয়ে দিয়ে আজকের মতো নিশ্চিন্ত।

মিনিট পাঁচেকও যায়নি, ভ্যানিটি ব্যাগে মোবাইল সরব। নিশ্চয়ই অনুপম নয়! কালই সোহিনী পণ্ডিতিয়া গিয়েছিল, তখন তো অনুপম বলল আজ পাঁচটা অবধি সেমিনার। তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল নাকি?

ভাবতে ভাবতে মনিটরে চোখ। উঁহু, তরুণদার ফোন।

হ্যাঁ, তরুণদা, বলুন?

তুমি বেরোচ্ছ কখন, সোহিনী?

একটু সময় লাগবে। কেন?

আমি তোমাদের ব্যাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে।

সে কী, ভেতরে আসুন।

না সোহিনী। আমি এখানেই ওয়েট করছি। তুমি কাজ সেরে নাও। তোমার সঙ্গে একটা ডিস্কাশন আছে।

সোহিনী ঈষৎ কেঁপে গেল। ভাস্করের এক্স-রে-তে কি বাজে কিছু বেরিয়েছে? অফিস বয়ে তরুণদা কি সেটাই জানাতে এল? না হলে তরুণদা তো কখনও সোহিনীর ব্যাঙ্কে...!

বিড়বিড় করে সোহিনী বলল, ভাস্করের অসুখ সংক্রান্ত কিছু কি...?

হুঁ। তাড়া নেই, তুমি টাইম নিয়ে এসো।

তা হলে বোধহয় তত খারাপ কিছু নয়। সোহিনী আশ্বস্ত করল নিজেকে। তরুণদার স্বরও তো স্বাভাবিক শোনাচ্ছে। তবে তরুণদা যা ধীরস্থির মানুষ, গলা শুনে আন্দাজ করার উপায় নেই। নিজের মা'র মৃত্যুসংবাদই যেভাবে শুনিয়েছিল! যেন মা পুরী-বেনারস কোথাও গেল, ছেলে তাকে রওনা করিয়ে ফিরছে!

চোরা একটা অস্বস্তি নিয়ে দ্রুত হাত চালাল সোহিনী। আধঘণ্টার মধ্যে

আবশ্যিক ক্রিয়াকর্ম চুকিয়ে অফিসের বাইরে। চোখ চালিয়ে তরুণদাকে খুঁজছে।

ব্যাঙ্কের গায়ে পরপর কয়েকটা দোকান। মোবাইলের শোরুমটা থেকে হন্তদন্ত পায়ে বেরিয়ে এল তরুণ। পরনে ট্রাইজার-ফুলশার্ট, হাতে ব্রিফকেস। ব্যস্তভাবে বলল, সরি। মোবাইলটা রিচার্জ করে নিলাম। নিশ্চয়ই বেশিক্ষণ দাঁড়াওনি?

এই হল তরুণ ব্যানার্জি! নিজে না হোক চল্লিশ মিনিট অপেক্ষায়, অথচ কোনও তাপউত্তাপ নেই! উলটে সোহিনীর অসুবিধে হল কি না জানতে চায়! সোহিনীর ননদটি এতকাল তরুণদার ঘর করছে, বরের এই একটি গুণও যদি পেত!

চিলতে হেসে সোহিনী বলল, না না, আমি তো এইমাত্র...

তাই বলো। সামান্য একটা কাজে যা সময় নিচ্ছিল!...চলো একটু গলা ভেজাই।

নিঃশব্দে তরুণকে অনুসরণ করল সোহিনী। নিউ বালিগঞ্জের এই এলাকাটা বছর কুড়ি আগেও বেশ শুনশান ছিল, এখন অজস্র বাড়িঘর। পাল্লা দিয়ে দোকান বাজার ব্যাঙ্ক ভোজনালয়। নতুন গজিয়ে ওঠা একটা রেস্তরাঁয় ঢুকল তরুণ। মুখোমুখি বসে বলল, কিছু খাবে?

ইচ্ছে করছে না। শুধু চা।

বেয়ারাকে অর্ডার দিয়ে তরুণ সোজা হয়ে বসল। বলছে না কিছু, চুপচাপ ভাবছে কী যেন।

সোহিনী ঈষৎ অধৈর্য বোধ করছিল। গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, এক্স-রে রিপোর্টটা পেয়েছেন?

হুঁ। সকালে কালেক্ট করলাম।

কী বলছে রিপোর্ট?

ভাল নয় সোহিনী। ইতস্তত ভাব ঝেড়ে তরুণ বলেই ফেলেছে, কেসটা কিন্তু একটু সিরিয়াস দিকেই গড়িয়েছে।

কীরকম?

তোমায় তো বলেছি, ভাস্করের স্ক্যান রিপোর্টে গোলমাল ছিল। ডক্টর সেনগুপ্ত ওয়াজ সাসপেক্টিং সামথিং। এবং সেইজন্যই চেস্ট এক্স-রে...। তরুণ পলক থেমে থেকে বলল, এক্স-রে রিপোর্টটাও খারাপ। রাইট লাং-এ প্রচুর শ্যাডো পাওয়া গেছে।

তো?

ডক্টর বললেন, ইমেডিয়েটলি সিটি এফএনএসি করতে হবে। শুনেই তো তোমার অফিসে দৌড়ে আসছি।

সেটা কী?

সিরিঞ্জ দিয়ে লাং থেকে ফ্লুয়িড বার করে পরীক্ষা। নিডল বায়োপসি।

'বায়োপসি' শব্দটার এমন এক অভিঘাত আছে, সোহিনী সমূলে নাড়া খেয়েছে এবার। অজান্তেই গলার পরদা চড়ে গেল, মানে?

মানে বোঝার মতো বুদ্ধি তোমার আছে সোহিনী। তরুণ আশ্চর্য রকমের অবিচল। নাকি নিজেকে সংযত রাখছে? নিরুত্তাপ গলায় বলল, ব্রঙ্কিয়াল প্যাচটাকে ডাক্তার মোটেই ভাল চোখে দেখছে না। অতএব রসটা তো পরীক্ষা করাতেই হবে।

ও। সোহিনীর আর স্বর ফুটছিল না। বেশ খানিকক্ষণ পর ঠোঁট নড়ল, অর্থাৎ ভাস্করের...?

হ্যাঁ। স্ক্যান আর এক্স-রে রিপোর্ট মিলিয়ে দেখলে সেরকমই দাঁড়ায়। তবু ওই টেস্টটা করিয়ে ডাক্তার একশোভাগ নিশ্চিত হতে চান।

সোহিনী ঝুম মেরে গেল। টেবিলে চায়ের কাপ, কিন্তু ছুঁতে ইচ্ছে করছে না। নিমেষের জন্য মগজ বেবাক ফাঁকা। পরের মুহূর্তেই অগুনতি চিন্তা দলা পাকাচ্ছে মস্তিষ্কে। অনুপমের সঙ্গে কাল অ্যাকাডেমিতে নাটক দেখতে যাওয়ার কথা। হবে না। টানা ছুটি নিতে হবে নাকি? ভাস্করের মা ভেঙে চুরচুর হয়ে যাবেন নিশ্চয়ই! অনুপমদের বাড়িটা কবে ভাঙা পড়বে? জামাইয়ের খবরে কী প্রতিক্রিয়া হবে সোহিনীর বাবা-মা'র? পাপানের হোমটাস্ক নিয়ে সোহিনী কি বসতে পারবে আজ? রূপকের সিডিটা বোধহয় পড়েই থাকবে। অনুপম আজ এখনও ফোন করল না তো?

ভেবে কোনও লাভ আছে সোহিনী? দিস ইজ টাইম টু অ্যাক্ট।

তরুণের কথাগুলো যেন দূরাগত ধ্বনির মতো ভেসে আসছে। সোহিনী ফ্যালফ্যাল তাকাল। আবছা ঘাড় নেড়ে বলল, তা তো বটেই।

সো ডিসাইড, এখন কীভাবে এগোবে।

আপনি বলুন।

আমার তো মনে হয় এখনই রাষ্ট্র করার প্রয়োজন নেই। বাবুনকেও এখন কিছু বোলো না। আমি ওকে বুঝিয়ে-বাঝিয়ে বায়োপসিটা করিয়ে নেব। মাকে

তো জানানোর প্রশ্নই নেই। ভাস্বতীকেও আমি বারণ করে দিচ্ছি। ভাস্বতী অবশ্য একটু বেশি সেন্টিমেন্টাল, মা'র সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কান্নাকাটি না জুড়ে দেয়।

কিন্তু...গোপন রেখেই বা কী হবে?

আহা, এখনও তো সম্পূর্ণ শিয়োর নই। আর এখনই আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করাও তো নিষ্প্রয়োজন। এক পারসেন্ট হলেও নেগেটিভ হওয়ার চান্স তো একটা আছে। সেইটুকু আশাতেই নয় থাকি। দু'-এক সেকেন্ড চিন্তা করল তরুণ। তারপর বলল, তুমিও যতটা সম্ভব নরমাল থাকো। অ্যাটলিস্ট নরমাল থাকার ভান করো। এতে বাবুনের মেন্টাল হেল্‌থ অনেক স্টেডি থাকবে।

হুম।...কবে বায়োপসি করাবেন?

পরশু।

কোথায় হবে?

কিয়োর ক্লিনিকে। ডক্টর সেনগুপ্তের চেম্বার থেকে বেরিয়েই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিয়েছি। ওভার ফোন। সকাল ন'টায় ভাস্করকে আমি তুলে নিয়ে যাব।

কী অদ্ভুত নিরাবেগ ভঙ্গিতে বলে যাচ্ছে তরুণদা! দিদির সঙ্গে এতকাল ঘর করেও কী করে যে তরুণদা এমন মেথডিক্যাল রয়ে গেল!

তরুণের চা শেষ। কাপ-ডিশ পাশে ঠেলে বলল, এ কী, তোমারটা যে জুড়িয়ে জল! খেয়ে নাও।

হুঁ। চুমুক দিয়েও কাপ নামিয়ে রাখল সোহিনী। ভেতরে একটা চাপা বিবমিষা। চায়ের দিকে আর তাকাতেই ইচ্ছে করছে না।

তরুণ বুঝি পড়ে ফেলেছে সোহিনীকে। গম্ভীর মুখে বলল, থাক, ছেড়ে দাও। কিন্তু বাড়িতে তো এধরনের আচরণ চলবে না। তুমি যদি আহার-নিদ্রা বর্জন করো, তাতে তো আর এক প্রবলেম তৈরি হবে।

সোহিনী ঢোক গিলল, দুশ্চিন্তা করবেন না তরুণদা। আমি ঠিক আছি।

দ্যাটস গুড। তরুণ ঘড়ি দেখল। হিপপকেট থেকে পার্স বার করে বলল, চলো তবে উঠি। এখন আবার সল্টলেক যেতে হবে। ছোটমামার হঠাৎ উইল করার সাধ জেগেছে, আমার পরামর্শ চাই।

পারেন বটে। সারাদিন শুধু চরকি খাচ্ছেন। সোহিনী নিজেকে সহজ দেখাতে চাইল। ঠোঁটে হাসি এনে বলল, এত এনার্জি পান কোত্থেকে?

কী জানি ভাই, ক্লান্ত তো হই না। কারও কোনও কাজে লাগছি ভাবলেই পা দুটো কেমন আপনাআপনি চলতে শুরু করে।

এও এক ধরনের মানুষ। অন্যের উপকারে লাগার জন্য তরুণ যেন মুখিয়ে আছে। গ্লোরি ফার্মাসিউটিকালসের প্রচার বিভাগে মোটামুটি দায়িত্বশীল পদে চাকরি, তবু পেশাগত ব্যস্ততার মাঝেও ঠিক সময় বার করে নেয়। অন্যের দায় কাঁধে চাপিয়ে যন্ত্রের মতো ছোটে। কার যে কীসে আনন্দ!

বাইরে বেরিয়ে তরুণ আর দাঁড়াল না। বেঁটেখাটো গাঁট্টাগোট্টা মানুষটা প্রায় দৌড়েছে রাস্তার ওপারে। চলন্ত বাসকে হাত দেখিয়ে উঠেও পড়ল।

একটুক্ষণ থম দাঁড়িয়ে থেকে সোহিনী একটা ট্যাক্সি ধরেছে। অন্ধকার এখনও গাঢ় হয়নি, চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামছে সবে। নবীন চৈত্রের বাতাস এখন যথেষ্ট উদ্দাম। হাওয়ার ঝাপটা ভাল লাগছিল না সোহিনীর, জানলার কাচটা তুলে দিল। সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুজেছে। মন যেন এখনও খবরটা মানতে চাইছে না। ভাস্করের মতো শক্তসমর্থ লোকের এ হেন ভয়ংকর ব্যাধি? নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হচ্ছে। ছিল ঘাড়ে ব্যথা, অথচ অসুখ কিনা ফুসফুসে? ডক্টর সেনগুপ্ত বলে যাকে দেখাচ্ছে, সে ঠিকঠাক তো? অনেক সময়ে ডাক্তাররা আসল রোগ ধরতে পারে না, যা হোক তা হোক নিদান হাঁকে। কিংবা ভয় দেখিয়ে রোগী হাতে রাখতে চায়। চিকিৎসা তো এখন ব্যাবসা। গুচ্ছের টেস্ট করিয়ে ডাক্তাররা কমিশন তো খায়ই, তারপর ভুলভাল ট্রিটমেন্টে রোগীর পরিবারকে ছিবড়ে করে ছাড়ে।

কিন্তু তরুণ ব্যানার্জি কি আজেবাজে ডাক্তারের কাছে যাবে? নিজের একমাত্র শ্যালককে নিয়ে? তা ছাড়া সোহিনী নিজেও তো দেখেছে স্ক্যান রিপোর্ট। গোলমাল তো একটা রয়েছেই।

কী বিচ্ছিরি দোলাচল! অদৃশ্য এক তুলাদণ্ডে যেন ওজন হচ্ছে সত্যি-মিথ্যের শঙ্কা। সংকটের মুহূর্তে তুলাদণ্ডও বুঝি অসহায়। কোন দিকে যে ঝুঁকবে ভেবে পায় না।

সোহিনীর এখন কী যে করা উচিত? থই না পেয়ে ব্যাগ থেকে মোবাইল হাতে তুলেছে। অশান্ত আঙুল খুঁজছে অনুপমকে। সুইচ্‌ড অফ। ছ'টা বেজে গেল, এখনও চলছে সেমিনার? কিন্তু একজন কাউকে তো বলা দরকার। একা একা দুশ্চিন্তার বোঝা টানা বড় দুঃসহ। দাদাকে ফোন করবে? নাহ্, যা নার্ভাস টাইপ, হিতে বিপরীত হতে পারে। সুকন্যার বর ডাক্তার। গায়নোকলজিস্ট।

তবু তার মতামত তো নেওয়াই যায়। কিন্তু আবার সেই বন্ধুকে সব খুলে বলো, হাজার প্রশ্নের উত্তর দাও...।

ভার ভার মাথায় আবাসনের গেটে ট্যাক্সি ছাড়ল সোহিনী। ফ্ল্যাটে ঢুকেই স্নায়ুতে জবরদস্ত ঝাঁকুনি। দিব্যি ফুর্তির হাট বসেছে লিভিংহলে। টিভির মনে টিভি চলছে গাঁকগাঁক, আর এদিকে বাপ-ছেলে লুডো খেলায় মত্ত। শাশুড়ি ঠাকরুনও গদগদ মুখে নাতির পাশটিতে আসীন। উপভোগ করছেন বাপ-ছেলের দ্বৈরথ।

পলকের জন্য সোহিনী বিবশ। দ্যাখো কাণ্ড! যার অসুখ তার বিন্দুমাত্র বিকার নেই! তার মাতৃদেবীও যথেষ্ট প্রফুল্ল! আর ছেলে তো খুশিতে চনমন! আর যে এই সংসার থেকে এক পা উঠিয়ে নিয়েছে, সেই কিনা ভেবে ভেবে আকুল!

পাপানই দরজা খুলেছিল। ফের গিয়ে বসেছে সোফায়। উল্লসিত স্বরে বলল, দেখে যাও মা, দেখে যাও। বাবার তিনটে রেড গুটি এখনও ঘরে।

তৎক্ষণাৎ ভাস্করের লঘু ধমক, অত তিড়িংবিড়িং লাফাস না। খেলার এখনও ঢের বাকি। ঘর থেকে বেরোলেই তোর একটা পাকা গুটি কপাং খাব।

আগে বেরোও তো।

এই তো, ছক্কা পড়ল বলে।

চিটিং করবে না কিন্তু।

অ্যাই, আমি কখনও চোট্টামি করি? ভাস্কর চ্যাটার্জি অলওয়েজ ফেয়ার গেমে বিশ্বাসী। ঠিক কি না, সোহিনী?

সোহিনীর মুখখানা আরও গোমড়া হল। ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা জলের বোতল নিয়ে খেল এক ঢোক। ঘরে যেতে যেতে ছেলেকে বলল, পড়তে কখন বসা হবে?

আর একটা গেম, মা। বাবাকে মোট তিনবার হারিয়ে....

না। এই দানটা খেলেই ওঠো।

ওমনি বাপ-ছেলেতে চোখে চোখে ইশারা। ভাস্কর তড়িঘড়ি বলল, আজ তোমার রেস্ট। আমিই হোমটাস্ক করিয়ে দেব।

এধরনের আহ্লাদি কথায় সোহিনীর মাথা গরম হয়ে ওঠে। কস্মিনকালে যে ছেলের লেখাপড়ার খোঁজ রাখে না, হঠাৎ হঠাৎ তার দায়িত্বশীল পিতা

সাজার শখ যথেষ্ট পিত্তি জ্বালানো। কিন্তু এই মুহূর্তে রাগ দেখানো সোহিনীর সাজে কি?

বাড়তি কথায় না গিয়ে সোহিনী ঘরে এসে বিছানায় বসল। প্রায় তার পিছন পিছন বনানীও দরজায়, চা খাবে তো?

সোহিনী দায়সারা ভাবে বলল, করতে পারেন। না করলেও হয়।

না না, জল বসিয়েছি। বাবুনও চা-চা করছিল। একটু থেমে বনানী ফের বলল, সঙ্গে মোহনভোগ দিই? বাবুন খেতে চাইছিল বলে বিকেলে বানিয়েছি।

অতি সাধারণ ঘটনা। ছেলের বাসনা জেগেছে, মা তা পূরণ করেছে—এমনটা তো এ-বাড়িতে হরবখতই ঘটে, তবু সোহিনীর আজ কেমন কানে লাগল। কানে? নাকি আরও ভেতরে কোথাও? এক দিকে সুনামি ধেয়ে আসছে নিঃশব্দে, অন্য দিকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছোট্ট পৃথিবীটি সুছন্দে বহমান—দুটো দৃশ্য একই সঙ্গে বোধের মধ্যে আনা সত্যিই ভারী কঠিন।

সোহিনী এই সুখী সুখী পরিবেশের শরিক নয়। হওয়ার ইচ্ছেও নেই। তবু বলে ফেলল, দিন অল্প করে।

শুনেই গেল না বনানী, দাঁড়িয়ে আছে। লাগোয়া বাথরুমে ঢুকতে গিয়েও সোহিনী ঘুরে তাকাল, আর কিছু বলবেন?

বাবুনের নাকি আবার একটা টেস্ট হবে?

সোহিনীর চোখে বিস্ময়, কে বলল?

একটু আগে তরুণ ফোন করেছিল। এক্স-রে দেখে ডাক্তার নাকি...। কী টেস্ট তুমি জানো কিছু?

না তো। ফস্ করে বলে দিয়ে সোহিনী ঈষৎ তটস্থ। বনানীর একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকাটা সহ্য হচ্ছে না। ভাস্করের জামাইবাবুটি তো আজব ব্যক্তি! সোহিনীকে বারবার নিষেধ করে নিজেই পুটুস ফোন ঝেড়ে দিয়েছে! সবই করে তরুণদা, কিন্তু সবেতেই যেন বেশি সর্দারি! বাথরুমের দরজা বন্ধ করতে করতে সোহিনী বলল, দেখছি। বেরিয়ে ফোন করছি তরুণদাকে।

ছোট্ট একটা স্নানে বুঝি খানিক সুস্থিত হল দেহমন। টেবিলে বসে চা-জলখাবার খেল সোহিনী। ভাস্কর সত্যি সত্যি পড়াচ্ছে ছেলেকে। দেখার প্রয়োজন নেই, শোনা যায় দিব্যি। যত না বোঝায় ভাস্কর, তার চেয়ে চেঁচায় বেশি। মাঝে মাঝে তার বিদঘুটে উপমায় ছেলে হাসছে খিলখিল। পাল্লা দিয়ে বাবারও পিলে চমকানো হাসি।

এই লোকের নাকি মারণব্যাধি? বিশ্বাস হয় না, সোহিনীর বিশ্বাস হয় না।

টিভির সামনে গিয়ে বসল সোহিনী। একটা-দুটো হিন্দি মেগা সিরিয়াল দেখে মাঝেমধ্যে, বুঝে নেয়, কাহিনি কতটা এগোল। সিরিয়াল তো জীবনের মতো দ্রুত ধাবমান নয়, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই চলে। হপ্তাখানেক বাদে দেখতে বসলেও খুব একটা অসুবিধে হয় না।

আজ অবশ্য সোহিনীর সামনে শুধুই চলমান ছবি। চোখ দেখছে, মগজ ভাবছে অন্য কথা। যদি সত্যিই ভাস্করের অসুখটা হয়ে থাকে, সোহিনীর কী হবে? নিশ্চয়ই সে ভাস্করকে ছেড়ে পালাতে পারবে না। পালানো যায়ও না। এত স্বপ্ন, এত বাসনা, এত আকাঙ্ক্ষা, সব কিছুরই কি তবে অপমৃত্যু ঘটবে? অনুপম দূরে দূরেই থাকবে চিরকাল?

আশ্চর্য, অনুপম কেন এখনও ফোন করল না? সোহিনীর বিফল আহ্বানের বারতা পেয়েও? সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য মনে পড়েছে, মোবাইল তো ব্যাগে! বাজলেও তো কানে আসবে না।

উঠে ফোনটা আনার কথা ভাবছিল সোহিনী, পাশে ভাস্কর। সেন্টারটেবিলে পা তুলে দিয়ে আপন মনে বলল, বাচ্চাদের পড়ানো খুব ঝঞ্ঝাটের কাজ। আমি আর ওতে নেই।

বলব না, বলব না করেও সোহিনীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, এক দিনেই দম শেষ?

বলতে পারো। সত্যি, বেশি স্ট্রেন নিতে পারছি না।

কেন, বেশ তো খেলছিলে, হাসছিলে...

তখন অনেক বেটার ছিলাম। ইনফ্যাক্ট, আজ সারাদিনই ভাল আছি। এই এখন আবার মাথা টিপটিপ শুরু হল।

বাড়তে দিয়ো না। ওষুধটা খেয়ে নাও। সোহিনী আড়ে তাকাল, তরুণদা তোমায় ফোনে কী বলেছে?

হ্যাঁ, লাঙ্‌সে নাকি জল জমেছে। শালা কী করে জমল? ভাস্কর ফ্যাকাশে হাসল, শরীরটা আমার একদম পচে গেছে, বুঝলে। এদিকে ব্রঙ্কিয়াল প্যাচ, ওদিকে ব্রেনে গড়বড়...

সোহিনী চুপ। ভাস্কর নিজেই আবার বলল, এখন আবার লাং-এর রস টেস্ট করানো...কোনও মানে হয়?

যা করাতে হবে, তা করাতেই হবে। সোহিনীর স্বর সতর্ক, এত মানে খুঁজলে চলে না।

আমার আর ইচ্ছে করছে না। শুয়ে-বসে থেকে শরীরটাও কমজোরি মেরে যাচ্ছে...

সোহিনী উঠে দাঁড়াল। ভাস্করের সঙ্গে বেশি কথোপকথন এখন নিরাপদ নয়। কখন মুখ ফসকে কী বেরিয়ে যায় তার ঠিক আছে? পাপানকে খাওয়াচ্ছে ধনানী, সেদিকে একবার তাকিয়ে সটান ঘরে। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে মোবাইলখানা নিয়ে দেখল মিস্‌ড কল আছে একটা। অনুপমের নয়, বৈশাখীর।

দেখেই কেমন এক অস্বচ্ছন্দ অনুভূতি। তার উকিল বন্ধুটি কলকাতায় ফিরেছে তা হলে? সৌজন্যের খাতিরেও তো সোহিনীর তাকে ফিরতি-ফোন লাগানো উচিত। কিন্তু সে বলবেটা কী?

খানিক দোনামোনা করে বৈশাখীর নম্বরটা টিপল সোহিনী। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওপারে বৈশাখীর গলা, কী রে, কোথায় থাকিস? ঘণ্টি বেজে যায়?

এই একটু...। ফিরলি কবে?

পরশু। হঠাৎ এখন চেম্বারে বসে খেয়াল হল, তোকে তো কল করা হয়নি!...তুই শনিবার আসছিস তো? তোর জন্য ইভনিংটা কিন্তু ফ্রি রাখছি।

সোহিনী আমতা আমতা করে বলল, এখন আমার একটু অসুবিধে হয়ে যাচ্ছে রে।

অ। বরের সঙ্গে বুঝি মিটমাট হয়ে গেল?

না, ঠিক তা নয়...

বুঝেছি। এখনও বলে উঠতে পারিসনি, তাই তো?

হ্যাঁ।...অ্যাকচুয়ালি ও এখন একটু অসুস্থ...

সো হোয়াট? শরীর থাকলেই খারাপ হবে। তার জন্য তুই ফালতু ডিলে করবি কেন?

সোহিনী দ্বিধায় পড়ে গেল। ভাস্করের অসুখটার কথা বলে দেবে বৈশাখীকে? কিন্তু রোগটা যদি না হয়ে থাকে...।

ফের বৈশাখীর স্বর বাজছে, কী ব্যাপার বল তো? তুই নিজেই এসে বললি, বরের সঙ্গে আর এক মুহূর্তও টিকতে পারছিস না... তোর লাইফ হেল করে ছাড়ছে...!

সোহিনী এবারও চুপ। কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। কথা হাতড়াচ্ছিল।

পাঁচ

...বাঁয়ে গভীর গিরিখাত, ডাইনে খাড়া পাহাড়। মাঝে এবড়োখেবড়ো সরু পাথুরে রাস্তা। পাকদণ্ডী বেয়ে ঘুরে ঘুরে উঠছিল ভাস্কর। পিঠে হ্যাভারস্যাক, চোখে রোদচশমা, হাতে লাঠি। বোঝাটা বড্ড ভারী, ভাস্কর নুয়ে নুয়ে পড়েছে। এইমাত্র দেবজিৎ আর সুগত পাশে পাশে ছিল, লম্বা লম্বা পায়ে তারা এগিয়ে গেছে, এখন দৃষ্টিসীমার বাইরে। ভাস্কর চেঁচিয়ে ডাকল তাদের, স্বর ফুটছে না। হঠাৎ কোত্থেকে চাপ চাপ কুয়াশা। পথ আঁধার, হাতড়ে হাতড়ে চলছে ভাস্কর। প্রাণপণে হাঁটার গতি বাড়াতে চাইল, কে যেন পিছন থেকে টেনে টেনে ধরছে। দুম করে কখন রাস্তা শেষ। সামনে এক ঝুলন্ত সেতু, নীচে তার খর ধারা। ভাস্কর টলমল পায়ে সেতু পেরোচ্ছে এবার। দড়ির ব্রিজ দুলছে ভীষণ। ভাস্কর কিছুতেই টাল সামলাতে পারছে না। পড়ে যাচ্ছে ভাস্কর...পড়ে যাচ্ছে...

ওই পতনের ধাক্কাতেই তন্দ্রা ছিঁড়ে খানখান। ভাস্কর ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। ঘামছে রীতিমতো। দিনদুপুরে এ কী বিটকেল স্বপ্ন? খবরের কাগজ নিয়ে শুয়ে ছিল, ঘুমিয়েই বা পড়ল কখন?

এমনটা এখন ঘটছে ভাস্করের। নিড্‌ল বায়োপসির পর থেকেই। একটু গড়াল কি গড়াল না, জড়িয়ে আসছে চোখ। ওমনি কোত্থেকে রাশি রাশি ছবিও হাজির। আগে ভাস্কর খুব একটা স্বপ্নটপ্ন দেখত না, বিছানায় পড়লেই তো নাক ডাকছে। গত দু'দিন ধরে ঘুমটাও কেমন পাতলা পাতলা। সঙ্গে বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি দৃশ্য। কখনও বয়লারের সিঁড়ি থেকে পা পিছলে গেল, কখনও জলে ডুবে যাচ্ছে, কখনও বা পাহাড়চূড়া থেকে তাকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে কোনও অজানা হাত...। আশ্চর্য, মনেও থাকছে স্বপ্নগুলো! জেগে ওঠার পরেও কতক্ষণ যে রেশ রয়ে যায়!

ভাস্কর কি ভয় পেয়েছে? তরুণ তাকে যা-খুশি পড়াক, সোহিনী যতই এড়িয়ে যাক, ছুঁচ ফুটিয়ে রস বার করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অর্থ না বোঝার মতো মূর্খ সে নয়। ব্রেনস্পট আর ফুসফুসের আবছায়ার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক তো আছেই। এখন বায়োপসির ফলাফল জানা গেলেই ষোলো কলা পূর্ণ হয়। কিন্তু সেই কারণে পেটের ভেতর হাত-পা সেঁধিয়ে যাবে, কিংবা অহরহ দুঃস্বপ্ন দেখবে, ভাস্কর চ্যাটার্জি কি সেই প্রজাতির মানুষ?

তবু কেন যে হঠাৎ হঠাৎ শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল স্রোত বয়ে যায়? কী নাম ওই স্রোতের?

ভাস্কর বিছানা ছেড়ে নামল। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল এক জায়গায়। তারপর বাথরুম ঘুরে এসে পাখা বাড়িয়ে দিল। আবার বসেছে শয্যায়। রিপোর্টটা আজ কে আনবে? তরুণদা? না সোহিনী? অবশ্যই দেখে নেবে কী আছে রিপোর্টে! তারপর এসে নিশ্চয়ই প্রবোধবাক্য! নাকি নিষ্ঠুরের মতো ঘোষণা করবে দণ্ডাজ্ঞা?

ধুস, ফের উলটোপালটা চিন্তা। নাহ্, ভাস্কর বোধহয় ভয়ই পাচ্ছে। বায়োপসি তো এক ধরনের রুটিন পরীক্ষা। মা'র গলব্লাডার অপারেশনের পরেও হয়েছিল। শতকরা সাড়ে নিরানব্বইটা ক্ষেত্রে বায়োপসি রিপোর্ট তো নেগেটিভই আসে, নয় কি?

ভাবনাটাকে পছন্দসই খাতে বইয়ে দিতে পেরে ভাস্কর খানিক চনমনে বোধ করল। দিনভর এই একা একা থাকাটাই বুঝি কাল হয়েছে। যত্ত সব আলফাল ব্যাপার গোল পাকায় মাথায়। অফিস যেতে পারলে লোকজন আর কাজকর্মের মাঝে কুটকুটে পোকামাকড়গুলো মগজের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারত না। উঁহুঁ কিছু একটা করা দরকার।

টিভি দেখবে? পাপানের 'সিআইডি' আজকাল ভাস্করকেও বেশ টানছে। কতরকম জীবন, কত বিচিত্র অপরাধের অনুসন্ধান...। স্পোর্টস চ্যানেলও খোলা যায়, কিংবা সিনেমা-টিনেমা...। কিন্তু মা বোধহয় শুয়েছে, আওয়াজে জেগে যেতে পারে।

ফোন লাগাবে বন্ধুদের? কাকে করবে? এই দুপুর-বিকেলে সকলেই তো ব্যস্ত যে যার মতো। তাদের ডেকে ডেকে নিজের সংবাদ প্রচার করার প্রয়োজন আছে কোনও? বরং অফিসে একটা ফোন করা যাক। সপ্তাহ ঘুরে গেল, কারও সঙ্গে যোগাযোগ নেই...

বালিশের তলা থেকে মোবাইলটা টেনে চেনা নম্বর টিপল ভাস্কর। বেজেছে। ওপারে তুহিনের গলা, আরে চ্যাটার্জি যে? খবর কী? আছ কেমন?

এই তো... না মরে বেঁচে আছি।

বালাই ষাট, মরবে কেন। দেশে কি মরার লোকের অভাব পড়েছে?

তা বটে। টিভি, খবরের কাগজ খুললেই তো শুধু ডেডবডি।

মানুষের প্রাণ খুব সস্তা হয়ে গেছে, বুঝলে।...গেছে তোমার ঘাড়ব্যথাটা?

কই আর। মনে হচ্ছে ওটা আমার চিরদিনের সাথী হয়ে গেল।

তোমার ডাক্তার কী বলছে?

কথা কম, কাজ বেশি। ধরাধ্ধড় শুধু টেস্ট করাচ্ছে।

ওটাই তো ডাক্তারদের কায়দা, ব্রাদার। রোগ ডিটেকশনের জেরে তোমার পকেট ফরসা। নিশ্চয়ই এখনও পায়নি কিছু?

সাতকাহন খুলে বসতে অস্বস্তি হল ভাস্করের। এড়িয়ে যাওয়া ভঙ্গিতে বলল, ওই কী সব যেন...

আমি তোমাকে বলছি চ্যাটার্জি, ওদের ভরসায় থেকো না। ন্যাচারাল হিলিং-এর চেষ্টা করো। ফলো বামদেব।

ভাস্করের বলতে ইচ্ছে হল, সে সুযোগ বোধহয় আমার আর নেই। আমার বিধিই বাম। নিজেকে জোর দিতেই বুঝি শব্দ করে হেসে উঠল, আরে, সে হবেখন। এখন একটু অফিসের গল্প শুনি।

কী জানতে চাও?

নতুন চিফ ইঞ্জিনিয়ার কে হচ্ছে, কিছু শুনলে?

বোধহয় বীরেন গুহ। খোদ জায়গায় নাকি ব্যাটা নৈবেদ্য চড়িয়েছে।

তা হলে তো অজিত বোস কেস ঠুকে দেবে। সে তো সিনিয়ার মোস্ট।

এফিশিয়েন্সি সিনিয়রিটির জমানা গেছে ভাই। এখন শুধু জায়গা বুঝে অয়েল মেরে যাও। কেস করে বোসের হবেটা কী? চাকরি তো বাকি মোটে সাত মাস। মামলা উঠতে উঠতে বেলপাতা এসে যাবে।

অফিসের গালগল্পে শরীর যেন টনকো হয়ে ওঠে। ভাস্কর জিজ্ঞেস করল, আর আমাদের বিতনুর কী সমাচার? রিজাইন করল?

আরে ছাড়ো। চাকরিকে লাথি মেরে অ্যাকাডেমিক লাইনে চলে যাওয়া অত সোজা?...তুমি জয়েন করছ কবে?

দেখি। বাড়িতে থেকে নাটবল্টুতে তো মরচে ধরে যাচ্ছে।

তা হলে আর কী। ফিট সার্টিফিকেট বাগিয়ে এবার চলে এসো। তুমি বিহনে তোমার গুঁফো বদ্‌রি কেমন ঝিম মেরে গেছে।

ঠাট্টাটুকুতে হাসল বটে ভাস্কর, কিন্তু ফোন ছাড়তেই মগজে টকটক টোকা। পিঠ বেয়ে আবার সেই হিমশীতল স্রোত।

ফিট সার্টিফিকেট যে কবে মিলবে? আদৌ মিলবে তো?

ওফ্, ফের ভাস্কর বেলাইনে ঢুকছে! হচ্ছেটা কী এসব? কিছুতেই কি নিজেকে বাগে রাখা যাবে না?

রান্নাঘরে টুংটাং আওয়াজ। বনানী বুঝি উঠল, চা বসাচ্ছে। কাপ-কেটলি-চামচের অতি মৃদু ধ্বনি, সেটুকুই বুঝি নির্জন ফ্ল্যাটে উচ্চকিত শোনায়।

খবরের কাগজখানা নিয়ে লিভিংহলে এল ভাস্কর। সেন্টারটেবিলের তলার তাকে কাগজ রেখে সোফায় বসেছে, বনানী চা নিয়ে হাজির। সঙ্গে বিস্কুটের কৌটো।

ঠোঁট বেঁকিয়ে ভাস্কর বলল, ফের হাতে ওই ডাব্বা? কতবার বলেছি, চায়ের সঙ্গে কিছু চাই না।

শুধু চা খাস না বাবুন। গ্যাস হবে। ছোটখাটো রোগাসোগা বনানীর স্বরে সস্নেহ ধমক, কড়া কড়া ব্যথার বড়ি পড়ছে, এমনিই তো তোর খালিপেটে থাকা উচিত নয়।

ভাস্কর অপাঙ্গে দেখল মাকে। বুদ্ধি মা'র কম নেই, তবু মাঝে মাঝে এমন আজব কথা বলে! ব্যঙ্গের সুরে বলল, সাড়ে বারোটায় ভাত খেলাম। এখনও চারটে বাজেনি। এর মধ্যে পেট খালি?

হ্যাঁ, তাই। ভাত আর কতটুকুই বা খেয়েছিস!

আমি তো আজকাল ওরকমই খাই মা। বেশি খেলে বমি করে ফেলব।

সেটা এমন কিছু বাহাদুরি নয়। মাত্র ক'টা দিনে কেমন কাহিল হয়ে গেলি, আমি দেখছি না? খেয়ে উঠে আঁচানোর সময়ে টলে গেলি, দেওয়াল ধরে সামলালি... ভাবছিস আমার চোখে পড়েনি?

ঈষৎ অপ্রস্তুত হল ভাস্কর। বাড়িতে আবদ্ধ থেকে শুধু শরীর নয়, মনটাও যেন কমজোরি। তরুণদার নির্দেশমাফিক পথেঘাটে একা একা বেরোনো এখন একদম চলবে না। দিদি তো কালও এসে বরের হয়ে খবরদারি মেরে গেল। নীচে নামার প্রসঙ্গ তুললেই মা-ও এমন হাঁ হাঁ করে ওঠে, সিঁড়িতে পা রাখতে ইচ্ছে করে না।

হাত উলটে ভাস্কর বলল, দিনরাত বন্দি থাকলে উইক তো হবই। আমার বাজার যাওয়াটা পর্যন্ত তোমরা বন্ধ করে দিয়েছ।

তুইই তো বলিস, সকালে মাথাটা থানইট হয়ে থাকে।

ভুল বলেনি মা। উপসর্গটা বেড়েছে। গোটা সকালটাই ভাস্করকে বেশ

ঝামেলায় রাখে। ঘরে খানিক হাঁটাচলার পর এই দুপুর থেকে অনেকটা সযুত শরীর। পেনকিলারটাও কাজ করতে বড্ড দেরি করছে এখন!

ভাস্কর খানিক জোর করেই তর্ক জুড়ল, সকালে না হোক, বিকেলে তো বাজার যেতে পারি। এ বেলাতেও মাছ, সবজি, সবই বসে।

ছেলেমানুষের মতো বকিস না। মাথা ঘুরছে...রাস্তায় কোথায় উলটে পড়বি...

এটা তোমাদের বাড়াবাড়ি, মা। মাঝখান থেকে সোহিনীর কাঁধে একগাদা ঝামেলা চাপল। বেচারা জীবনে কখনও বাজার মাড়ায়নি, এখন আলুপটল কিনছে, মাছের সুগন্ধি গলতাটায় ঢুকছে...।

তো কী আছে বাবুন? বরের শরীর খারাপ হলে বউকে তো ওটুকু করতেই হবে।

ভাল, ভাল। এখন রোজ তবে কাটাপোনাই গেলো। সে তো ওই একটি বই মাছ চেনে না। আর ওই ডিপফ্রিজের মুরগি! আমার দু'চক্ষের বিষ। দেখলেই গা গুলোয়।

নাকচোখ বন্ধ রাখ বাবুন। ফেরে পড়লে মানুষকে সবই হজম করতে হয়।

উপদেশটা ভাস্করের মনঃপূত হল না। তবে কিছু আর বললও না। কাপ শেষ করে রাখল সেন্টারটেবিলে। টিভির রিমোট খুঁজছে।

বনানী কাপ-ডিশ নিয়ে উঠে যাচ্ছিল, হঠাৎই ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যাঁরে, তোর বন্ধু তো এর মধ্যে একদিনও এল না?

কোন বন্ধু?

কে আবার! অনুপম।

খবর পায়নি বোধহয়।

সোহিনী জানায়নি?

ভাস্কর থতমত খেল। প্রশ্নটা যেন তত সরল নয়। সত্তর ছুঁইছুঁই বনানী দেবীর নজর অতি তীক্ষ্ণ। তার উপস্থিতি বিনা এ সংসার মসৃণভাবে চলা সম্ভব ছিল না, জানে ভাস্কর। একমাত্র পাপান ছাড়া এ-বাড়ির কোন ব্যাপারেই বা সোহিনীর আগ্রহ আছে? বনানী সংশক্তি বল হয়ে বেঁধে রেখেছে বলেই না...। সেই বনানী দেবী কিন্তু সোহিনী-অনুপমের বন্ধুত্বে মোটেই প্রীত নয়, ভাস্কর টের পায়। ধরে নিয়েছে এটা মা'র সংকীর্ণতা। দৃষ্টিভঙ্গির দোষ। ছেলের

বউ ছেলের বন্ধুর সঙ্গে ড্যাডাং ড্যাডাং সিনেমা-থিয়েটার যাচ্ছে, কোন মা তা খোলামনে মেনে নিতে পারে!

সচেতনভাবেই ভাস্কর দায়সারা জবাব দিল, কী জানি, সোহিনীকে জিজ্ঞেস করতে হবে...। হয়তো বলেনি...হয়তো বলেছে...হয়তো অনুপম ব্যস্ত...হয়তো কলকাতায় নেই...

তাই হবে। বনানী রান্নাঘরের দিকে এগোল, খবর পেলে অনুপম অন্তত ফোন একটা করত। তাই না?

আজকালের মধ্যে হয়তো করবে।

অনুপমের আসাটা কিন্তু ইদানীং কমে গেছে।

তো?

নাহ্...হঠাৎ মনে হল, তাই বললাম।

আশা করা যায় মা'র এই কৌতূহলের সঙ্গে তার অনুদারতার কোনও সম্পর্ক নেই? ভাস্কর রিমোটে টিভি অন করল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজায় মুহুর্মুহু বেল। শ্রীমান পাপান ফিরলেন। ঢুকেই স্কুল ব্যাগ ছুড়ল সোফায়। জুতো এক দিকে ছিটকে গেল, মোজা এক দিকে। বাবার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে রিমোট, আমি হাঙ্গামা দেখব।

লক্ষ্মী পাপান, ম্যান-ইউ আর আরসেনালের ভাইটাল ম্যাচ...একটু দেখি।

না। এখন আমার চ্যানেল চলবে।

বেশিক্ষণ অবশ্য হাঙ্গামা পোহাতে হল না। পাপানের এখন চনচনে খিদে, বনানী খাবারের প্লেট টেবিলে রাখতেই উঠে গেল সুড়সুড়। গপাগপ গিলে, ইউনিফর্ম বদলে, ছেলে তুরন্ত হাওয়া।

ভাস্করেরও আর টিভিতে মন বসছিল না। বিকেলের এই সময়টায় রোজ রোজ রঙিন পরদায় দৃষ্টি গেঁথে রাখা কি তার পোষায়! উঠে লিভিংহল সংলগ্ন ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের এই তিন কামরার ফ্ল্যাটটি তেমন বড় নয়। পাপানের ঘর তো বেশ ছোট। কিচেন, বাথরুম, লিভিংহল, নেহাতই বিশেষত্বহীন। শুধু এই অলিন্দটিই ভারী বাহারি। আকারে অর্ধবৃত্ত, যথেষ্ট প্রশস্ত, রেলিং-এ লতাপাতার কাজ...। ফ্ল্যাট কেনায় সোহিনীর আপত্তি ছিল। সে বোধহয় চেয়েছিল বাইপাসের ধারে জমি কিনে ভাস্কর বাড়ি বানাক। যদিও মুখ ফুটে বলেনি কখনও। যাদবপুর অঞ্চলটাও সম্ভবত তার মনোমত নয়। শুধু এই বারান্দাটাই যা সোহিনীর চোখে মোটামুটি চলনসই। শোভাবাজারের

গাঙ্গুলি বাড়ির 'সমস্কৃতিবান' মেয়ের তারিফ পাওয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করে ভাস্কর। একটু বুঝি আফশোসও জাগে, চিরকাল ভাড়াবাড়িতে বাস করা তার বাবা ফ্ল্যাটখানা দেখে যেতে পারল না। এমন একখানা ব্যালকনি পেলে বাবা যে কী আহ্লাদিত হত!

বাইরে একটা চমৎকার দিন ফুটে আছে। সূর্য নেমে গেছে অনেকটা, পশ্চিম আকাশে ছোপ লাগছে লালের। আবাসনের গেটে সেপাইয়ের মতো খাড়া কৃষ্ণচূড়া ফুলে ফুলে ছয়লাপ। গাঢ় লাল যেন চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। নরম সোনালি আলোয় হাসছে চরাচর, নীচের চত্বরটায় খেলছে বাচ্চারা, দুটো শালিখ কেব্‌লের তারে এসে বসল—সব মিলিয়ে ছবিটা ভারী মনোরম।

নির্নিমেষ দেখছিল ভাস্কর। হঠাৎই বুকটা ছ্যাঁৎ। কী পাওয়া যাবে আজ বায়োপসি রিপোর্টে? পৃথিবীটাকে এভাবে তারিয়ে তারিয়ে দেখার দিন কি খতম?

উফ্, ভাবনাটা যেন কুকুরতাড়া করছে! হস্টেলের রাজেশ ত্রিবেদীকে মনে পড়ল সহসা। কোনও ফ্যাসাদে পড়লেই তার বাঁধা লব্‌জ ছিল, ইতনা সোচতা কিঁউ? যো হোগা সো দেখা যায়েগা। মরনেসে জাদা আউর কেয়া হোগা, হাঁ? ঠিকই তো, ভাস্কর বড়জোর মরে যাবে, তার বেশি আর কী? ঢের তো বাঁচা হল, বিয়াল্লিশ বছর তো কম সময় নয়। যেতেই যদি হয়, বুক ফুলিয়ে চলে যাবে ভাস্কর। অনর্থক ধুকপুকুনিতে সিঁটিয়ে থাকবে কেন?

উঁহুঁ, যুক্তিটায় কোথায় যেন ফাঁক আছে। ভাস্কর একটুও হালকা হল না। বিস্বাদ মুখে দেখছে বাইরেটা। গেটের সামনে রিকশাওয়ালার সঙ্গে তুমুল বচসা বেধেছে এক সওয়ারির। নাকের ডগা দিয়ে তিন-চারটে কাক কর্কশ শব্দ করতে করতে উড়ে গেল। কোত্থেকে ডেলা ডেলা মেঘ এসে হানা দিয়েছে পশ্চিমের আকাশে। রক্তিম আভা মুছে গিয়ে আকাশ পাঁশুটে হঠাৎ।

কী রে, এবার কিছু খাবি তো?

বনানীর গলা পেয়ে ঝপ করে চটে গেল ভাস্কর। উষ্মাভরে বলল, ফের আমাকে নিয়ে পড়লে?

আহা, এই সময় তো রোজ কিছু একটা খাস।

আমার ইচ্ছে করছে না। গা জড়াচ্ছে।

নির্ঘাত অম্বল।...ক'টা শুকনো চিঁড়েভাজা মুখে দে।

কেন বোর করছ? ভাস্কর প্রায় খিঁচিয়ে উঠল, যাও তো পাশ থেকে। কাটো।

বনানী তবু গেল না। নরম গলায় বলল, বুঝি রে, বুঝি। শরীরে যুত না থাকলে মেজাজও বিগড়ে থাকে। তাই তো বলি, একটু পুষ্টি নে। শুধু ডিমসেদ্ধ করে দিই? নুন-গোলমরিচ দিয়ে খা, জিভে স্বাদ পাবি।

ভাস্কর আর তিষ্ঠোতে পারছিল না। যতক্ষণ সে থাকবে এখানে, মা'র ঘ্যানঘ্যান চলবে। ব্যালকনি ছেড়ে ভাস্কর পলকে শোওয়ার ঘরে। গায়ে হাফ-পাঞ্জাবি চড়াচ্ছে। গলা উচিয়ে বলল, আমি নীচে যাচ্ছি।

ওমা...সে কী...না না...। বনানী পক্ষীমাতার মতো ধেয়ে এসেছে। মিনতির সুরে বলল, অমন করতে নেই বাবুন।

আমাকে কী করতে আছে, কী করতে নেই, তা আমাকেই ঠিক করতে দাও।

নীচে কোথায় টো-টো করবি? আমি সঙ্গে আসব?

প্লিজ মা, একটু শান্তি দাও। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

গটগটিয়ে বেরোল ভাস্কর। চটি গলিয়ে দরজা খুলছে, বনানী দৌড়ে এসে মোবাইলটা হাতে ধরিয়ে দিল, এটা অন্তত কাছে রাখ। অসোয়াস্তি হলে আমাকে ডাকিস।

ভাস্কর অসন্তুষ্ট মুখে সেলফোনখানা নিল। নামছে সিঁড়ি দিয়ে। দোতলার ল্যান্ডিং-এ সুষমা। ভাস্করকে দেখে তার চোখ গোল গোল, এ কী দাদা, কোথায় যাচ্ছ?

ভাস্কর কষ্ট করে হাসল, কোথাও না। এমনিই।

বেশি এদিক-ওদিক কোরো না। শরীর বুঝে বেরিয়ো।

তপ্ত হতে গিয়েও ভাস্কর হেসে ফেলল। বোঝো দশা! হাতি পাঁকে পড়লে চামচিকেতেও ভজন শোনায়! নীচে পাপান খেলছে, সেও না এবার বাপকে চাট্টি জ্ঞান ঝাড়ে!

ঘেরা কম্পাউন্ডে তিনখানা চারতলা বাড়ি। ইউ শেপের ফাঁকা জায়গাটিতে ক্রিকেট চলছে জোর। ব্যাট করছে পাপান, বাবাকে দেখে একবার হাত তুলল। যাক, ছেলে অন্তত রেহাই দিয়েছে। এক-পা, এক-পা করে ভাস্কর গেটের মুখে এল। চোখের সামনে চলন্ত দুনিয়া। ভেঁপু বাজিয়ে সাইকেলরিকশা ছুটছে, সুঁইসাঁই অটো। গাড়ি, ট্যাক্সিও যায় হুশহাশ। ফুচকার ঝাঁপি ঘিরে একপাল মেয়ে। রোল-চাউমিনের দোকানটায় খানেওয়ালাদের ভিড়। এক জোড়া একই ধাঁচের জিনস-টিশার্ট হেঁটে গেল সামনে দিয়ে। ছেলেটির পনিটেল, মেয়েটি

বয়কাট। মেয়েটি একবার তাকিয়ে দেখল ভাস্করকে, আবার যেন দেখলও না। থলি হাতে কুলায় ফিরছে ঠিকে-কাজের মেয়েরা। কী তাদের হাঁটার স্পিড, বাপ্‌স! গাদাখানেক প্যাকেট সাপটে চৈত্রসেলের বাজার সেরে আবাসনে ঢুকল পাপানের এক বন্ধুর মা। যেতে যেতে টুকরো হাসি উপহার দিয়ে গেল ভাস্করকে। দখিনা বাতাস বইছে আচম্বিতে, দেহ যেন জুড়িয়ে আসে।

আহ্, বেঁচে থাকায় বড় সুখ। কেন খামোখা মরবে ভাস্কর? রিপোর্ট আজ ভালই আসবে। নিশ্চয়ই ভাল হবে। হতেই হবে। উইলফোর্স বলে তো একটা ব্যাপার আছে, না কী?

একতলার বান্টি কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরোচ্ছিল, দাঁড়িয়েছে ভাস্করকে দেখে। চোখ পিটপিট করে বলল, আপনি এখানে যে? শুনলাম আপনি বেড-রিডন?

আমি? শয্যাশায়ী?

কাল বউদির সঙ্গে দেখা। আপনার কাছে যাব ভাবছিলাম, শুনলাম আপনি বেডরেস্টে আছেন।

বেডরেস্টকে একেবারে বেড-রিডন বানিয়ে দিলে?

বছর পঁচিশেকের বান্টি এবার যেন লজ্জা পেয়েছে। হেসে বলল, যাক গে। ভাল থাকলেই ভাল। সোহিনী বউদি আপনাকে বলেছেন কিছু?

কী ব্যাপারে বলো তো?

এবার তো আমরা দুর্গাপুজো করছি। আমাদের এই 'আশাবরী'র সবাই মিলে।

তাই নাকি? গ্র্যান্ড আইডিয়া। গত বছরের আগের বছর আমি তো মিটিং-এ পুজোর কথা পেড়েছিলাম, কেউ তখন গা করল না।

এখন অনেকেই খুব উৎসাহী। আমি, টোটোন, জন, কাবুলরা বসে একটা রাফ এস্টিমেটও বানিয়ে ফেলেছি। ছত্রিশটা ফ্ল্যাট থেকে হাজার টাকা করে চাঁদা মানে ছত্রিশ হাজার। আর যদি ষাট-সত্তর হাজার টাকার স্পন্সরশিপ জোগাড় হয়...

মাত্র লাখ টাকায় দুর্গাপুজো?

না হওয়ার কী আছে? আমাদের তো তেমন জাঁকজমকের প্রয়োজন নেই, আসল তো হল হইচই। পুজোর তিনটে দিন কোনও বাড়িতে হাঁড়ি চড়বে না, দু'বেলাই প্যান্ডেলে খাওয়া-দাওয়া... দু'দিন নিরামিষ, একদিন আমিষ...

আমিষ কবে হবে? নবমীতে?

অত এখনও ফাইনাল হয়নি। সবাই মিলে বসা হোক, আলোচনা হোক্...। ভাবছি পয়লা বৈশাখ প্রশান্তকাকুকে একটা মিটিং ডাকতে বলব। নববর্ষের প্রীতি সম্মেলনও হবে, আবার পুজোর ব্যাপারটাও সেদিন...

দুর্গাপুজো তোলা কিন্তু মুখের কথা নয়। খাটাখাটুনির লোক পাবে তো?

আমরা আছি। মেয়েরাও আছে। কতজন বউদি-কাকিমা এখনই লাফালাফি শুরু করেছে, জানেন!

গুড। লাগাও তা হলে।

আপনাকে কিন্তু অ্যাড এনে দিতে হবে দাদা। প্লাস, খাটতেও হবে। আপনাদের এজ গ্রুপে আপনিই সবচেয়ে অ্যাজাইল।

শুনতে ভালই লাগল ভাস্করের। তবু বলে ফেলল, কিন্তু শরীরের যা হাল হয়েছে...

আহা, তদ্দিন আপনি অসুস্থ থাকবেন নাকি? পুজো তো এখনও বহু দূরে।

শেষ শব্দ দুটো আচমকাই কাঁপিয়ে দিল ভাস্করকে। যদি রোগটা বেধেই থাকে, পুজো অবধি সে এই ধরণীতে আছে তো?

আপনা-আপনি ভাস্করের মুখটা মলিন হয়ে গেল। অস্ফুটে বলল, হুঁ।

পয়লা বৈশাখের গ্যাদারিং-এ নিশ্চয়ই থাকছেন?

দেখি।

সোহিনী বউদি তো খালি কেটে কেটে বেরিয়ে যান। আপনাকে কিন্তু চাইই চাই।

এমন আহ্বান হৃদয়কে দুলিয়ে দেয়। কিন্তু ভাস্করের হাতে কিছু আছে কি?

ভাস্কর শুকনো হাসল, থাকলে আছি।

হেঁয়ালিটা বুঝল না বান্টি। অল্প হেসে বিদায় নিয়েছে। আস্তে আস্তে হেঁটে ভাস্কর পাপানদের খেলার জায়গাটায় এল। শুনছে তাদের হল্লাগুল্লা, দেখছে তাদের ছোটাছুটি। ফিল্ডিং-এও পাপানের মহা উৎসাহ, দৌড়ে দৌড়ে কুড়োচ্ছে বল। ছোট্ট হাতে ছুড়ছে অভ্রান্ত নিশানায়। ভাগ্যিস এই জমিটুকু ছেড়েছিল প্রোমোটার, নইলে কোথায় যে খেলত পাপানরা!

পকেটে মোবাইলের ডাকাডাকি। মা অধৈর্য হল নাকি? মাত্র তো আধঘণ্টা-চল্লিশ মিনিট বেরিয়েছে...এত টাকট্যাক করলে চলে!

না, মা নয়। তরুণদা।

পলকে ভাস্করের স্নায়ু টানটান। পিঠে সেই বরফের আঁচড়।

ঢোক গিলে বলল, কী খবর তরুণদা?

এই তো...কেমন আছ তুমি?

যেমন থাকি। সকালে ডাউন, বিকেলে আপ।

কী করছ এখন?

এই তো...। ভাস্কর সতর্ক হল, জাস্ট টাইম পাস...

শুয়ে আছ?

হ্যাঁ...না...মানে...

বুঝেছি। টিভি খুলে বসেছ।

ঠিক তাও নয়...। ভাস্কর অসহজ বোধ করল। তরুণদা এমন খোঁচায়, কাঁহাতক না, হ্যাঁ, মানে মানে করা যায়! শেষমেশ বলেই দিল, নীচে একটু হাঁটছি।

এটা তো উচিত কাজ হচ্ছে না। কতবার বলছি, তোমার একদম স্ট্রেন নেওয়া চলবে না...। মা তোমাকে অ্যালাও করলেন?

ভাস্কর বুঝে গেল রহস্যটা। মা চুকলি খেয়েছে তরুণদাকে। এবং তরুণ ব্যানার্জি প্যাঁচ কষে কষে ভাস্করকে পেড়ে ফেলছে।

ক্ষুব্ধ স্বরে ভাস্কর বলল, আমার কি দরজার বাইরে পা ফেলার স্বাধীনতাটাও নেই তরুণদা?

ডোন্ট বি সেন্টিমেন্টাল। প্র্যাকটিকাল হও, প্র্যাকটিকাল হও। বোঝার চেষ্টা করো, আমি কী বলছি, কেন বলছি...। যতই যা হোক, তুমি তো পাপান নও!

হুঁ...। ভাস্কর ক্ষণকাল নিঝুম। তারপর সাহস সঞ্চয় করে বলে ফেলল, আমার রিপোর্টটা পেলেন?

হ্যাঁ...না...মানে...। এবার তরুণ আমতা আমতা করছে, এই তো, আনতে যাব।

রিপোর্ট নিয়ে এখানে আসছেন তো?

দেখছি। আগে তো ডক্টর সেনগুপ্তর কাছে নিয়ে যেতে হবে...

ভাস্কর জিজ্ঞেস করতে চাইল, কী বেরোল সেটা জানাবেন তো! শব্দ এল না গলায়। ফাঁসির আদেশ শোনার জন্য এর চেয়ে বেশি উৎসুক হওয়া কি সাজে আসামির!

ও প্রান্তে তরুণও নিশ্চুপ। কয়েক সেকেন্ড, নাকি অনন্তকাল পরে তার গলা শোনা গেল, ছাড়ছি।

ভাস্কর নিথর দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। তারপর চলা শুরু করল, মন্থর পায়ে। হঠাৎই যেন অসম্ভব দুর্বলতা ভর করেছে সমগ্র দেহকাণ্ডে। হাঁটু থেকে পায়ের চেটো পর্যন্ত যেন অবশ। গলা, জিভ, ঠোঁট, সব বুঝি অসাড় হয়ে গেছে।

তবু টেনে টেনে হাঁটছিল ভাস্কর। সিঁড়ি ভাঙছিল। একটা একটা করে। মাত্র তিনতলা যেতে হবে, কিন্তু পথ যেন ফুরোয় না। নিজের বাড়ি তো যাচ্ছে ভাস্কর, সেটাও এত সুদূর!

আদৌ পৌঁছোতে পারবে তো? ভাস্করের সংশয় জাগছিল।

ছয়

ডক্টর সেনগুপ্ত হঠাৎ এই অসুখটাই সাসপেক্ট করলেন কেন?

না স্যার। উনি প্রথমে সেভাবে কিছু সন্দেহ করেননি। স্পন্ডিলাইটিসই ভেবেছিলেন। ঘাড়ব্যথা, মাথার যন্ত্রণার জন্য তখন পেনকিলার দেন। প্রবলেমটা রেকার করছে শুনে একটা ব্রেনস্ক্যানও করতে বলেন। স্ক্যান রিপোর্ট দেখে উনি তৎক্ষণাৎ চেস্ট এক্স-রে করান, তারপর নিড্‌ল বায়োপসি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। যখন বায়োপসি রিপোর্টও পজিটিভ এল, উনি স্পেশালিস্ট কনসাল্ট করতে বললেন। পাঠালেন আপনার কাছে।

উম্‌।... রিপোর্টগুলো এনেছেন নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ স্যার।

ফুসফুসের শল্যচিকিৎসক ডক্টর সমীর পালকে ফাইলটা বাড়িয়ে দিল তরুণ। কাজে কোনও ত্রুটি নেই তার, নিখুঁত সাজিয়ে রেখেছে রিপোর্টগুলো। পরপর উলটোচ্ছেন ডক্টর পাল। মাঝে মাঝে ভাঁজ পড়ছে কপালে। ভিউ-বক্সের আলো জ্বেলে এক্স-রে আর স্ক্যান প্লেট দুটো বসালেন একে একে। দেখছেন গভীর মনোযোগে।

তরুণের পাশের চেয়ারে সোহিনী। খানিক জড়সড় হয়ে বসে। পরশু তরুণের মুখে ফলাফলটা জানার পর থেকেই মস্তিষ্ক যেন ক্রিয়া করছে না।

ভাস্করকে এড়াতেই বুঝি কাল অফিসে পালিয়েছিল, যন্ত্রের মতো কাজ করেছে দিনভর। আজ এই ডাক্তারের চেম্বারেও এল প্রায় রোবটের মতো। তার ভূমিকা এবার ঠিক কী, এখনও যেন ঠাহর হচ্ছে না।

ভিউ-বক্সের বাতি নিভল। ডক্টর সমীর পালের মুখ অসম্ভব রকমের গম্ভীর। চোখ ঘুরিয়ে একবার সোহিনীকে দেখলেন, একবার তরুণকে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি সোহিনীতে থেমেছে, আপনি কি পেশেন্টের...?

মিসেস। তরুণের ঝটপট উত্তর, আমি ভগ্নীপতি। আই মিন, জামাইবাবু।

ও। সমীর ঠোঁটে ঠোঁট চাপলেন। স্থির চোখে কী যেন ভাবলেন একটুক্ষণ। সামান্য ঝুঁকে ফের সোহিনীকেই প্রশ্ন হেনেছেন, পেশেন্টের কি একটা সিম্পটমই ছিল? নেকপেন অ্যান্ড হেডেক?

সোহিনী অতি কষ্টে মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।...আর তো কোনও কমপ্লেন শুনিনি।

তরুণ পাশ থেকে বলল, একটা ভমিটিং টেন্ডেন্সিও ছিল। মাঝে মাঝে মাথাও ঘুরত।

উপসর্গটা কদ্দিন চলছে?

একটু-আধটু তো বেশ কিছুদিন ধরেই ছিল। বেড়েছে এই দিন পনেরো-কুড়ি। তরুণ গলা ঝেড়ে বলল, আমায় যেদিন জানাল, সেদিন তো রীতিমতো কাহিল দশা। সারাদিন নাকি অফিসে কাতরেছে। তখনই আমি ডক্টর সেনগুপ্তর কাছে নিয়ে যাই। তার দু'দিন পরেই স্ক্যান।

ব্যথা কি সারাক্ষণ থাকে?

সেদিন ছিল। অফিসে পেনকিলার খেয়েও তেমন রিলিফ হয়নি, বিকেলের দিকে আবার বেড়েছিল। এখন সকালে বেশি সাফার করে। মাথা প্রচণ্ড ভারী হয়ে থাকে তখন। বেলা বাড়লে অবশ্য অনেকটা ইজি হয়।

হুউম। ইডিমার এফেক্ট।...উনি কি স্মোকার?

সোহিনী তাড়াতাড়ি বলল, না না, একদমই সিগারেট খায় না।

বোধহয় ঠিক বলছ না সোহিনী। এককালে তো খেত। নেশার দাস হয়ে পড়েনি অবশ্য। ছেড়েও দিয়েছিল।

কাশি-টাশি বেশি হয়? আই মিন, কাশি-টাশি হত কী?

তেমন তো দেখিনি। সোহিনী পলক ভাবল, ওই যেমন ঠান্ডা-টান্ডা লেগে সকলের হয়...কমেও যায়...

কাশির সঙ্গে রক্ত পড়েছে কখনও?

না, সেভাবে তো...

একবার পড়ে ছিল। বছর তিনেক আগে। আমি নিজেই ডাক্তারি করে অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স করিয়েছিলাম। তাতে সেরেও গিয়েছিল।

সোহিনীর কানে খুট করে বাজল কথাটা। ভাস্কর তো তখন তাকে জানায়নি! কেন বলেনি? পাছে সোহিনী চেঁচামেচি করে, তাই? নাকি সোহিনীকে বলার তাগিদই অনুভব করেনি?

ডক্টর পাল এবার তরুণকেই জিজ্ঞেস করছেন, শিরদাঁড়া বা কোমরব্যথা কি ছিল পেশেন্টের?

না স্যার। তরুণের বেশ দৃঢ় জবাব, তা হলে তো আমায় বলত।

আপনার ওপর পেশেন্টের খুব কনফিডেন্স দেখছি!

ঠিক তা নয় স্যার। আমার বিয়ের সময়ে ও কলেজে পড়ে, তখন থেকেই...। আসলে নামে জামাইবাবু হলেও আমি প্রায় দাদার মতো। কিছু হলে আমাকেই প্রথম জানায়।

এই বাক্যগুলোও মোটেই সুখকর লাগল না সোহিনীর। হয়তো সাদা মনেই বলছে তরুণদা, তবু কোথায় যেন একটা খোঁচা লাগে। যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, সোহিনী কখনও ভাস্করের আপন হতে পারেনি।

আশ্চর্য, ভাস্করের এ হেন আচরণে সোহিনী ক্ষুণ্ণ হচ্ছে কেন? সে কি ভাস্করের ব্যাপারে পজেসিভ হয়ে পড়ল হঠাৎ? কিন্তু এমনটা তো হওয়ার কথা নয়! তবে কি সোহিনীর মানে লাগছে?

ডক্টর পাল আবার ভাস্করের ফাইল দেখছেন। কলম চালিয়ে খচাং খচাং গোল গোল দাগ মারলেন কয়েক জায়গায়। চোখ না তুলেই বললেন, রিসেন্ট পাস্টে পেশেন্টের তো কোনও ব্লাড টেস্ট হয়নি দেখছি। সাম্প্রতিক কালে জন্ডিস হয়েছিল কি?

না স্যার। তবে শাশুড়িমা বলছিলেন বেশ কিছুদিন যাবৎ খাওয়াটা কমে গেছে। তরুণের স্বরে এবার ঈষৎ উৎকণ্ঠা, স্যার, কন্ডিশন কেমন বুঝছেন?

খোলাখুলিই বলি। ডক্টর পাল কলমটা একবার ঠুকলেন টেবিলে। তারপর ডাক্তারি পরিভাষাতে বললেন, দিস ইজ আ ক্লাসিক কেস অফ স্কোয়ামাশ সেল কারসিনোমা। উইথ সেরিব্রাল মেটাস্টেসিস।

মানে?

যদিও ক্যান্সারটা ধরেছে রাইট লাঙে, কিন্তু সেটা ব্রেনেও ছড়িয়েছে। আই মিন, ব্রেনে ইডিমা ফর্ম করেছে। ব্রেন মেট্স হয়ে গেছে। বলেই সোহিনীর দিকে ফিরেছেন ডাক্তার, সরি মিসেস চ্যাটার্জি, আপনাকে কোনও আশায় বাণী শোনাতে পারছি না। অ্যাকর্ডিং টু সিটিএফএনএসি, পেশেন্টের কারসিনোমা এখন ফোর্থ স্টেজে। অর্থাৎ যথেষ্ট অ্যাডভান্সড।

ঘোষণাটুকু শেষ হতেই কয়েক পল গভীর নৈশঃব্দ্য। নিস্তব্ধতা এত প্রগাঢ়, নিজের হৃৎপিণ্ডের লাবডুবটাও শুনতে পেল সোহিনী। জোরালো টিউবলাইট জ্বলছে সুসজ্জিত চেম্বারে, তার দ্যুতি যেন নিষ্প্রভ সহসা। এসি মেশিনের তাপমাত্রাও বুঝি ঝুপ করে নেমে গেল অনেকটা। কম্প্রেসারের আওয়াজ কী প্রকট!

তরুণ বিড়বিড় করে বলল, এত বড় একটা রোগ দেহে বাসা বেঁধেছে, অথচ আগে থেকে কিছুই সেভাবে বোঝা গেল না!

ক্যান্সারের তো এটাই নিয়ম। নিঃসাড়ে ঘাতকের মতো হাজির হয়। কখনও ছোটখাটো ইঙ্গিত দেয়, কখনও তাও দেয় না। দিলেও সেটা এত সাধারণ, কারও পক্ষে গুরুত্বটা অনুমান করা সম্ভব নয়। আমরাই ধরতে পারি না। লক্ষণগুলো যখন প্রকাশ পায়, অনেক ক্ষেত্রেই তখন অসুখটা ধরাছোঁয়ার বাইরে।...বাই দা বাই, পেশেন্টের ফ্যামিলিতে কি ক্যান্সারের হিস্ট্রি আছে?

জানা নেই। আমার শ্বশুরমশাই তো মারা গিয়েছিলেন হার্ট অ্যাটাকে।

দেখেছেন তো, হেরিডিটি ফ্যাক্টরটাও সবসময়ে পাওয়া যায় না!

তা হলে স্যার...আমাদের কি এখন কিছুই করার নেই?

তা তো বলিনি। এবং একজন ডাক্তার হিসেবে কখনই তা বলব না। বিরলকেশ সৌম্যদর্শন মধ্যবয়সি ডাক্তারের মুখে পেশাদারি হাসি, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। চেষ্টা তো চলবেই। এখনই ট্রিটমেন্ট চালু করতে হবে।

কীভাবে এগোবেন, যদি জানতে পারি...

ও শিয়োর। ডক্টর পাল ঘুরনচেয়ারে হেলান দিলেন, আমরা চাইব, ম্যালিগন্যান্ট সেলগুলোকে আগে ডেসট্রয় করতে। এবং একই সঙ্গে দেখব, নতুন করে আর যেন ওই ধরনের সেল শরীরে গ্রো না করে।...তার কিছু প্রসিডিওর আছে। সারজিকালি লাম্পগুলোকে রিমুভ করতে পারি। রেডিয়েশন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে পারি। কেমোথেরাপি দিয়ে মেরে ফেলতে পারি।

কোনটা করবেন? আই মিন, কোনটা করলে ভাল হয়?

সেটা তো এই মুহূর্তে আমি বলতে পারছি না ভাই। পেশেন্টকে ইমেডিয়েটলি হসপিটালে অ্যাডমিট করে দিন। তারপর অন্‌কোলজিস্ট, অন্‌কোসারজেন্টদের বোর্ড উইল ডিসাইড কোন লাইনটা ধরলে ঠিক হবে। তবে অ্যাজ এ থোরাসিক সারজেন আমার মনে হচ্ছে, পেশেন্টের কারসিনোমাটা একটু বেশিই ছড়িয়েছে। লাং থেকে শুধু যে ব্রেনেই পৌঁছেছে তা নয়, ক্যারাইনাও অ্যাফেক্টেড। অর্থাৎ বাঁ ফুসফুসকেও ধরে নিয়েছে। ...স্টিল, আই উইল নট ডিসাইড এনিথিং নাউ। মেডিকেল বোর্ডের মতামতের জন্য অপেক্ষা করব।

পেশেন্টকে তা হলে কবে...?

কবে নয়। পারলে কালই। প্রচুর টেস্ট ফেস্ট করার আছে। পেশেন্টের কোন ধরনের ট্রিটমেন্ট কতটা নেওয়ার ক্ষমতা, সেটাও তো যাচাই করা দরকার।...সো, উই উইল পুট হিম টু অবজারভেশন ফার্স্ট।

কোথায় ভরতি করব স্যার?

যেখানে আপনাদের ইচ্ছে। তবে আমার মতে সব চেয়ে মডার্ন ইকুইপমেন্ট আছে যেখানে, সেখানে যাওয়াই শ্রেয়। সেদিক দিয়ে ভেনাস উইল বি দ্য বেস্ট। অবশ্য ওখানে খরচাটা একটু বেশি পড়বে...

তরুণ ঝলক সোহিনীকে দেখে নিয়ে বলল, আমরা এখন খরচের কথা ভাবছি না স্যার। টাকার চেয়ে জীবন অনেক বেশি মূল্যবান।

ডক্টর পাল বুঝেছেন সম্মতিটা। নিজের প্যাডে খসখস লিখে দিলেন ভরতির নির্দেশ। কাগজটা নিয়ে তরুণ উঠে পড়ল। সোহিনীও।

চেম্বারের বাইরে এসে তরুণ বলল, তুমি রাখবে এটা?

দিন। সোহিনী যেন কেমন ঘোরে। ফ্যাসফেসে গলায় বলল, ভাস্করকে কি তা হলে কালই...?

দেরি করার তো কোনও প্রয়োজন দেখি না।...তুমি কী বলো?

আপনি যা ভাল বোঝেন...।

সকালেই তবে চলে আসছি। টাইমটা রাতে ফোনে জানিয়ে দেব।

তার আগে হসপিটালে একবার কথা বলতে হবে না?

এখন সেখানেই যাচ্ছি। বন্দোবস্তটা এখনই সেরে আসি।

ও। কাগজটা তা হলে আপনিই রাখুন।

যেন এটা শোনারই অপেক্ষায় ছিল তরুণ। ছোঁ মেরে নিয়েছে কাগজটা।

পকেটে রেখে হাঁটতে হাঁটতে পলিক্লিনিকটার বাইরে এল। সামনে চওড়া রাস্তা। ট্রাম-বাস-গাড়ি-ট্যাক্সি-অটোর ঠাসাঠাসি ভিড়, যানবাহনের বিকট নিনাদে চৈত্রসন্ধ্যার পেলবতা উধাও। ফুটপাথে হকারের মেলা, বর্ষশেষের কেনাকাটায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে অগণিত মানুষ, শান্তি মতো দু'পা হাঁটাই দুষ্কর। পেট্রল-ডিজেলের কটু ধোঁয়ায় চোখমুখ জ্বালা জ্বালা করে।

দাঁড়িয়ে পড়ে তরুণ ঘড়ি দেখল একবার। কেজো গলায় বলল, হসপিটাল যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা স্পষ্টাস্পষ্টি হওয়া দরকার।

বলুন?

আমরা সকলেই তোমার পাশে আছি। সাধ্যমতো করবও। কিন্তু...বুঝতেই পারছ, সামনে বিপুল খরচ?

হুঁ।

বাবুনের তো মেডিক্লেম আছে, তাই না?

হ্যাঁ। মা'র সঙ্গে জয়েন্ট।

ও। তোমাদের দু'জনের তো আলাদা আলাদা। ট্যাক্সের ব্যাপার!

হ্যাঁ। আমি আর পাপান একসঙ্গে।

বাবুনের ইনশিয়োরেন্সের অ্যামাউন্ট কত?

আগে তো দেড় দেড় মোট তিন লাখ ছিল। লাস্ট ইয়ার বাড়িয়েছে কি না আমি ঠিক...

নো প্রবলেম। পলিসি ডকুমেন্টটা বার করে রেখো। কাল লাগবে।...ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, তোমাদের সেভিংসে কেমন আছে?

আমার তো ধরুন...

তোমাদের জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট নেই?

না মানে...করা হয়নি...। সোহিনীর কথা বলতে আর ভাল লাগছিল না। তাদের যে কোনও সঞ্চয়ই যৌথভাবে নেই, জানাটা কি তরুণদার খুব দরকার? এই মুহূর্তে? সোহিনী গলা নিচু রেখেই বলল, টাকার চিন্তাটা আমার ওপর ছেড়ে দিন তরুণদা।

অল রাইট। তবে মনে রেখো, আমরাও আছি। তরুণ যেন অকারণেই তাকাল এদিক-ওদিক। স্বরে একটা ওজন এনে বলল, তোমার সামনে এখন কঠিন সময়, সোহিনী। মাথা কিন্তু ঠিক রাখতে হবে। শক্ত থাকতে হবে, ভেঙে পড়লে চলবে না।

হুঁ।

আর একটা কাজ। রাত্তিরে বাবুনকে ভাল করে একটু বুঝিয়ো। ডাক্তারবাবু যা বললেন, তার আভাস বোধহয় খানিকটা দিয়ে রাখা ভাল। নয় কি?

সোহিনীকেই বলতে হবে? উফ্।

তরুণের কথা ফুরোয়নি। ফের বলল, মাকেও আজ একটু সামলে রেখো। কাল রাত্তিরে উনি ভাস্বতীকে ফোন করেছিলেন, ভাস্বতী একটা এলোমেলো জবাব দিয়েছে। তার থেকে উনি হয়তো কিছু আঁচ করলেও করতে পারেন। সুতরাং বুঝতেই পারছ...মা যদি বাবুনের সামনে কান্নাকাটি শুরু করেন...না না, ওটা মোটেও ডিজায়েরেবল নয়। সেইজন্যই বলছি...

সোহিনীর এবার কানমাথা ভোঁ ভোঁ করছে। উফ্, তরুণদা কি থামতে জানে না?

তরুণ উপদেশ দিয়েই চলেছে। সোহিনীও প্রাণপণে অচল রেখেছে শ্রবণশক্তি। হঠাৎ কানে এল, আমি তা হলে এবার এগোই, কেমন?

ঘাড় হেলাল সোহিনী, আচ্ছা।

তুমি কি এখন সোজা বাড়ি?

ভাস্কর আর বনানীর মুখ একসঙ্গে ঝলসে উঠল সোহিনীর চোখে। প্রায় আর্তনাদের সুরে বলল, না না, আমি এখন পণ্ডিতিয়া যাব।

হঠাৎ পণ্ডিতিয়া?

সোহিনী কয়েক সেকেন্ড পর থতমত খাওয়া স্বরে বলল, অনুপমের বাড়ি।

অনুপম? মানে বাবুনের সেই বন্ধু? তরুণ একটু যেন বিস্মিত চোখে দেখল সোহিনীকে। তারপর সহজ গলাতেই বলল, হ্যাঁ যাও। এই সময়ে তো বন্ধুবান্ধবদেরই বেশি কাজে লাগে।

তরুণকে পড়তে চাইল সোহিনী। পারল না।

অন্যমনস্ক মুখে মেজদার বক্তব্য শুনছিল অনুপম। বড়দা তো বটেই, সঙ্গে সেজদা-ফুলদার সম্পর্কেও তার ঝুড়ি ঝুড়ি অভিযোগ। দেবোপমকে বিপদের দিনে সে কতভাবে সাহায্য করেছে... রন্টুকে নাকি অনেক খেটেখুটে একটা চাকরি জোগাড় করে দিয়েছিল, রন্টু অবশ্য চালবাজি মেরে কাজটা খুইয়েছে...ঝন্টু একবার চিটিং কেসে ফেঁসে যাচ্ছিল, শেষ মুহূর্তে নিরুপমের

হস্তক্ষেপে নাকি কোনওক্রমে বেঁচে যায়...। এত কিছুর প্রতিদানে নিরুপম মিত্তির নাকি দাদা আর জ্যাঠতুতো ভাইদের কাছ থেকে প্রবঞ্চনা ছাড়া কিছু পায়নি...। এখন প্রোমোটারদের সঙ্গে বসতে চায় নিরুপম, তাতেও সকলে ব্যাগড়া দিচ্ছে! নিরুপম যে ভাইবোনদের কথা মাথায় রেখে লাভজনক ডিল করবে, এটা নাকি তারা মানতে নারাজ।

অনুপমের পাগল পাগল লাগছিল। একটানা এত বকবক! অগত্যা মরিয়া হয়ে বলেই ফেলল, তুমিই বা এত ঝোলাঝুলি করছ কেন মেজদা? যে যা খুশি করুক, তোমার কী? তোমার তো একটা ফ্ল্যাট পেলেই হল।

বুঝছিস না অন্তু, মুখে ওরা যতই ফুটুনি মারুক, আসলে তো বোকার হদ্দ। প্রোমোটার ওদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে, ভুতি চুষে, বিচি ঠেকিয়ে চলে যাবে।

যাক না, তখন বুঝবে...

কিন্তু লসটা তোর আমারও হবে, নয় কি?

জুতসই একটা জবাব খুঁজছিল অনুপম, দরজায় শব্দ। সর্বনাশ, নির্ঘাত বড়দা! এবার দুই ভাইয়ে না শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ বেধে যায়!

শঙ্কিত মুখে খোলা দরজায় এল অনুপম। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ ভোল্টের শক। সোহিনী! চোখ শুকনো খটখটে, মুখ কাগজের মতো সাদা।

এই সোহিনীকে অনুপম দেখেনি কখনও। ঠোঁট নড়ল সামান্য, তুমি!

এলাম। আর কার কাছে যাব, বলো?

সোহিনীর স্বর প্রায় কান্নার মতো শোনাল। আজ হোক, কাল হোক, তাকে এই সোহিনীর সম্মুখীন হতে হবে, এ তো অনুপম জানত। তা হলে অমন হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে কেন? অভিনয়? আত্মপ্রতারণা? নাকি পরিস্থিতিকে শুধু আগাম অনুমানটুকুই করতে পারে মানুষ, সত্যি সত্যি সেই পরিস্থিতিতে পড়লে সে কী আচরণ করবে, তা বুঝি সর্বদা তার বশে থাকে না!

অতি কষ্টে অনুপম নিজেকে ধাতস্থ করল। দরজা ছেড়ে বলল, এসো।

কোনও দিকে না তাকিয়ে সোহিনী সোজা শোওয়ার ঘরে। অনুপম এক লহমা ন যযৌ ন তস্থৌ দাঁড়িয়ে। তারপর ফিরল মেজদার কাছে।

নিরুপম দেখেছে সোহিনীকে। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, সেই বউটা না?

আমার বন্ধুর স্ত্রী।

এখন হঠাৎ?

ও তো আসে মেজদা। তোমরা তো জানো।

সরাসরি বলে দেওয়ায় নিরুপম বুঝি অপ্রতিভ। থতমত মুখে বলল, তা বটে। তোর বউদির মুখে তো শুনি...

আমার বন্ধু খুব অসুস্থ, মেজদা। এখন ওর সঙ্গে আমার ইম্পর্ট্যান্ট কথা আছে। তুমি এবার এসো।

এমনভাবে তাড়ালে নিরুপমকে তো উঠতেই হয়। যাওয়ার সময়ে একবার টেরিয়ে দেখল শোওয়ার ঘরটা। সেটুকুও নজর এড়াল না অনুপমের, তবে সেভাবে গ্রাহ্য করল না। গ্রাহ্য করার মতো মানসিক স্থিতি এখন তার নেই। একটু বুঝি অধৈর্য হাতে ছিটকিনি তুলল দরজার। ঘরে এসে দেখল, সোহিনী বিছানায় বসে। নখ খুঁটছে। মাথা নামিয়ে।

স্নায়ু নিয়ন্ত্রণে রেখে অনুপম বলল, এত কী ভাবছ, সোহিনী?

চোখ তুলেছে সোহিনী। প্রায় শোনা যায় না এমন স্বরে বলল, নিজের কপালের কথা।

মানে? অনুপম দৃষ্টিতে বিস্ময় ফোটাল, ভাস্করের এক্স-রে-তে কি খারাপ কিছু...?

বায়োপসিও হয়ে গেছে অনুপম। রিপোর্টও পাওয়া গেছে। সোহিনী অস্থির ভাবে মাথা ঝাঁকাল, আমি ভাবতে পারছি না। কিচ্ছু ভাবতে পারছি না।

এর পর আর কোনও প্রশ্ন মানায় কী? যে-উত্তরটা সে আগেই বুঝে ফেলেছিল, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সেটাই সোহিনীকে দিয়ে উচ্চারণ করানো তো নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু অজ্ঞতার ভানই বা কতক্ষণ চালানো যায়?

ঝাপসা স্বরে অনুপম বলল, শান্ত হও সোহিনী। আমি তো আছি।

কোথায় আছ তুমি? একটাও ফোন নেই...রিং করলে হয় বেজে যায়, নয়তো শুনি সুইচ অফ...মিসড কল দেখেও সাড়াশব্দ করছ না...! আমি তো তোমায় পাচ্ছি না অনুপম!

শেষ বাক্যটায় বুঝি কোনও দ্যোতনা ছিল। অন্তত সেভাবেই যেন অনুপমের কানে বাজল। ক'দিন ধরে সে এড়িয়ে থাকতে চেয়েছে সোহিনীকে। পালিয়ে পালিয়ে রয়েছে। যেন লুকিয়ে থাকাটাই আত্মরক্ষার বর্ম। যেন চোখ বুজে রাখলেই বন্ধ থাকবে প্রলয়।

কিন্তু এই মুহূর্তে সোহিনীর আকুলতা অনুপমের সমস্ত প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে

দিল। কখন যেন তার হাত দুটো জড়িয়ে ধরেছে সোহিনীকে। প্রায় নিরুচ্চারে অনুপম বলতে লাগল, আমার ভুল হয়ে গেছে সোহিনী। ক্ষমা করে দাও, ক্ষমা করে দাও...

স্পর্শেই বুঝি সান্ত্বনা মেলে। স্পর্শেই বুঝি শীতল হয় জ্বালাপোড়া। অনুপমের বুকে মাথা রেখে সোহিনী কেঁদে ফেলল। কেঁদেই চলেছে।

তীব্র এক অপরাধবোধে বিদীর্ণ হচ্ছিল অনুপম। তার অন্তরের কোনও এক অতল কুঠুরিতে লুকিয়ে থাকা বাসনাটাই সত্যি হল শেষমেশ? সে চেয়েছিল বলেই না ভাস্করকে মারণব্যাধিতে ধরল! এ তো অন্যায় আকাঙ্ক্ষা! এ তো পাপ! নাহ্, অনুপমের যুক্তিবাদী মন কিছুতেই নিজেকে বোঝাতে পারছে না, তার ইচ্ছে-অনিচ্ছের সঙ্গে ভাস্করের অসুখের কোনও সম্পর্ক নেই। থাকা সম্ভব নয়।

সোহিনীর কান্না থেমেছে। অনুপমের বাহুবন্ধন ছেড়ে সরে গেল একটু। চোখ মুছছে। মুখ টকটকে লাল। হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প। হেঁচকি তুলছে।

অনুপম নরম গলায় বলল, একটু জল খাবে?

সোহিনী নাক টানল, দাও।

বুঝি এই অবকাশটুকুর বড় প্রয়োজন ছিল। জল আনতে গিয়ে অনুপম মনে মনে গুছিয়ে নিল নিজেকে। উঁহুঁ, আর আবেগ নয়, এবার সোহিনীকে সাহস দেওয়ার পালা।

এক চুমুকে সোহিনীর গ্লাস শেষ। অনুপম জিজ্ঞেস করল, আর খাবে?

নাহ্।...খুব তেষ্টা পেয়েছিল।

স্বাভাবিক। অনুপম গ্লাস রাখল টেবিলে। চেয়ার টেনে বসেছে। একটু ঝুঁকে বলল, ডাক্তারের সঙ্গে কথা হয়েছে?

ওখান থেকেই তো আসছি। কাল ভেনাসে ভাস্করের অ্যাডমিশান।

প্রথমে কি রেডিয়েশান দেবে?

জানি না। সোহিনী বড় একটা শ্বাস ফেলল, আমার তো বাড়ি ঢুকতেই আতঙ্ক হচ্ছে। কীভাবে যে ভাস্করকে ফেস করি...!

ভাস্কর কি এখনও জানে না?

আমি তো বলতে পারিনি, তবে মনে হয়...। সোহিনী বিহ্বল স্বরে বলল, পরশু রিপোর্টটা জেনেছি। তারপর থেকে যে কী পরিস্থিতির মধ্যে আছি...! পরশু ফিরে দেখি কেমন ভ্যাবলার মতো বসে আছে ভাস্কর! আমার দিকে

ফ্যালফ্যাল তাকাচ্ছিল শুধু। সেই দৃষ্টিতে কোনও প্রশ্ন নেই, কৌতূহল নেই, বুঝি বাঁচার আর্তিটাও নেই। অ্যাবসোলিউটলি ব্ল্যাঙ্ক লুক।...রাত্তিরেও উঠে ঠায় বসে! কালও ঘুম ভেঙে দেখি একই দৃশ্য! পাছে জেগে গেছি টের পায়, মটকা মেরে পড়ে থাকছি।...ওদিকে ভাস্করের মা সারাক্ষণ এমন করুণ চোখে তাকিয়ে...আমি বাড়িতে তিষ্ঠোতে পারছি না অনুপম। এদিকে পাপানের কথাও মাথায় রাখতে হচ্ছে...

কিছু করার নেই, সোহিনী। রিয়্যালিটির সামনে দাঁড়াতেই হবে।

আছি তো দাঁড়িয়ে। আর কী করব?

ভাস্করকে ওর কন্ডিশনটা ডিটেলে জানিয়ে দাও। মাসিমাকেও। ধোঁয়া ধোঁয়ায় মাথার ওপর চাপ বেশি পড়ে। বরং সরাসরি জানার পর সত্যিটাকে অ্যাকসেপ্ট করা অনেক সহজ হয়।

আমি পারব না।

তা হলে তরুণদাকে বলো...

তরুণদাও তো কেটে কেটে বেড়াচ্ছে। দিদিরও তো আর দর্শন নেই। আমি যে এখন কী করি!

এমন এক ভারী আবহাওয়াতেও অনুপম হেসে ফেলল। শুকনো হাসি। পরক্ষণেই গম্ভীর হয়েছে, এত দুশ্চিন্তা করছ কেন? ভাস্কর তো জানবেই। কাল যখন হসপিটালে যাবে, অসুখটা আর গোপন থাকবে কি?

সেভাবেই জানুক। আমি কোনও বলাবলিতে নেই। রোগ বাধাল ভাস্কর, আর চুরির দায়ে ধরা পড়লাম আমি! সোহিনী হঠাৎই যেন খেপে গেল। গুমগুমে গলায় বলল, এখন তো মনে হচ্ছে, ভাস্কর আগেই জানত। আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করে অসুখটা গোপন রেখেছিল।

কী যা তা বকছ!

ঠিকই বলছি। অত মাথার যন্ত্রণা...আগে ভাল করে চেক-আপ করায়নি কেন? কাশির সঙ্গে রক্ত পড়েছে, সেটা পর্যন্ত আমায় বলেনি! এই চেপে যাওয়ার মানেটা কী? তখনই চিকিৎসা হলে হয়তো এমন ক্রিটিকাল স্টেজ অবধি পৌঁছোত না! আসলে ও সচেতনভাবে ভেতরে ভেতরে অসুখটাকে পুষেছে। বাড়তে দিয়েছে। যাতে পরে আচ্ছাসে আমায় টাইট দিতে পারে। ভাস্করকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। হি ইজ সো মিন, সো ক্রুয়েল...

তো? তার জন্য তুমি নিশ্চয়ই ওর মৃত্যু চাইতে পারো না?

সোহিনী জোর হোঁচট খেয়েছে এবার। পলকে কেউ যেন রক্ত শুষে নিল তার মুখ থেকে। নির্জীব গলায় বলল, আমি কি তাই বলেছি?

তা হলে আর ওসব প্রসঙ্গ তুলো না। বরং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করো। ভাস্করকে এখন মনে বল জোগাতে হবে। তার অসুখটার সঙ্গে যুঝতে হবে।

কিন্তু আমাদের কী হবে অনুপম?

সোহিনীর স্বর হাহাকারের মতো শোনাল। কেঁপে উঠেছে অনুপম। চকিতে স্মরণে এল, শিকাগোয় তার সহকর্মী টমাস মুলবেরিরও একই উপসর্গ ছিল, ধরা পড়ল একই অসুখ। ডাক্তার বলেছিল, চিকিৎসা করালেও এমন সংকটজনক রোগীর আয়ু বড় জোর দু'বছর। সতেরো মাস পর শিকাগোর কবরে শোওয়ানো হয়েছিল টমাসকে।

ঘটনাটার উল্লেখ কি আশ্বস্ত করবে সোহিনীকে? নাহ্, উচিত হবে না, উচিত হবে না।

ঠান্ডা গলায় অনুপম বলল, এখন ওই সব ভাবার সময় নয় সোহিনী। সামনে যে-বিপদটা এসেছে, সেটার সঙ্গে আগে লড়াই করতে হবে। উই মাস্ট ফাইট ইট আউট।

বলছ?

অবশ্যই। মানুষ হিসেবে এটাই তো আমাদের ডিউটি। মন খারাপ কোরো না, আমি তোমার সঙ্গে আছি।

স্বচ্ছ স্বরে বলল অনুপম। বলে যেন ভারমুক্তও হল খানিকটা।

পরক্ষণে বুকে পিঁপড়ের কামড়। যুদ্ধ তো লড়বে, কিন্তু কী চায় সে? জয়? না পরাজয়? উত্তরটা খুঁজে পাচ্ছিল না অনুপম।

সাত

বাড়ি ফিরে জুতো-মোজা ছাড়ছিল তরুণ। উদ্বিগ্ন মুখে ভাস্বতী বলল, আজ এত দেরি হল যে?

যা একখানা ঝড় উঠল। ভেনাসের গেটেই তো টানা আধঘণ্টা আটকে।

ওদিকে বুঝি ঝড়বৃষ্টি হয়েছে? কই আমাদের এখানে তো...

আমি কি বানিয়ে বলছি?

ভাস্বতী সামান্য গুটিয়ে গেল। তার কর্মকুশল, বুদ্ধিবোঝাই স্বামীটিকে সে একটু সমীহই করে। চোরা চোখে তরুণের মনমেজাজ আন্দাজ করার চেষ্টা করল। সুবিধের ঠেকছে না। খুবই স্বাভাবিক, ক'দিন ধরে বাবুনের জন্য যা ছোটাছুটি যাচ্ছে মানুষটার! সারাদিন অফিস ঠেঙিয়ে সেই হাসপাতাল, সেখান থেকে এতটা পথ উজিয়ে বাড়ি...কম ধকল পড়ে! বেহালার এই জুবিলি পার্ক থেকে একদিন যাতায়াত করেই তো ভাস্বতী কাহিল। নাহ্, তরুণের সঙ্গে এখন সমঝে-বুঝে কথা বলা উচিত।

তোষামোদের সুরে ভাস্বতী বলল, এদিকেও একটা হাওয়া মতন উঠেছিল। কিছুই অবশ্য হল না শেষ পর্যন্ত।

কালবৈশাখী সর্বত্র একসঙ্গে হয় না। এটাই নিয়ম। বিজ্ঞ রায় দিল তরুণ। বেডরুমে যাচ্ছিল, থেমেছে হঠাৎ। দু'কান চেপে বলল, ওফ্, কী আওয়াজ!

হ্যাঁ, আওয়াজ একটা হচ্ছে বটে। তবে আওয়াজ না বলে নাদ বলাই শ্রেয়। কিংবা ব্রহ্মনাদ। সাউন্ড বক্সে ইংরেজি গান শুনছে রাজা। একতলা বাড়িখানা কাঁপছে থরথর।

অপরাধটা যেন তারই, এমন ভঙ্গিতে ভাস্বতী বলল, হ্যাঁ, বড্ড জোরে বাজায়।

এরপর তো পাড়াপড়শিরা বাঁশ নিয়ে আসবে। কমাতে বলতে পারো না?

বলি তো। শোনে কই!

আশ্চর্য, ছেলের ওপর এটুকু কন্ট্রোল নেই?

বলেই তরুণ সোজা রাজার দরজায়। আঙুল তুলে বলল কী যেন, ওমনি কমে গেছে ভলিউম। গর্বিত চোখে স্ত্রীকে ঝলক দেখল তরুণ, চলে গেছে শয়নকক্ষে।

ভাস্বতী সামান্য গলা ওঠাল, চা খাবে নাকি এখন?

খাব? সাড়ে ন'টা তো বাজে। ঠিক আছে, বানাও।

মাত্র মিনিট পাঁচেক সময়। ভাস্বতী যখন কাপ-ডিশ হাতে ঢুকল, প্যান্টশার্ট বদলে লুঙ্গি গলিয়ে নিয়েছে তরুণ। মুখ-হাত ধোওয়াও সারা, চোখে চশমা এঁটে ব্রিফকেস খুলে বসেছে।

টেবিলে চা রেখে ভাস্বতী বলল, এখন আবার কী কাজ?

বাবুনের পেমেন্ট আমার হাত দিয়ে হচ্ছে কিনা...রিসিটগুলো পর পর সাজিয়ে রাখছি।

টাকা দিতে হচ্ছে কেন? বাবুনের তো ইনশিয়োরেন্স আছে!

ক্যাশলেসের ফক্কিকারিতে যেতে দিলাম না। ওতে ঠকা হয়। পনেরো দিনেই বাবুনের লিমিট ক্রস করে যাবে।

টাকাপয়সার জটিল ব্যাপার-স্যাপার ভাস্বতী বোঝে না তেমন, তাই আর ঘাঁটল না প্রসঙ্গটা। মূল প্রশ্নে চলে গেল, বাবুন আজ আছে কেমন?

একই রকম।

এখনও মনমরা?

সে তো থাকবেই। হাসিখুশি ক্যান্সার পেশেন্ট সিনেমা-টিনেমায় দেখা যায়। বাস্তবে নয়।

না, তা বলিনি। ভাবলাম যদি গোড়ার ধাক্কাটা একটু সামলে উঠে থাকে...

মৃত্যুর হুইসিল শোনার শকটা কি এক-দু'দিনে কাটে?

তরুণের এই ধরনের চাঁছাছোলা বাচনভঙ্গিতে অভ্যস্ত ভাস্বতী। তবু যেন ফুটল কথাটা। ভাই মরণাপন্ন জানে সে। কিন্তু শুনতে কি ভাল লাগে?

বেজার মুখে ভাস্বতী বলল, ডাক্তারবাবু আজ ফাইনাল কিছু জানালেন?

হ্যাঁ। অনেকক্ষণ কথা হল। ওরা প্রথমে রেডিয়েশানে যাচ্ছে। পরশু...মানে সোমবার থেকে চালু হবে।

ও। ক'দিন দেবে?

ছাব্বিশটার কোর্স। উইকে পাঁচ দিন করে।

ভাস্বতী মনে মনে হিসেব করল, তা হলে তো হসপিটালে অনেক দিন থাকতে হবে!

দেড় মাস মতো তো বটেই। তরুণ চায়ে চুমুক দিল। পুঁচকে একখানা স্টেপলার দিয়ে কাগজগুলো গাঁথতে গাঁথতে বলল, রেডিয়েশান শেষ হলেই তো সঙ্গে সঙ্গে ছাড়বে না। আগে শুধু লাঙে রেডিয়েশান দেওয়া হত, এখন ফুসফুস আর মাথা, দু'জায়গাতেই একসঙ্গে চলে। বড় স্ট্রেন যায় পেশেন্টের। সুতরাং আরও কয়েকদিন অবজারভেশনে তো রাখবেই।

ভাস্বতী বসল বিছানায়। তরুণের বর্ণনায় বুকটা কেমন ঢিপঢিপ করছে। ঢোঁক গিলে বলল, হ্যাঁগো, বাবুন ভাল হবে তো?

ঘাড় বেঁকিয়ে ভাস্বতীকে দেখল তরুণ। একটু যেন শ্লেষের সুরে বলল, তুমি তো দেখছি সোহিনীর দাদার মতো কথা বলছ!

কৌশিক আজ এসেছিল?

হ্যাঁ। বউ সমেত।

কী বলছিল?

তার তো হাত-পা ছেড়ে যাওয়ার দশা। কাজের কাজ করার ক্ষমতা নেই, খালি হাবিজাবি প্রশ্ন। রেডিয়েশানে লাঙের লাম্পগুলো পুড়িয়ে দিলে অটোমেটিকালি ব্রেনের ম্যালিগনেন্সি উবে যাবে কিনা, রেডিয়েশান যদি নিখুঁত জায়গায় না পড়ে তা হলে বাবুনের ক্ষতি হবে না তো, মোটামুটি কবে থেকে বাবুন নরমাল লাইফে ফিরবে, এইসব।

আহা, এগুলো তো স্বাভাবিক প্রশ্ন। আপনজনরা তো জানতে চাইবেই।

আমাকে কেন? গো অ্যান্ড আস্‌ক দা ডক্টর। নিজে জানো। তার বেলায় তো হাঁটু ঠকঠক।

জানোই তো কৌশিক একটু ভালমানুষ ধরনের।

উঁহু, এদের বলে আতাক্যালানে। নিকম্মার গোঁসাই। এই ধরনের ক্যারেক্টার দেখলেই আমার গা কিসকিস করে।

ভাস্বতী বলতে না চেয়েও বলে ফেলল, কিন্তু হেসে হেসে গল্প তো করো।

কারণ আমি ভদ্রলোক। অসভ্যতা আমার স্বভাব নয়। ব্রিফকেস বন্ধ করে উঠল তরুণ, আলমারি খুলে চালান করল অন্দরে। ফের চাবি লাগিয়ে বসেছে জানলার ধারে রাখা আরামচেয়ারটায়। তার প্রিয় আসন। নিলামঘর থেকে জলের দরে কিনেছিল বেতের কুর্সিখানা। হাতলে দু'বাহু ছড়িয়ে বলল, আমি শুধু লোকজনের আক্কেলটা দেখে যাচ্ছি।

আর কার কথা বলছ?

কাকে ছেড়ে কাকে ধরি! এই যেমন...বাবুনের শ্বশুরমশাই। চারদিন হল জামাই হাসপাতালে, অথচ একটিবারের জন্য তিনি মুখ দেখালেন না!

আসবেন হয়তো।

আর কবে আসবেন? জামাই বিছানায় পুরো লেটে গেলে?

আহা, এটা তো মানবে, মেসোমশাইয়ের বয়স হয়েছে। তাঁর নিজেরও শরীরের একটা ভালমন্দ আছে...

সত্তর বছরে মানুষ আজকাল মোটেই বুড়োয় না। আর উনি এমন কিছু অথর্বও বনে যাননি। আমাদের মতো ট্রামে-বাসেও চড়তে হয় না। গাড়িটি

চেপে পুট করে শুধু আসা...শোভাবাজার থেকে বাইপাস কতটুকুই বা সময় লাগে! মেরেকেটে বিশ-পঁচিশ মিনিট! চাইলে বাবুনের শাশুড়িকেও আনতে পারেন।

তা ঠিক। তবে কী জানো...আচমকা এত বড় আঘাত...এ তো বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। সইতেও তো সময় লাগে।

বাজ আমাদের মাথায় পড়েনি? আমাদেরও তা হলে হাসপাতালে না ছুটে ঘরে বসে শোক পালন করা উচিত।

সবাই কি এক ধাঁচের হয় গো? তা ছাড়া তুমি এসব পারো।

আত্মার টান থাকলে সবাই পারে। কেন, কৌশিকের যখন কিডনি স্টোন অপারেশন হল, মেসোমশাইকে আমি নার্সিংহোমে দেখিনি? আসল সত্যি হল, ছেলে আপন, জামাই পর।

ভাস্বতী একদমই মানতে পারল না কথাটা। সোহিনীর বাবা-মাকে সে যত দূর দেখেছে, জামাই সম্পর্কে তাঁরা অত্যন্ত স্নেহশীল। তার ওপর সোহিনী তাঁদের বড় আদরের মেয়ে, তার বিপন্নতায় মাসিমা-মেসোমশাই উদাসীন, ভাবনাটাই তো কষ্টকল্পিত। তবে তরুণ এভাবেই বলতে ভালবাসে, জানে ভাস্বতী। মানুষের ছোটখাটো ত্রুটিবিচ্যুতিগুলোকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখে তরুণ বুঝি খুব সুখ পায়।

চায়ের কাপ তুলে ভাস্বতী চলে যাচ্ছিল, আরামচেয়ার থেকে তরুণের ডাক, আজকের ইংরেজি পেপারটা দিয়ে যাও তো।

আনছি।

সিঙ্কে কাপ-ডিশ নামিয়ে ভাস্বতী বসার ঘরে এল। সেন্টারটেবিলে খুঁজছে দৈনিকটা। বাংলাটা রয়েছে, ইংরেজিখানা কোথায়? নির্ঘাত রাজার কীর্তি, পড়তে গিয়ে নিজের ঘরে ফেলে রেখেছে। হায়ার সেকেন্ডারি দিয়েছে ছেলে, জয়েন্টের পাটও শেষ, রাজার এখন অবসরই অবসর। দেরিতে উঠছে, খবরের কাগজে সিনেমা আর খেলার পাতা গিলছে, যখন তখন আড্ডা, ফোনাফুনি, গান, কম্পিউটার...। দুটো মাস রাজার এখন ভারী সুসময়।

ভাস্বতী ছেলের দরজা ঠেলল, ইংলিশ নিউজপেপারটা কি তোর কাছে?

গান বন্ধ করে রাজা এখন কম্পিউটারে। সলিটেয়ার খেলছে। না তাকিয়ে বলল, দ্যাখো বোধহয় বিছানায়...

ঠিক জায়গায় রাখতে পারিস না? তোর বাবা এত রাগ করে!

সরি মম। আমার ছাঁচটা আলাদা।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। বাবা একা ছুটে মরছে, তোর কোনও বিকার নেই!

ভালমামার ব্যাপারে বলছ?

নয় তো কার! মামা তোকে এত ভালবাসে, অথচ সে কেমন আছে তুই জানতে পর্যন্ত চাস না!

জানার তো কিছু নেই। মনিটর থেকে চোখ সরেছে রাজার, ভাল থাকার তো কথা নয়।

পরশু থেকে রে দেবে। টানা বেশ কিছুদিন।

ওটাই প্রসেস। সৌম্যর বাবাকেও তাই করেছিল, ওর বাবার অবশ্য হয়েছিল গলায়।

হয়েছিল মানে? এখন তিনি নেই?

বহাল তবিয়তে আছেন। অফিস-টফিসও যাচ্ছেন। শুধু ভয়েসটা নষ্ট হয়ে গেছে, এই যা।

ওহ্। ক্যান্সার তা হলে সারে?

কেন সারবে না? আফটার অল অসুখ তো। ঠিকঠাক ট্রিটমেন্ট হলে কিয়োর না হওয়ার তো কারণ নেই। অবশ্য ভালমামার কেসটা একটু জন্ডিস হয়ে গেছে। লেটে ধরা পড়ল তো।

মামার জন্য তোর মন খারাপ হচ্ছে না?

হুম্, কী যে একটা বাধাল! এখন রেডিয়েশান, কেমো...কড়া কড়া পেনফুল ট্রিটমেন্ট...! রাজার ভুরুতে পাতলা ভাঁজ পড়েই মিলিয়ে গেল। উঠে এসে মা'র কাঁধে আলগা চাপড় দিয়ে বলল, কিচ্ছু ভেবো না। মামার হেভি কশ আছে, ঠিক পার হয়ে যাবে। অ্যাডমিশনের দিন তো বলে এসেছি, টেনশান ঝেড়ে ফেলো, দেখবে অসুখ অর্ধেক হাপিস হয়ে গেছে।

হোক না ছেলে ছোট, তবু তার আশাবাদী মানসিকতায় ভাস্বতী বুঝি খানিকটা প্রভাবিত হল। পায়ে পায়ে গিয়ে কাগজটা দিল তরুণকে। তারপর বিছানায় বসে যেন আপন মনেই বলল, এবার থেকে হসপিটালে যখন যাব, খুব চিয়ার আপ করব বাবুনকে।

তরুণ শেয়ারের পাতা খুলেছে। মিউচুয়াল ফান্ডে টাকা রাখে নিয়মিত, দেখছে বাজারের ওঠাপড়া। গ্রাম্ভারি গলায় বলল, বেশ তো, কোরো।

ওর ভেতর একটা পজিটিভ চিন্তা ঢুকিয়ে দেওয়া দরকার। যাতে ফাইটিং স্পিরিটটা বাড়ে।

উম, এই উপলব্ধিটুকু যদি তোমার ভাইয়ের বউয়ের একটু থাকত!

কেন, সে কী করেছে?

বরকে হাসপাতালে পুরে দিয়েই যেন দায়িত্ব ফিনিশ।

সোহিনী আজ যায়নি? কাল তো ছিল!

ছিল তো আজকেও। সারাক্ষণ। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করল, যারা আসছে তাদের মিট করছে, কিন্তু বরের ত্রিসীমানায় ঘেঁষছে না!

কাল সোহিনী বলছিল বটে বাবুনের সামনে গেলে তার গা ছমছম করছে। তাই কি...? দু'-এক সেকেন্ড থেমে থেকে ভাস্বতী বলল, সোহিনী আজ একবারও বাবুনের কেবিনে যায়নি?

নিয়মরক্ষেটুকু করেছে। তবে ঢুকে কোথায় একটু পাশে বসবে, মাথায় হাত বুলোবে তা নয়,...দু'মিনিটেই আউট। কাগজ ভাঁজ করে আড়মোড়া ভাঙল তরুণ, জানি না বাবা, এতকাল পাশাপাশি থেকেও বরের ওপর কেন যে এত কম টান!

মা-ও প্রায় একই ধরনের অভিযোগ করে বটে। কিন্তু বাবুনের জন্য কেন সোহিনীর টান থাকবে না? বাবুন যেমন ছেলে...সাদাসিধে, প্রাণবন্ত, মনে কোনও প্যাঁচ নেই, বউয়ের ওপর কখনও জোর খাটায় না...মেয়েরা তো এমন বরই পছন্দ করে। আর সোহিনীও মোটেই বজ্জাত টাইপ নয়। একটু দেমাকি, তবু মোটের ওপর তো সভ্যভব্যই। ভাস্বতীর সঙ্গে হয়তো তেমন সখিত্ব গড়ে ওঠেনি, তবে তাকে যথেষ্ট সম্মান দেয়। আগে তো বাড়িতে কথাই বলত কম, ইদানীং নাকি একটু মুখরা হয়েছে। বাবুনের ওপর নাকি খুব চোটপাট করে আজকাল। মা'র সঙ্গেও ব্যবহার ভাল করে না। তা সোহিনীর মতো একটা ডাঁটিয়ে চাকরি করা মেয়ে ভাস্বতীর মতো পাপোশ-গৃহবধূ হয়ে থাকবে, এমন আশা করাও তো ভুল। নিজের সংসারে নিজের ভাল লাগা, মন্দ লাগা নিয়ে তর্ক করতে পারবে না?

খানিক উদাস মুখে ভাস্বতী বলল, কাউকে কাউকে দেখে ওরকম মনে হয় গো। তাদের ভেতরে কী চলে, বাইরে প্রকাশ পায় না। পা ছড়িয়ে বসে কাঁদলেই কি বেশি প্রেম দেখানো হয়?

কী জানি! আমি হলাম মোটা বুদ্ধির লোক। গাধার মতো শুধু খাটতে পারি, হৃদয়মনের কারবার অত বুঝি না। চোখ যা দেখায়, সেটাই সম্বল।

সূক্ষ্ম বিদ্রূপটা হজম করে নিল ভাস্বতী। তরুণের স্বভাব তো সে জানে। মুখে যতই যার নিন্দেমন্দ করুক, লোকের জন্য প্রাণপাত করে তো। তা ছাড়া বাবুনের ভার যে স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলেছে, তার কথার মারপ্যাঁচটুকু না খুঁজে কৃতজ্ঞই তো থাকা উচিত ভাস্বতীর। নয় কি?

ভাস্বতী হেসে বলল, এখন আর একটা যে স্থূল কাজ তোমায় করতে হবে!

কী?

একটু পরিশ্রম করে খেতে চলো।

খাওয়াটাও কি কম খাটুনির! তরুণও হাসছে এবার, তোমার কমলারানির রুটির যা ছিরি, ছিঁড়তে জীবন বেরিয়ে যায়।

আজ তিনি বিকেলে ডুব। রুটি আজ আমার শ্রীহস্তে গড়া। সুধা মিশিয়ে দিয়েছি। তুলতুলে মাখনের মতো লাগবে।

রসিকতাটুকু ছুড়ে ভাস্বতী হাসতে হাসতে রান্নাঘরে। খাবার-দাবার গরম করছে। রসুইঘরটি বেশ বড়সড়, কাজ করতে সুবিধে হয়। তরুণই বুদ্ধি করে এমনটা বানিয়েছে। জুবিলি পার্কে এই সওয়া দু'কাঠা জমিটা সস্তায় কিনে অনেকদিন ফেলে রেখেছিল তরুণ। ঠিকঠাক টাকাপয়সার বন্দোবস্ত করে বছর দুয়েক হল বাড়িখানা তুলেছে। সুষ্ঠু নকশার চমৎকার গৃহ। প্রতিটি ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম, বারান্দা, সবেতেই তরুণের বিচক্ষণ পরিকল্পনার ছাপ স্পষ্ট।

টেবিল সাজিয়ে ভাস্বতী রাজাকেও খেতে ডাকল। কানে মোবাইল চেপে এল রাজা, বাবাকে দেখে বন্ধও করল চটপট। চেয়ার টেনে ভাস্বতীকে বলল, আজ কী মেনু, মা?

পাত্রগুলো নিরীক্ষণ করে তরুণই জবাব দিল, মাখন মাখন চাপাটি। নভ্‌রতন কোর্মা, মানে তোর মা'র পাঁচমেশালি তরকারি। আর গ্রেভি টিক্কা, মানে মাছের ডিমের ডালনা। ডেজার্টও আছে। বোঁদে।

রাজাকে খুব একটা আমোদিত মনে হল না। বেজার মুখে রুটি ছিঁড়ছে। ছেলের পাতে তরকারি দিয়ে ভাস্বতী তরুণকে জিজ্ঞেস করল, বাবুনের অফিসের কেউ এসেছিল আজ?

এক পিস। তুহিন বেরা। খিটকেল লোক। বাবুনের হাল জানার যত উৎসাহ, তার চেয়ে খরচ কী হচ্ছে তাতে বেশি কৌতূহল।

ও হ্যাঁ, জিজ্ঞেসই তো করা হয়নি। ভাস্বতীও খেতে বসেছে, রেডিয়েশানে কীরকম পড়বে?

আমরা প্যাকেজে গেলাম। এক লাখ তিরিশ। ক্যাশলেসে ওটাই পনেরো-বিশ বেড়ে যেত।

ওই টাকায় কী দেবে? শুধু রেডিয়েশান?

বেড চার্জও আছে। প্লাস, স্ট্যান্ডার্ড মেডিসিন। তার বাইরে ওষুধ লাগলে আলাদা পেমেন্ট। সর্বক্ষণ দেখভালের লোক রাখলে তার চার্জও এক্সট্রা।

তুমি ডিসকাউন্ট করাতে পারো না? তোমার কোম্পানির থ্রু দিয়ে?

হসপিটাল-নার্সিংহোমে চার্জ কমানো যায় নাকি? বাড়তি ওষুধ-টষুধগুলোয় হয়তো খানিকটা ছাড় করাতে পারব। খেতে খেতে চোখ তুলে তাকাল তরুণ, তাও আমার দরাদরির ইচ্ছে ছিল। কিন্তু অনুপম বলল, চার্জটা নাকি খুবই মডারেট। দেখলাম সোহিনীও তাতে সায় দিল...

অনুপম আজও এসেছিল?

ও তো এঁটুলির মতো সোহিনীর সঙ্গে সেঁটে আছে। সোহিনী আরএমও-র রুমে গেল, পিছন পিছন অনুপম! সোহিনী লাউঞ্জে, পাশটিতে অনুপম! শুধু টয়লেটটাতেই যা এন্ট্রি পাচ্ছে না!

যাহ্, তুমি বড্ড আজেবাজে বকো। ছেলেটা কত উৎকণ্ঠা নিয়ে বন্ধুর জন্য হাজির থাকছে!

দ্যাখো, ফ্র্যাঙ্কলি বলছি। ও যে বাবুনের এত ক্লোজ, এটা আমার জানা ছিল না। এবং বাবু অনুপম কতটা বন্ধুঅন্তপ্রাণ, কতটা বন্ধুপত্নীঅন্তপ্রাণ, তা কিন্তু এখনও আমার নিরেট মগজে ঢোকেনি।

ফের বাজে কমেন্ট? আমার ভাল্লাগে না।

আমারও না। বরের কন্ডিশন স্বকর্ণে শুনেও বউ যখন বাড়ি না ছুটে বরের বন্ধুর কাছে দৌড়োয়, আমাদের মতো ইতরজনের চোখে দৃষ্টিকটু তো ঠেকেই।

কী জানি বাবা, এটা কেন দোষের? অনুপম তো সোহিনীরও বন্ধু। বিপদ-আপদে মানুষ তো ফ্যামিলি-ফ্রেন্ডের কাছেই যায়।

সব ঠিক। সব মানি। তাও আমি জাস্ট জানতে চাইছি, ও এখন কার বন্ধু? বাবুনেরও? নাকি শুধুই সোহিনীর?

রাজার দৃষ্টি ঘুরছে ঘনঘন। একবার মাকে দেখছে, একবার বাবাকে। ঘোরতর অস্বচ্ছন্দ বোধ করছিল ভাস্বতী। বাইরের জগতে তরুণ চরম ধোপদুরস্ত, কিন্তু বাড়িতে তার মাত্রাজ্ঞান এত কম! ছেলের সামনে কেউ এধরনের মন্তব্য করে? মামি সম্পর্কে কী ধারণা হচ্ছে রাজার? এরপর হয়তো কোনওদিন পাপানের সামনেও...

ভাস্বতী আর রা কাড়ল না। নিঃশব্দে শেষ করছে আহার। তরুণ আর রাজা উঠে যাওয়ার পর খাবার-দাবার ফ্রিজে তুলল, এঁটো বাসন ডাঁই করল সিঙ্কে। তারপর ড্রয়িংরুমে এসে প্রিয় টিভি সিরিয়ালটা খুলে বসল। মন লাগছে না। তরুণের ইঙ্গিতটা বারবার টোকা দিচ্ছে মস্তিষ্কে। তরুণটা যেন কী! মা'র মতো বয়স্ক শাশুড়ির সন্দেহটা তাও মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু তরুণের মতো এক আধুনিক পুরুষের কি এমনটা সাজে? হ্যাঁ, খচখচানি একটা ভাস্বতীরও আছে। যতই সে ভাবার চেষ্টা করুক, বাবুন আর সোহিনীতে মিলমিশ না হওয়ার কোনও কারণ নেই, বাবুনও ভাল, সোহিনীও খারাপ নয়...তবু দু'জনে দু'খানা আলাদা প্রাণী তো বটে। তাদের সম্পর্কে কতটা চিড়, ভাস্বতী কী করে জানবে? অনুপম-সোহিনীর সম্পর্কটাই বা ঠিক কেমন, তাও তো ভাস্বতীর অজানা। যদি অন্যরকম ঘনিষ্ঠতা থাকেও ভাস্বতীর কী করার আছে? হয়তো অনুপমের মধ্যে এমন কিছু আছে, যা সে বাবুনের কাছে পায়নি! ব্যভিচার, ব্যভিচার করে চেঁচিয়েও তো কোনও লাভ নেই। দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষকে লক্ষ্মণরেখা টেনে পৃথক রাখা যায় কি? আর স্বয়ং বাবুন যখন সম্পর্কটাকে মন্দ চোখে দেখে না, অন্যরা কেন ঘোঁট পাকাবে? সবচেয়ে বড় কথা, বাবুনের এই দুঃসময়ে অনুপম স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যেটুকু পারছে, করছে। এটাকেও কি বাঁকা চোখে দেখা শোভন?

তবু যেন খুঁতখুঁতুনি একটা থেকেই যায়। তার একমাত্র ভাইটা, মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছে, কে জানে হয়তো হেরেই যাবে, অথচ সোহিনী প্রবলভাবে বেঁচে থাকবে, হয়তো ওই অনুপমকে নিয়ে...মনে হলেই কেমন জ্বালা ধরে বুকে। সহস্র যুক্তিও সেই জ্বালা জুড়োতে পারে কই!

ওই জ্বালাই বুঝি ঠেলল ভাস্বতীকে। হাত যেন অজান্তেই তুলল রিসিভার। টিপছে বাপের বাড়ির নম্বর। সোহিনীর সঙ্গে সোজাসুজি কথা হয়ে যাওয়াই ভাল।

বার চারেক রিং বাজার পর ওপারে বনানীর ভয়ার্ত গলা, কে বলছেন? কোত্থেকে বলছেন?

ঝাঁকুনি খেয়ে সমে ফিরতে একটু সময় লাগল ভাস্বতীর। থেমে থেমে বলল, আমি বুলু, মা।

ও।...এত রাতে তুই...?

শুয়ে পড়েছিলে?

আর কী করার আছে? ঠাকুরের কাছে এখন একটাই প্রার্থনা, চিরকালের মতো শুইয়ে দাও।

ধ্যাত, ওসব বলতে নেই।

বলতে কি চাই? বেরিয়ে যায়। ঠাকুর যে আমায় কোন পাপে এই যন্ত্রণাটা দিলেন!

কিছুই শেষ হয়নি মা। যিনি যন্ত্রণা দেন, তিনিই যন্ত্রণা হরণ করেন। বাবুনের চিকিৎসা তো শুরু হয়েছে, দ্যাখো না ও এবার...

ভাল হলেই মঙ্গল। বনানীর স্বর কাঁপছে, যদি না হয়, আমার যে শেষ বয়সে কী গতি?

মা, তোমার মেয়ে-জামাই কি মরে গেছে? কক্ষনও আর ও কথা উচ্চারণ করবে না।

ঠিক আছে। বাদ দে। ওপারে বনানী জোরে নাক টানল, কী বলছিলি বল?

এমনিই। দুটো কথা বলতে ইচ্ছে হল। পাপান ঘুমিয়েছে?

বহুক্ষণ।

সোহিনী?

সেও শুয়েছে। ছেলে নিয়ে। কেন, তাকে ডাকব? দরকার?

ক্ষণিক ভাবল ভাস্বতী। ছোট্ট শ্বাস ফেলে বলল, নাহ্, থাক।

আট

বাহু থেকে কালো ফেট্টিটা খুলে নিল সিস্টার। সরু লম্বাটে বাক্সে ভাঁজ করে রাখছে। খটাস ডালা বন্ধ করে ভাবহীন গলায় বলল, হাঁ করুন।

কলের পুতুলের মতো চোয়াল ফাঁক করল ভাস্কর। তার বিয়াল্লিশ

বছরের জীবনে হাসপাতালবাস এই প্রথম। তবে টানা সতেরো দিনে রুটিন প্রক্রিয়াগুলোতে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। জানে, এখন তাপমান যন্ত্রটি মুখে গুঁজে দিয়ে বড় জোর তিরিশ সেকেন্ড ঘরের চতুর্দিকে চোখ ঘুরবে সিস্টারের, তারপর থার্মোমিটার সুড়ুৎ টেনে শূন্যে ধরে দেখবে, দু'সেকেন্ডের মধ্যে চালান করবে স্বস্থানে। নাড়ি, রক্তচাপ, আর দেহতাপ মাপার রুটিন কর্মটি সেরে খুটখুট বেরিয়ে যাবে অতঃপর।

সেবিকাদের দ্রুত প্রস্থানে প্রায়শই বাধা সৃষ্টি করে ভাস্কর। কখনও খবরের কাগজখানা চায়, কখনও মোবাইলটা চার্জে বসাতে অনুরোধ করে, কখনও বা বাথরুমে যাওয়ার অছিলায় দাঁড় করিয়ে রাখে। কিংবা নেহাতই গল্প জোড়ে হাবিজাবি। যতটুকু মানুষের সাহচর্য পাওয়া যায় আর কী।

আজও আটকাল লম্বা মতন মেয়েটাকে। জিজ্ঞেস করল, কেমন দেখলেন সিস্টার?

শুভ্রবসনা ঘুরে তাকিয়েছে, কী?

এই যে...মাপজোপ করলেন...

ঠিকই তো আছে।

আমি কিন্তু ঠিক বোধ করছি না। কেমন জ্বর জ্বর লাগছে।

ও কিছু নয়। উইকনেস থেকে ওরকম মনে হয়। আপনার টেম্পারেচার এখন একদম নরমাল।

আর ব্লাড প্রেশার?

যেমন থাকা উচিত, তেমনটিই আছে।

বলছেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনি শুয়ে পড়ুন।

ক'টা বাজে এখন?

মাথার ওপরেই তো ঘড়ি...! দশটা চল্লিশ।

তা হলে তো সকালের ভিজিটার্স টাইম এসে গেল। এখন আবার শোব?

তবে নিউজপেপার পড়ুন।

উলটোনো হয়ে গেছে। বেশিক্ষণ তো পড়া যায় না, মাথা ঝিমঝিম করে।

তা হলে মোবাইলে গান শুনুন।

বলেই সিস্টার কাট। আর কিছু কি জিজ্ঞেস করা যেত মেয়েটিকে? ভাস্কর

মনে করতে পারল না। শরীর নিয়ে আরও প্রশ্ন করেই বা কী লাভ? সত্যি তো কেউ বলবে না, বাঁধা গৎ আউড়ে যাবে। প্রথম পাঁচ দিন রেডিয়েশানের পর যখন জ্বরটা এল, তখন তো গোড়ায় এরা চেপে যাচ্ছিল। ভাস্কর নিজে টের পাচ্ছে সর্বাঙ্গে কাঁপুনি, শীত শীত ভাব, হাড়েমজ্জায় ব্যথা, অথচ ডাক্তার-নার্স খোলামনে স্বীকারই করতে চায় না। জানতে চাইলে ফাটা রেকর্ড, ও কিছু না, সামান্য গা ছ্যাঁকছ্যাঁক, ওষুধ পড়েছে, ঠিক হয়ে যাবে...! অথচ টানা তিন দিন রইল জ্বরটা। এই যে এখন সিস্টার বলল ভাস্করের সবই নাকি স্বাভাবিক, এও কি বিশ্বাস্য? নিশ্চয়ই চেপে যাচ্ছে! নিশ্চয়ই চেপে যাচ্ছে!

ভাস্করের এই উপসর্গটা বেড়েছে ইদানীং। আগে হঠাৎ হঠাৎ ভাবত, এখন সর্বদাই মনে হয়, তাকে ঘিরে যে পৃথিবীটা আবর্তিত হচ্ছে, তা শুধুই ছলনায় ভরা। কেউ তাকে সত্যি বলে না, কেউ না। মা যে মা, সেও এসে ভান করে, যেন আজ বাদে কাল ছুটি হয়ে যাবে ভাস্করের! আর তার পরদিনই লাফাতে লাফাতে অফিস ছুটবে ভাস্কর! বিষাক্ত রশ্মি যতই তার মস্তিষ্কে আঘাত হানুক, এখনও তো সে তার বোধবুদ্ধি হারায়নি! প্রতিটি স্তোকবাক্য সে ধরে ফেলছে, এটা কেন বোঝে না কেউ! এখন তো তার বেঁচে থাকার অর্থ শুধু প্রহর গোনা, তার বেশি আর কিছু নয়!

খবরের কাগজটা বালিশের পাশে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও টানল ভাস্কর। ষষ্ঠ পাতায় বড় করে একটি সংবাদ। ক্যান্সারের চিকিৎসায় নতুন আবিষ্কার। পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে কী এক ওষুধ বার করেছে দুই জার্মান গবেষক। ইঁদুরের ওপর প্রয়োগ করে আশ্চর্য সুফল পাওয়া গেছে। ডাক্তাররা আশা করছে মানুষের ক্ষেত্রেও চমকপ্রদ কাজ দেখাবে ওই ওষুধ। যত্ত সব গালগপ্পো! যেন ভাস্করের জন্যই সাজানো! কেন যে এসব মিথ্যে কথাগুলো ছাপায়! ভাস্কর তো জেনেই ফেলেছে, সংবাদপত্র যে দুনিয়াটার কথা বলে, সেটা অস্তিত্বহীন! কিংবা কোনও সুদূর মহাশূন্যে বিরাজমান! শুধু সান্ত্বনা দিতে ওই অলীক জগৎটাকে মেলে ধরা হচ্ছে ভাস্করের সামনে! বোগাস, বোগাস, অল বোগাস!

বাথরুম যেতে হবে। কাগজটা ঠেলে সরিয়ে ভাস্কর বেড থেকে নামল। হাঁটুর জোর কমে গেছে, পা দু'খানা যেন টলমল করে। ডাক্তার বলেছে বাথরুম যাওয়ার সময়ে ভাস্কর যেন সিস্টারদের ডাকে, এখন বেল টিপতে

ইচ্ছে করল না। যে-কোনও মুহূর্তেই তো মরে যেতে পারে ভাস্কর, সামান্য মাথা ঘোরার আশঙ্কা তাকে কি মানায়?

সবে ভাস্কর পেচ্ছাপ সেরে ফিরছে, কেবিনে তরুণ। পুরোদস্তুর ফিটফাট, হাতে ব্রিফকেস।

চোখ পাকিয়ে তরুণ বলল, কাউকে না ডেকে বাথরুমে গেছ যে বড়?

নিজের অবাধ্যতায় ভাস্কর ঈষৎ অপ্রস্তুত। চুপচাপ বিছানায় বসেছে।

তরুণ ফের বলল, ছোটখাটো অনিয়মগুলো ভাল নয়, বাবুন। আচমকা কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে সবাইকে তো হায় হায় করতে হবে।

ভাস্কর আলগা হাসল। সেই হাসিতে যতটা কষ্ট, ততটাই যেন ব্যঙ্গ। তরুণের উদ্বেগ উপেক্ষা করেই বলল, আজ সকালে কেন?

এলাম। হাতে খানিকটা সময় ছিল। ওবেলা পেরে উঠব না।

রোজ রোজ হাজিরা দেওয়ারই বা কী দরকার?

শালাটাকে না দেখে থাকতে পারি না যে। তরুণের কণ্ঠে স্বভাববিরুদ্ধ রসিকতা। হাসি হাসি মুখেই বলল, তা ছাড়া শালার বউ শুনলাম আটকে যাচ্ছে...

সোহিনী আজ আসবে না?

আসবে, আসবে। বিকেলে। এখন পাপানের স্কুলে গার্জেনস মিটে গেছে।

খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। অবিশ্বাসের কোনও কারণ নেই। তাও যেন প্রতীতি হল না ভাস্করের। কে জানে, হয়তো নিজের কোনও কাজ সারছে সোহিনী। সকলেই তো কাজের মানুষ, রেসের মাঠের বাতিল ঘোড়া তো নয়! যার জন্য বন্দুকের ট্রিগার অপেক্ষা করছে।

তরুণ টুল টেনে বসেছে। গলা ঝেড়ে বলল, তোমার নামে কিন্তু আজও কমপ্লেন আছে। ব্রেকফাস্ট নাকি পুরোটা খাওনি? ডিমসেদ্ধ ফেলে দিয়েছ?

সেদ্ধ ডিমে আমার গন্ধ লাগছে। ওদের বলুন না, যেন ওমলেট দেয়।

বলব।

আর ওই কাটাপোনার বদলে অন্য কিছু। এনি আদার ফিশ।

ঠিক আছে, তাও বলব। পায়ের পাশ থেকে ব্রিফকেস কোলে তুলল তরুণ। খুলে ছোট্ট একটা টিফিনবক্স বার করেছে। সাইডটেবিলে রেখে বলল, কী আছে জানো?

কী?

ঝিঙেপোস্ত। তোমার দিদির নিজের হাতে বানানো।

দেখে ভাস্করের খুশিই হওয়ার কথা। কিন্তু ভিজে ন্যাতার মতো মিইয়ে রইল মনটা। তাকে আনন্দিত রাখার কেন যে এই মিথ্যে আয়োজন?

ব্রিফকেস বন্ধ করে তরুণ বলল, তোমার দিদি কালও একটা আইটেম পাঠাবে। কী খেতে চাও, বলো?

ভাস্কর ফস করে বলল, বেশ কষা কষা করে রাঁধা মাটন।

তরুণ ঈষৎ থতমত। ঘাড় দুলিয়ে বলল, ওটা তো অ্যালাও করবে না ভাই।

ফাঁসির আসামিকে কিন্তু বিমুখ করতে নেই তরুণদা।

ছি বাবুন, ওভাবে বলতে নেই। তরুণ খাড়া হয়ে বসল, তুমি তো এখন অনেক বেটার। ডাক্তাররা তো তোমার ব্যাপারে যথেষ্ট আশাবাদী। ডক্টর গুহ, আই মিন যিনি রেডিয়েশান থেরাপি কনডাক্ট করছেন, তো বললেন মাত্র দশটা ডোজে মাস্ লক্ষণীয় ভাবে রিডিউস করেছে। যদি তোমার শরীর এভাবে রেসপন্ড করে, তা হলে তো মার দিয়া কেল্লা। ছাব্বিশটার পর লাম্পগুলো প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

কই, ডাক্তার তো আমায় কিছু বলেনি? সকালেও ডক্টর গুহ রাউন্ডে এসেছিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, উনি তো প্রশ্নটা অ্যাভয়েড করে গেলেন?

অসুখের অবস্থা নিয়ে রোগীর সঙ্গে আলোচনার নিয়ম নেই বাবুন। আমরা তো রেগুলার কথা বলছি। খবরাখবর রাখছি।

কতভাবে যে ভাস্করকে ধোঁকা দেবে তরুণদা? ভাস্কর তো বুঝতে পারছে তার জীবনীশক্তি নিঃশেষ। তাও যে কেন সান্ত্বনার ঠেকনা দিয়ে তাকে চাঙ্গা রাখতে চায়?

সামান্য ব্যাঁকা সুরে ভাস্কর বলল, আপনারা আমার জন্য যা করছেন...তুলনা নেই!

এখন তুমি আমাদের মুখ চেয়ে কিছু করো। মন থেকে নেগেটিভ চিন্তাগুলো ঝেঁটিয়ে হঠাও। মন যদি শক্তি না দেয়, শরীর লড়াই করবে কীভাবে, অ্যাঁ?

একই কথা আর কতবার বলবেন, তরুণদা?

হাজার বার। প্রয়োজনে লক্ষ বার। তোমার ট্রিটমেন্টের এটাই তো মোস্ট

ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট। ভাস্করের ঊরুতে আলতো চাপ দিল তরুণ, আজ আর কাল দুটো দিন তো তোমার রেডিয়েশান থেকে ছুটি। দু'দিন ভাল করে খাও-দাও, তোফা ঘুম লাগাও। তারপর চুটিয়ে আড্ডা মারতে বিকেলে দলবল তো আসছেই।

ভাস্কর ম্রিয়মাণ স্বরে বলল, আপনি তা হলে উঠছেন?

আজকের মতো। কাল ফির মিলেঙ্গে।

আগর কাল তক্ জিন্দা রহুঁ, তো। তরুণ ফের চোখ পাকাচ্ছিল, ভাস্কর করুণ হাসল, দিদিকে থ্যাঙ্কস জানাবেন। ফর ঝিঙেপোস্ত।

ভাই-দিদির মাঝে আমি কেন! হাতে তো মোবাইল আছে...তোমার ফোন পেলে ভাস্বতী খুশি হবে।

এই পরামর্শটিও কি চিকিৎসার অঙ্গ? তরুণ যাওয়ার পর ঘাড় ঝুলিয়ে ভাবছিল ভাস্কর। সবাই এতবার করে তাকে বলছে, তবু সে উদ্দীপিত হতে পারছে না কেন?

ভয়। ভয়। মৃত্যুভয়টা যেন ভাস্করকে পেয়ে বসেছে। প্রথমটায় অসুখটা ছিল তার কাছে এক ঝাঁকুনি দেওয়া আশঙ্কার মতো। হয়তো তাতে একটু মৃত্যুবিলাসও মিশে ছিল। কিন্তু এখন সে অহরহ মৃত্যুচিন্তায় আচ্ছন্ন। যে-কোনও সংলাপ, যে-কোনও ঘটনাই সে এখন আসন্ন মৃত্যুর প্রেক্ষিতে বিচার করে। তার বাইরে অন্য কিছু ভাবার ক্ষমতাই আর ভাস্করের নেই। নিজের তৈরি নির্দয় জগৎ সত্যিকারের পৃথিবীটাকেও যেন দূরে ঠেলে দিচ্ছে।

প্যাসেজে ঘড়ঘড় শব্দ। খাবারের ট্রলি। রোজকার মতোই দ্বিপ্রাহরিক আহার দিতে এল হাসপাতালের উর্দিধারী দশাসই লোকটা। দাঁত ছড়িয়ে বলল, ওভাবে বসে কেন দাদা? খুব বুঝি খিদে লেগেছে?

নাহ্, এমনিই...।

আজ কিন্তু পুরো ভাতটা খাবেন। রোজ পড়ে থাকছে।

টেরিয়ে খোপ খোপ থালাটি দেখে ওয়াক উঠে এল ভাস্করের। সেই পাতলা পাতলা কাটাপোনার ঝোল। এই মাছ তরুণদা নাকি বদলে দিতে বলবে? হাহ্। কালও সকালে সেই ডিমসেদ্ধই আসবে, দুপুরে একই মাছ, রাতে বিবমিষা উদ্রেককারী চিকেন স্টু। কে যেন বলেছিল, ব্রয়লার নাকি শকুন আর কান্ট্রি-চিকেনের হাইব্রিড! তাই হবে। নইলে এত অখাদ্য হয়!

কেন যে মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে গেল তরুণদা? কত মিথ্যে আর সইবে

ভাস্কর? বিরস মুখে ভাস্কর ভাত ভাঙল, কৌটোর পোস্ত ঢেলে নিয়ে মাখছে। এত পছন্দের পদ, দিদি যত্ন করে বানিয়েছে, তবু জিভে যেন স্বাদ লাগে না। এত অরুচি! এত অরুচি!

খুঁটে খুঁটে খানিকটা খেয়ে ছেড়ে দিল ভাস্কর। মুখ-টুখ ধুয়ে চিত হয়েছে বিছানায়। চোখ বুজল।

বোধহয় দশ মিনিটও যায়নি, ভাস্কর উঠে পড়েছে ধড়মড়িয়ে। ওফ্, আবার সেই ছবি। কোনও দুঃস্বপ্ন নয়, ঘোর বাস্তব। হুইলচেয়ারে বসিয়ে তাকে নিয়ে চলেছে লক্কা মার্কা ওয়ার্ডবয়টা...একটা কাচের ঘরে ঢুকিয়ে অপেক্ষা করতে বলল...সামনের দরজা খুলে বেরিয়ে এল লেডের জ্যাকেট পরা এক তরুণ...এবার সে নিয়ে যাচ্ছে ভাস্করকে...একটার পর একটা দরজা, একটার পর একটা দরজা...অবশেষে পুরু দেওয়ালওয়ালা সেই ঘর...যেন মৃত্যুকক্ষ...ছায়া ছায়া চার-পাঁচটা মানুষ ঘুরছে ঘরে...সর্বাঙ্গে সিসের আবরণ, রবারের মুখোশ আঁটা মুখে ডুবুরি গগল্‌স...অতিকায় এক যন্ত্র...প্রকাণ্ড টেবিলে শোওয়ানো হল ভাস্করকে...কী সব মাপজোপ হল বুকে কপালে...চাপা গোঁওও শব্দে চালু হয়েছে যন্ত্র...অদৃশ্য বিকিরণ ভাস্করকে ভেদ করে গেল...দশ সেকেন্ড...বিশ সেকেন্ড...এক মিনিট...দু' মিনিট...হালকা একটা তাপ বুকে-কপালে মেখে ভাস্কর ফিরছে এবার...একটার পর একটা দরজা, একটার পর একটা দরজা...

কেন যে ওই ঘরটাকে ভাস্করের মৃত্যুপুরী মনে হয়? অথচ তাকে বাঁচানোর জন্যেই তো...!

নিজের অজান্তেই বুকে হাত চলে গেল ভাস্করের। বোঝার চেষ্টা করছে কোনও তফাত হয়েছে কিনা। উঁহুঁ, হাড়-চামড়া তো একই রকম ঠেকে। কপালেও। একটুখানি জায়গা শুধু শুকনো শুকনো। পোড়া পোড়া মতন। হুঁহ্, এটুকুতেই যদি ভাস্কর প্রাণ ফিরে পেত!

ফোন বাজছে। কে তাকে স্মরণ করে? এই অসময়ে?

পাশেই মোবাইলটা পড়ে। ভাস্কর ঝুঁকে মনিটরে নামটা দেখল। সোহিনী। একটা গরম গরম ভিজে বাতাস বয়ে গেল হৃদয়ে। দুপুরে সোহিনীর ফোন আসে না বলে ভারী খেদ ছিল ভাস্করের, এখন প্রায় রোজই ফোন বাজায় সোহিনী। কিন্তু ভাস্করের তেমন শিহরন জাগে না যেন। তৃষ্ণাটাই বুঝি মরে গেছে।

খুদে দূরভাষ যন্ত্রটি কানে চাপল ভাস্কর। নিষ্প্রাণ স্বর বাজল, বলছি।

আজ আছ কেমন?

প্রশ্নে কি কোনও আকুলতা আছে? যদি থাকেই, তবে এখন কেন? এত দেরি করে?

ভাস্করের স্বর আরও নিস্তেজ শোনাল, যেমন থাকা উচিত।

রাতে আবার জ্বরটর আসেনি তো?

জানি না। নার্সরা তো আমায় কিছু খুলে বলে না।

কাল বিকেলে গা গুলোচ্ছিল...!

ওটা আছে।

ডাক্তারকে বলেছিলে?

বলে কোনও লাভ নেই। খামোখা মুখ নষ্ট।

কয়েক সেকেন্ড আওয়াজ নেই। তারপর ফের সোহিনীর গলা ফিরেছে। বুঝি সামান্য উচ্ছল হয়ে বলল, জানো, একটা সুখবর আছে।

কানে ঠাট্টার মতো লাগল ভাস্করের। নীরসভাবে বলল, শুনছি। বলো।

আজ পাপানের স্কুলে গিয়েছিলাম। ক্লাসটিচার তো পাপানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পাপান নাকি লাস্ট তিনটে ক্লাস টেস্টে সেকশানে হায়েস্ট মার্কস পেয়েছে।

ভাস্করের মন ভাল করার কী আন্তরিক প্রয়াস! জন্মে কখনও পাপানের পড়াশোনা নিয়ে ভাস্করের সঙ্গে আলোচনা করেছে সোহিনী?

নাহ্, এবার বোধহয় ভাস্করের একটু হরষিত হওয়া উচিত। কিন্তু চিত্ত যে সাড়া দিচ্ছে না, ভাস্কর কী করবে!

অবসন্ন স্বরে ভাস্কর বলল, বাহ্, ভাল। খুব ভাল।

দেখো, এবার পাপান ফার্স্ট টার্মিনালেও এক নম্বরে থাকবে।

তোমার হাতযশ। পাপানের ভাগ্য।

আবার খানিক নৈঃশব্দ্য। আবার সোহিনী বলল, পাপানটা আজ তোমায় দেখবে বলে খুব বায়না করছিল।

ও।

কী করে বোঝাই, হাসপাতালের নিয়মটা যে বিচ্ছিরি! রবিবার ছাড়া বাচ্চাদের অ্যালাও করে না!

তা হলে কাল এনো।

তোমার পাপানকে দেখতে ইচ্ছে করছে না?

দেখেই বা আর কী হবে!

আবার ও প্রান্ত নীরব। আবার সোহিনীর স্বর ফুটল, ছাড়ছি। বিকেলে দেখা হবে।

ফোনখানা মুঠোয় ধরে চুপচাপ বসে রইল ভাস্কর। নিজেকে যেন একটু একটু অপরাধী মনে হচ্ছিল হঠাৎ। কী আতান্তরেই না ফেলে দিয়েছে সোহিনীকে! এক দিকে সংসারের ঝক্কিঝামেলা, এক দিকে নিজের অফিস, আর এক দিকে লক্ষ-মনি বোঝার মতো এই ভাস্কর...বেচারা বুঝি খুব নাকানিচোবানি খাচ্ছে। অথচ বোঝা টানাটা তো পণ্ডশ্রম, যে-কোনও দিন ভাস্কর ফুস করে ডুবে যাবে। মাঝখান থেকে সোহিনীর একগাদা ছুটি নষ্ট, অর্থদণ্ড, শরীরপাত...। রেডিয়েশান চলাকালীন প্রত্যেক দিন হাসপাতালে উপস্থিত থাকতে হচ্ছে, নীচে বোধহয় একাই বসে থাকে, তারপর ছুট ছুট ছুট অফিস, ফের বিকেলে পড়িমরি করে আসা...। গ্রহের কী ফের, এত হ্যাপা এমন একজনের জন্য যাকে হয়তো সোহিনী কোনওদিন পছন্দই করেনি!

নাহ্, ভাস্করের ভাবনায় বোধহয় গলতি হচ্ছে। অন্তরের টান না থাকলে সোহিনী এত করছেই বা কেন? স্রেফ কর্তব্য? উঁহু, বোধহয় একটু-আধটু ভালবাসাও আছে, যা ভাস্কর টের পায়নি। নীরস একটা খোলের ভেতর যা কিনা সযত্নে ঢেকে রেখেছিল সোহিনী।

কিন্তু এখন আর জেনেবুঝে কী লাভ? এই বিদায় লগ্নে?

ভাস্কর ফের শুয়ে পড়ল। শূন্য দৃষ্টি সাদা সিলিং দেখছে। মস্তিষ্ক ক্রমে অবশ। অসাড়। কখন যে তন্দ্রা নামল চোখে। স্বপ্নহীন ঘোরটুকু ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। আপনা-আপনি খুলে যায় চোখ, আবার কখন যেন বুজে আসে... ঢিমে তেতালায় গড়িয়ে চলে দুপুর...

বিকেলে তরুণের কথা ফলে গেল। আজ অজস্র দর্শনার্থী। প্রথমে সোহিনী ঢুঁ মারল, তারপর জোড়ায় জোড়ায় আগমন। সোহিনীর বাবা-দাদা, ভাস্বতী আর রাজা, আশাবরী আবাসনের মণ্ডলদা-বউদি, মানিকতলার মাসি, কেওড়াপুকুরের পিসি...। প্রায় একই দরদি বাক্য ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে সবাই, ভাল হয়ে যাবে, ভাল হয়ে যাবে...! মিথ্যে শুনতে শুনতে ভাস্করের কান পচে যাওয়ার জোগাড়।

সওয়া ছ'টা নাগাদ দেবজিৎ-সুগত জুটি হাজির। অফিসে দু'জনকে একত্রে

দেখে একরাশ খোলা হাওয়ার ঝলক পেত ভাস্কর, আজ যেন কোনও অনুভূতিই নেই। মিয়োনো স্বরে বলল, বোসো।

দেবজিৎ হেসে বলল, তুহিনদার মুখে শুনলাম আপনার নাকি চেহারা খারাপ হয়েছে! কই, তেমন তো দেখছি না!

সুগত সায় দিল, হ্যাঁ তো। যথেষ্ট ফ্রেশ। লাস্ট যেদিন ক্যান্টিনে গল্প করছিলেন, সেরকমই তো লাগছে।

এত দুঃখেও ভাস্করের হাসি পেল। মাথা নেড়ে বলল, আনাড়ির মতো মিথ্যে বোলো না। প্লিজ। তোমাদের ওটা আসে না।

দেবজিৎ তবু স্তোক শোনাতে মরিয়া, না না, সত্যিই আপনাকে...

ছাড়ো। অন্য কথা বলো। তোমাদের ট্যুর ফাইনাল হল?

দেবজিৎ অস্বস্তিমাখা চোখে সুগতকে দেখল। সুগত ঢোঁক গিলে বলল, হ্যাঁ, যেতে তো হবে। দলবল সব রেডি।

কবে যেন তোমাদের প্রোগ্রাম?

জুলাইতে তো ঠিক ছিল। অনেকে আপত্তি করছে। বলছে, আর একটু আগে...জুনে নাকি ওখানকার ন্যাচারাল বিউটি আরও বেশি।

ওদিকে খুব রডোডেনড্রন ফোটে, তাই না?

জুনিপারও ফোটে অনেক। ঘাস নাকি নানান কালারের প্রিমুলায় ছেয়ে যায়। অবিকল কার্পেটের মতো দেখায় তখন।

কোথায় যেন এগজ্যাক্টলি যাচ্ছ তোমরা?

ওই যে বলেছিলাম...ইয়ক্সাম হয়ে...। প্রথমে জোংরি পিক, সেখান থেকে গোচা-লা ক্রস করে সোমিতি লেক, তারপর নতুন একটা রাস্তা ধরে, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পৌঁছব রাঠোংছু।

ছু মানে তো নদী?

হ্যাঁ। নদীটা নাকি খুব সুন্দর। কাছেই একটা ফল্‌স থেকে বেরিয়েছে।

পাহাড়ি নদীর জলে পা ঠেকালে কেমন যে একটা হয়...! ভাস্কর বিড়বিড় করে বলল, আমার আর যাওয়া হল না।

ধুৎ, তা কেন। এবারের ট্যুরটা মিস করলেন, নেক্সট ইয়ার তো আবার হচ্ছে...

তখন কাঁধে ঝোলা বেঁধে আপনিও যাবেন। এবারই তো আপনাকে খুব মনে পড়বে।

দেবজিৎরা চলে যেতেই ভাস্করের বুকের খাঁচাটা কেঁপে উঠল থরথর। জীবনের কাছে তো তার লাখ লাখ চাওয়া ছিল না, যা পেয়েছে তাতেই মোটামুটি সন্তুষ্ট থেকেছে। শুধু একটা মাত্র সাধ...তাও অপূর্ণ রেখে ছাড়তে হবে পৃথিবীটাকে! কেন? কেন?

অনুপম এসেছে কেবিনে। কাছে বসে বলল, কী রে, চোখমুখ তো ফুলিয়ে ফেলেছিস! খুব ঘুমিয়েছিস নাকি দুপুরে?

বন্ধুর কৃত্রিম অক্সিজেনটুকু গ্রহণ করতে পারল না ভাস্কর। ফ্যালফ্যাল তাকাচ্ছে। আচমকা অনুপমের হাত চেপে ধরে বলল, অ্যাই শোন, আমি কি খুব খারাপ লোক?

অনুপম তরল স্বরে বলল, হঠাৎ এই বিদ্‌ঘুটে উপলব্ধি?

সবাই বলে, যে যা অন্যায় করে, এ জন্মেই তাকে তার ফল ভোগ করতে হয়।...কিন্তু আমি কী দোষ করেছি বল?

যাহ্, এসব আবার কী চিন্তা!

না রে, নিশ্চয়ই কিছু করেছি। নইলে শাস্তিটা পাচ্ছি কেন?

কী শাস্তি? কীসের শাস্তি?...অসুখের কথা বলছিস? অসুখ-বিসুখ কার না হয়? অনুপম ভাস্করের হাতে হাত রাখল। নরম করে বলল, ডাক্তার দেখে, চিকিৎসা চলে, রোগ সেরেও যায়।

কিন্তু আমি যে মরে যাব। আমার একটা মাত্র আশা ছিল, তাও মিটল না। নো চান্স।

কী আশা?

সে আর জেনে কী করবি? ভাস্করের শ্বাস পড়ল, জানিস, জয়েন্ট পরীক্ষার সময়ে একটা ছেলের সিট পড়েছিল আমার পাশে। শ্যামবাজার, না পাইকপাড়া, কোথায় যেন বাড়ি। তোর মনে আছে নিশ্চয়ই, ফিজিক্সের কোয়েশ্চেন সেবার বেশ কঠিন ছিল? ...মরিয়া হয়ে পকেট থেকে টুকলি বার করেছিলাম। জাস্ট লেখা স্টার্ট করেছি, ওমনি ইনভিজিলেটারের চোখ আমার ওপর। টের পেয়েই চোথাটা ঠেলে দিলাম ছেলেটার টেবিলে। ছেলেটা অবাক, হাতে তুলে কাগজটা দেখছে, ব্যস অবিলম্বে কট।...এক্সপেলড হয়ে গেল বেচারা। কত হাতেপায়ে ধরল, এগজাম হলের গার্ডটা শুনলই না।...কে জানে, হয়তো ছেলেটার আর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াই হয়নি।...তার আশাভঙ্গের প্রতিফল কি পাচ্ছি আমি?

আহ্, ভাস্কর, ওভাবে জগতে কিছু ঘটে না। যার কথা বলছিস, সে হয়তো ব্যাপারটা ভুলেই গেছে। হয়তো অন্য লাইনে শাইন করেছে।

না রে, আমাকে সান্ত্বনা দিস না। আমি ভাল নই, আমি ভাল নই। ভাস্কর হাঁপাচ্ছে মৃদু মৃদু, বছর দশেক আগে আমাদের একটা প্রোজেক্ট চলছিল আরামবাগে। আমি ছিলাম সাইট ইনচার্জ। একটা ইয়ং স্টাফ হাইটেনশন লাইনে কাজ করতে গিয়ে মরে গেল হঠাৎ। নিজেরই অসাবধানতায়। আমাদের অফিস তাকে কম্পেনসেশন দেয়নি। বাড়ির একমাত্র আর্নিং মেম্বার ছিল ছেলেটা। তার মা রোজ অফিসে এসে বসে থাকত। পাছে আমাকে পাকড়াও করে, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াতাম। শেষে সিকিউরিটিকে বলে মহিলার অফিসে ঢোকাটাই বন্ধ করে দিলাম।...তুই বল, এটা পাপ নয়? ওই মায়ের অভিশাপ আমার লাগেনি?

ওফ্, কী খ্যাপামি শুরু করলি ভাস্কর? শুয়ে পড়, শুয়ে পড়।

প্রায় জোর করেই ভাস্করের মাথা বালিশে নামিয়ে দিল অনুপম। অস্ফুটে বলল, পাপ-পুণ্য কিছুই আমরা বুঝি না রে। ঘটনা নিজের মনেই ঘটে, আমরা শুধু নিমিত্তের ভাগী মাত্র।

না রে, সচেতনভাবেই তো অন্যায় করেছি কতগুলো। ভাস্কর বলেই চলেছে, আমার পড়ার ঘরে একটা নেংটি ইঁদুর আসত। আমি তখন ক্লাস সেভেনে। নাকি এইটে...? অঙ্ক বইয়ের পাতা খেয়ে দিয়েছিল ইঁদুরটা। রেগেমেগে বাজার থেকে বিষ এনে খাবারের সঙ্গে নাড়ু পাকিয়ে রেখে দিয়েছিলাম টেবিলের নীচে। বোকা ইঁদুর তাই খেয়ে পরের দিন অক্কা। চোখ দুটো খুলে মরে পড়ে ছিল। যেন মৃত্যুর পরেও অসহায়ভাবে পৃথিবীকে দেখছে। ওই খুন করাটাই কি আমাকে আজ...?

এবার ভাস্করের ঠোঁটই শুধু নড়ছে, একটি কথাও আর বোধগম্য নয়। অনুপম তাকে ঝাঁকাল, নাহ্, ভাস্কর বুঝি চেতনায় নেই।

সোহিনী ঢুকেছে। সঙ্গে ওষুধের প্যাকেট। ভাস্কর ঝাপসাভাবে দেখতে পেল সোহিনীকে। ঝুঁকে দেখছে তাকেই। ভাস্কর হাত বাড়াতে গেল, পারল না। অবসাদের প্রান্তসীমায় পৌঁছে শুধু ক্ষীণ শুনতে পেল অনুপমের গলা, ডাক্তারকে ডাকো সোহিনী। এক্ষুনি।

নয়

বিপদ যখন আসে, বুঝি দল বেঁধেই আসে। যেন ঘাপটি মেরে কোথাও লুকিয়ে ছিল, একজন দেখা দিতেই অন্যরাও বেরিয়ে পড়ছে ঝুপঝাপ। আর সেই এলোমেলো বিপদের স্রোতে যাকে নাও বাইতে হয়, তার যে কী নাজেহাল দশা!

ভাস্করের টালমাটাল অবস্থা তো চলছেই। আজ এক উপসর্গ, তো কাল আর এক। মানসিক অবসাদের ধাক্কাটা সামলাতেই তো সোহিনীকে প্রায় নাকে দড়ি দিয়ে ছুটতে হল। মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলতে হয়, কাউন্সেলারদের প্রশ্ন করে জানতে হচ্ছে কতটা উন্নতি হল ভাস্করের, রেডিয়েশান রুম থেকে ভাস্করকে বার করার সময়ে তো কাঁটা হয়ে থাকে সোহিনী...। অবসাদ যাও বা কমল, বমি আর মাথা ঘোরা তো লেগেই আছে। তারই মাঝে হঠাৎ একদিন স্কুল থেকে গায়ে ধুম জ্বর নিয়ে ফিরল পাপান। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ডাক্তার দেখাও, অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াও...। ক'দিন ছেলে এমন ঘ্যানঘ্যান করল, তাকে ফেলে দু'দণ্ড নড়া দায়। সকালে রেডিয়েশানের সময়ে তরুণ কিংবা রাজা হাসপাতালের ঝুঁকিটা সামলে নিতে পারে। এক-আধদিন অনুপমও। কিন্তু বিকেলে উপায় নেই, সোহিনীর অদর্শনে ভাস্কর ভারী উতলা হয়ে পড়ে। সুতরাং কোনওক্রমে ছেলেকে বুঝিয়ে শুনিয়ে শাশুড়ির জিম্মায় রেখে ছোটো হাসপাতাল। পাপান যখন মোটামুটি গা ঝাড়া দিয়ে উঠল, সবে স্কুল যাওয়া শুরু করেছে, আবার এক দুঃসংবাদ। সোহিনীর মা উঠোনে আছাড় খেয়ে কোমরে চোট পেয়েছে জোর। এক্স-রে অবশ্য বলছে আঘাত তেমন মারাত্মক নয়, তবু মা এখনও শয্যাশায়ী। তাকে একবার দেখে আসা কি সোহিনীর কর্তব্য নয়? ওদিকে অফিসে আর এক বিপত্তি। সামনের মাসে ট্রান্সফার লিস্ট বেরোচ্ছে। নয় নয় করে একই ব্রাঞ্চে চার বছর হল, সোহিনীর নাম থাকতেই পারে তালিকায়। তেমন দূরে হয়তো পাঠাবে না, তবে ব্যারাকপুর বারুইপুর হলেও তো সোহিনীর প্রাণান্ত।

হাজার গন্ডা চিন্তা মাথায় নিয়ে সোহিনী স্থির করল, আজই শোভাবাজার ঘুরে আসবে। রবিবারটাই সুবিধে, নইলে আর হয়তো ফুরসত পাবে না। ভাস্করকে এবার ছেড়ে দেবে, বাপের বাড়ি যাওয়া তো তখন আরও মুশকিল। ঘরে ফিরে ভাস্কর কী খেল দেখাবে তার ঠিক আছে!

নিজের পরিকল্পনা মতো তাড়াতাড়ি দুপুরের খাওয়া সেরে তৈরি হচ্ছিল সোহিনী। যেই না ভ্যানিটিব্যাগ কাঁধে তুলেছে, অমনি বনানীর প্রবেশ। তার গলা এখন এত নির্জীব, স্টেথো লাগিয়ে শুনতে হয়।

স্তিমিত স্বরে বনানী বলল, কাল তোমায় জানানো হয়নি, বাবুনের একটা এলআইসি-র চিঠি এসেছে। প্রিমিয়ামের নোটিশ।

সোহিনী তাড়াহুড়ো করে বলল, পেয়েছি। সেন্টারটেবিলে পড়ে ছিল।

এই সপ্তাহেই জমা দেওয়ার ডেট না?

তো? এ মাসের মধ্যে দিলেই তো হল।

তুমি দেবে জমা?

আমার তো দেওয়ার কথা নয়। ওদের নিয়মে আটকাতেও পারে।

তা হলে কী হবে?

দেখি।...ভাস্কর ফিরুক।

আর একটা কথা...।

সোহিনী বিরক্ত হল। সকাল থেকে তো সে বাড়িতে, ঠিক এই সময়ে সব একে একে মনে পড়তে হল? অসন্তোষটুকু প্রকাশ করতেই বুঝি ইচ্ছে করে ঘড়ি দেখল সোহিনী। ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, হ্যাঁ...বলুন?

বনানীর মুখ কাঁচুমাচু, আমার পেনশানটা তোলা হয়নি, গত মাসেও বাদ পড়ল...

আমাকে ব্যাঙ্কে যেতে হবে, তাই তো?

না মানে...তরুণ বেচারার যা ছোটাছুটি যাচ্ছে...। বুলুকেও বলতে পারি, কিন্তু ওদের বাড়ি থেকে যা দূর...

কথার ভঙ্গিতে সোহিনীর গা রি রি। জামাই ছুটছে, আর ছেলের বউ বুঝি শুয়ে বসে? বনানী দেবীর পেনশান এখনও সেই অফিস পাড়ায়। মেয়ের বেহালার বাড়ি থেকে যা কিনা বহু দূর! আর যাদবপুর, নিউ বালিগঞ্জ, কিংবা বাইপাস থেকে বুঝি নাকের ডগায়? কখন যাবে সে? কীভাবে যাবে? দেড় মাস ধরে তো অফিস থেকে বিস্তর সুবিধে নিচ্ছে, ক্যাশকাউন্টার থেকে সরিয়ে তাকে লোন সেকশনে দেওয়া হল, যখন খুশি ঢুকছে, বেরোচ্ছে...। এখন শাশুড়ির পেনশান তোলার জন্য ছুটি চাওয়াটাই যা বাকি!

গোমড়া গলায় সোহিনী বলল, কেন যে পাড়ার ব্রাঞ্চে অ্যাকাউন্টটা শিফ্‌ট করাননি!

আমি তো তাই চেয়েছিলাম। বাবুনই বলল, বাবা যখন ওখানে অ্যাকাউন্ট করে গেছে, থাক না...ওদিকে তো আমি যাই, আমিই নয় ড্র করে আনব...!

হুঁহ্, ভাস্করের আর কী। উনি তো শয্যা নিলেন, অতএব দায়িত্ব এবার সোহিনীর। ভুরুতে মোটা ভাঁজ ফেলে সোহিনী বলল, চেকটা লিখে রাখবেন, রাত্তিরে নিয়ে নেব।

বাঁচালে। হাতে একদম টাকা নেই...। বনানী যেন কিঞ্চিৎ উদ্ভাসিত, একটা কাজ করলে হয় না সোহিনী? যদি অ্যাকাউন্টটা তোমার ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার করে নিই...?

ভালই তো। বলতে গিয়েও সোহিনী প্রায় আঁতকে উঠেছে। কী বিপজ্জনক মতলব! বোঝাটা পাকাপাকি ভাবে সোহিনীর ঘাড়ে চাপাতে চায় নাকি? আপাতদৃষ্টিতে অসুবিধের কোনও কারণ নেই, কিন্তু...। এই মহিলার সঙ্গে ভবিষ্যতে সোহিনীর সম্পর্ক থাকবেই, এমন কোনও নিশ্চয়তা আছে কি? বরং উলটোটাই তো সত্যি, যদি না নিয়তি তার সঙ্গে ফের কোনও নিষ্ঠুর রসিকতা করে।

সোহিনী সতর্ক স্বরে বলল, তাতেও লাভ নেই মা। যদি বদলি হয়ে যাই, তা হলেও তো সেই একই প্রবলেম।

তবে পাড়াতেই করি, কী বলো?

হ্যাঁ। সেটাই ভাল।

বেশ। বাবুন ফিরলে বাবুনকে বলছি।

কথাটা ঠং করে কানে বাজল সোহিনীর। মহিলার কি বিশ্বাস, হাসপাতাল থেকে প্রত্যাবর্তন মানে তাঁর পুত্র এখন আরোগ্যের দোরগোড়ায়? নাকি ওটা একটা কথার মাত্রা? নিছক অভ্যেসের বশে বলছেন? বেচারা! এখনও কত ধাক্কা যে কপালে আছে মহিলার!

আর বাক্যব্যয় না করে বনানীকে পাশ কাটিয়ে সোহিনী ড্রয়িংহলে। টিভি দেখছে পাপান। সোফায় বাবু হয়ে বসার ভঙ্গিটি হুবহু ভাস্করের। চোখে লাগে।

ভারী ভারী গলায় সোহিনী বলল, এবার স্নানে যাও পাপান।

পাপানের সেই চিরন্তন জবাব, পাঁচ মিনিট।

আমি বেরোলাম। ঠাম্মাকে কিন্তু একদম জ্বালাবে না।...বিকেলে কখন বার্থডে পার্টিতে যাচ্ছ?

সিক্স পিএম।

তোমার বন্ধুর গিফ্‌টটা স্টাডিটেবিলে র‍্যাপ করে রেখেছি, নিয়ো মনে করে।

ইয়াপ্‌।

ন'টার মধ্যে ফিরবে। আমাকে যেন ওদের ফ্ল্যাটে গিয়ে ডাকতে না হয়।

জবাব নেই। এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে সোহিনী চটি গলাল। ফ্ল্যাটের দরজা টেনে দ্রুত পায়ে একতলায়। চাতালটায় নামতেই প্রশান্ত শিকদার। 'আশাবরী'র বাসিন্দাদের দেখভাল কমিটির হর্তাকর্তা। পরনে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি, মাথায় ছাতা, কাঁধে শান্তিনিকেতনি ব্যাগ।

ছাতা বন্ধ করতে করতে প্রশান্ত বলল, চললেন কোথায়? হাসপাতালে?

সোহিনী অল্প চোয়াল ছড়াল। যার অর্থ হ্যাঁও হয়, নাও হয়।

প্রশান্ত অনুচ্চ স্বরে বলল, ভাস্করবাবুর কি এখনও রে চলছে?

আর একটা ডোজ বাকি। কাল শেষ।

এখন আছেন কেমন?

মোটামুটি।

হাঁটাচলা করছেন?

ঘরের মধ্যে। করিডোরেও যায় কখনও-সখনও।

অসুখটা বড্ড উইক করে দেয়। তার সঙ্গে ওই ট্রিটমেন্ট...। আমার পিসতুতো দাদাকে তো দেখেছি...রেডিয়েশানের পর রোজ বমি করত। এখন অবশ্য সে অনেকটাই স্টেডি। পাঁচ-পাঁচটা কেমো নিয়ে ফেলল।

ও।

সিক্সথ কেমো নেক্সট্‌ মান্‌থে দেবে। ডাক্তার তো বলছে দাদা বোধহয় এ যাত্রা বেঁচে গেল।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ তো। এখন তো ক্যান্সারের সারভাইভাল রেট অনেক বেড়েছে। প্রশান্তর ঠোঁটে আশ্বাসের হাসি, চিন্তা করবেন না ম্যাডাম। ভাস্করবাবুর মতো স্ট্রং অ্যান্ড স্টাউট পার্সন অবশ্যই রোগটাকে ওভারকাম করবেন।

সোহিনী মৃদু স্বরে বলল, চেষ্টা তো করছি।

নববর্ষের দিন মিটিং-এ কত বার যে ভাস্করবাবুর কথা উঠল। যারা জানত না...শুনে তো হায় হায় করছে। সিগারেট, তামাক, জর্দা, কোনও নেশা

নেই...এত কম বয়স...তার কিনা এই ব্যাধি? শিয়ার ব্যাড লাক। আমরা মনেপ্রাণে চাই...

অবিকল একই ভাষায় এই ধরনের সহানুভূতি যে কত শুনতে হচ্ছে সোহিনীকে! অফিসের লোকেরা বলছে, আত্মীয়স্বজন বলছে...। বন্ধুদের মধ্যে যারই কানে গেছে, তারই মুখ থেকে উড়ে আসছে করুণামাখা বারতা। একটা দুঃখী দুঃখী ভাব ফুটিয়ে অবিরাম সেই বাণী গেলা যে কী কষ্টকর!

প্রসঙ্গ বদলাতে সোহিনী বলল, সেদিন আপনাদের মিটিং-এ কী হল?

ওই...দুর্গাপুজোর কমিটি তৈরি...। লিফলেট ছাপতে গেছে, এলে পাঠিয়ে দেব। প্রশান্ত ফের স্টিয়ারিং ঘুরিয়েছে, ভাস্করবাবু বাড়ি আসছেন কবে?

বুধ-বৃহস্পতিবারের আগে নয়।

ডাক্তাররা বলেছে কিছু? মানে, কতটা ইম্প্রুভমেন্ট হল...?

বলছে তো কমেছে। রেডিয়েশান শেষ হলে আবার স্ক্যান হবে, তখন ফাইনাল বোঝা যাবে।

ভালই হবে। দেখে নেবেন।...এর পরে তো কেমো?

হুঁ।

উনি ফিরলে একদিন দেখা করে আসব।

প্রশান্তর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যেন বাঁচল সোহিনী। রাস্তায় এসে দু'পা হেঁটেই টের পেল আজ প্রচণ্ড উত্তাপ। বৈশাখ যেন আগুন ছড়াচ্ছে। পৌনে একটা বাজে, পথঘাট প্রায় জনশূন্য, কুকুরগুলো পর্যন্ত ছায়া খুঁজছে। এ বছর একটাই যা কালবৈশাখী হল, তারপর আর মেঘের চিহ্ন নেই আকাশে। মাঝে মাঝে একটা শুকনো বাতাস বইছে। তপ্ত হাওয়ায় যেন জ্বলে যায় চামড়া। এখনও তো জ্যৈষ্ঠ পড়ে, কত যে আরও পুড়বে পৃথিবী! পোড়াবে!

বাসস্টপে পৌঁছোনোর আগেই সোহিনী ঝপ করে একটা ট্যাক্সি ধরে নিল। গাড়ির সিটও যেন জ্বলন্ত অঙ্গার, ছ্যাঁকা লাগছে। ড্রাইভারকে রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো স্টেশন যেতে বলল। এই রৌদ্রদগ্ধ শহরে পাতালপথই এখন আরামদায়ক।

নির্দেশ দিয়েও বসতে পারছিল না সোহিনী। তাপ শুধু চরাচরে নয়, জ্বালাময়ী তাপ যেন সোহিনীর মনেও। প্রশান্তবাবুর পিসতুতো দাদার সমাচারটাই ফিরে ফিরে আসছে মস্তিষ্কে। পাঁচ-পাঁচটা কেমো নিয়েও এখন ষষ্ঠের প্রতীক্ষায়? বেঁচে যাবে লোকটা? কোথায় ক্যান্সার, জিজ্ঞেস করা হল

না তো! নিশ্চয়ই ফুসফুসে নয়? কিংবা যেখানেই হোক, নিশ্চয়ই ছড়ায়নি অন্যত্র? ভাস্করের মতো?

নিজের ভাবনায় সোহিনী নিজেই চমকেছে ভীষণ। আশ্চর্য, সে কি এখনও ভাস্করের মৃত্যুকামনা করে চলেছে? যার সঙ্গে বারোটা বছর কাটাল, তার প্রতি কি দয়া মায়া করুণা প্রীতি, কিছুই নেই সোহিনীর? চটপট ভাস্করকে চিতায় তুলে দিয়েই কি তার শান্তি?

কক্ষনও না। কক্ষনও না। ভাস্করকে সারিয়ে তোলার জন্যই তো সোহিনী আপ্রাণ লড়ছে। তার চেষ্টায় কি ফাঁকি আছে কোনও? ডাক্তাররা যা বলছে, প্রতিটি পরামর্শই তো অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে সে। ভাস্করকে প্রফুল্ল রাখতে ফোন করছে যখন-তখন, যতটা সম্ভব উদ্দীপক বাক্য শুনিয়ে তার মনে বাঁচার স্পৃহা জাগাতে চাইছে...তা হলে? তা হলে?

এই তা হলের উত্তরটাই তো পাওয়া বড় কঠিন। মন যে কখন কোন দিকে ধায়, মন নিজেও কি জানে? কোন চাওয়াটা তার সত্যি, কোন চাওয়াটা মিথ্যে, কোন ইচ্ছেটা ঠিক, কোনটাই বা ভুল, মন কি বোঝে সর্বদা?

সোহিনীর অন্যমনস্ক হাত মোবাইল ফোন বার করল। চেনা নম্বরে আঙুল ছোঁয়াতেই ওপারে অনুপমের উৎকণ্ঠিত গলা, কী হল সোহিনী? সব ঠিকঠাক তো?

সোহিনীর একটা শ্বাস পড়ল, বেঠিক মনে হচ্ছে কেন?

তা নয়...। তুমি এ সময়ে ফোন করো না তো!

আজ করলাম। ধরে নাও, হঠাৎ তোমার গলা শুনতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

সে কী? কেন?

সব ইচ্ছের কি কারণ থাকে অনুপম? প্রতিটি ইচ্ছের মানে বুঝতে পারলে আমাদের জীবনটা কি অনেক সরল হয়ে যেত না?

অনুপম চুপ। তারপর যেন হালকা স্বরে বলল, হঠাৎ তোমায় হেঁয়ালিতে পেয়ে বসেছে নাকি, সোহিনী?

কী জানি! হবে হয়তো।

অনুপম ফের নিশ্চুপ। আবার গলা বাজল, একটু যেন গভীর, সোহিনী, তোমার কি মন খারাপ?

নাহ্। আমার আবার মন কীসের! সোহিনী গলার বাষ্পটাকে গিলল। তারপর সহজ সুরেই বলল, বিকেলে আসছ তো হাসপাতালে?

শিয়োর।

দেখা হবে। ছাড়ছি।

ফোন ব্যাগে রেখে একটুক্ষণ চোখ বুজে রইল সোহিনী। বড় ক্লান্তি, বড্ড ক্লান্তি। কবে যে একটু বিশ্রাম মিলবে সোহিনীর? কীভাবে যে মিলবে?

মেট্রোরেলে শোভাবাজার পৌঁছোতে বেলা গড়াল। ভূগর্ভ ছেড়ে ওপরে উঠতেই চেনা রাস্তা, চেনা বাড়িঘর, চেনা চেনা দোকানপাট। পাড়ায় ঢুকে নিজেদের পুরনো আমলের বাড়িটা দেখে বুক দুলে উঠেছে ফের। ওই শরিকি বাড়ি, মোটা মোটা দেওয়াল, উঁচু উঁচু সিলিং, বড় বড় দরজা-জানালা, একটা অদ্ভুত সোঁদা সোঁদা প্রাচীন গন্ধ, বুঝি তার চেতনার অন্তঃস্থলে গেঁথে আছে এখনও। বহিরঙ্গে হয়তো সাদৃশ্য নেই, তবু অনুপমদের বাড়ির সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল! হয়তো বা ওই গন্ধটায়। সাধে কি পণ্ডিতিয়ার বাড়িটা তাকে টানে!

সেই বাড়িও তো নাকি ভাঙা পড়তে চলল। সোহিনীর প্রতিটি ভাল লাগার উৎসই যেন নিয়তি গ্রাস করছে একে একে। হা কপাল!

শোভাবাজারের বাড়ি অবশ্য ভাঙাভাঙির সম্ভাবনায় নেই। এত অজস্র শরিক, তাদের এত ধরনের চাহিদা...। বহু কাল আগে পৃথক হয়েছে সবাই, এখন তো কেউ কারও খোঁজও রাখে না বড় একটা। শুধু বিয়েশাদি, পুজোপার্বণে যা মেলামেশা হয় একটু-আধটু। আর হ্যাঁ, কেউ মরলে জড়ো হয় সকলে।

একতলায় নিজেদের অংশের সদর দরজায় বেল টিপল সোহিনী। পাল্লা খুলে কৌশিক হতচকিত। ঘাবড়ানো গলায় বলল, তুই হঠাৎ? ভরদুপুরে?

কেন? মানা আছে?

ও কী কথা! আয়, আয়, ভেতরে আয়। আসার আগে একটা ফোন তো করবি!

এ বাড়িতে বুঝি আমায় বলেকয়ে আসতে হবে?

দেখো কাণ্ড, কী কথার কী মানে! হেসেই বলল কৌশিক, কপালে তবু উদ্বেগের রেখা, হাসপাতালে সব ঠিকঠাক তো?

ভাস্করের ভালমন্দ নিয়েই এখন উদ্‌ব্যস্ত সবাই, সোহিনীর খোঁজ আর কে রাখে!

শীর্ণ হেসে সোহিনী বলল, বোকার মতো বলিস না দাদা। হাসপাতালে কিছু ঘটলে আমি কি এখানে আসতে পারতাম?

সোহিনীর সাড়া পেয়ে চৈতালি বেরিয়েছে অন্দর থেকে। সঙ্গে তানিয়াও। ছুট্টে এসে পিসির কোমর জড়িয়ে ধরল তানিয়া, তুমি কদ্দিন পর এলে গো! তোমার মুখটাই তো ভুলে যাচ্ছিলাম।

সাত বছরের তানিয়ার এ হেন পাকা পাকা সংলাপে সোহিনী বেশ মজা পায়। আজ যেন একটু জোর করেই হাসল। ভাইঝির গাল টিপে দিয়ে বলল, এবার দেখে ভাল করে মনে রাখ। আবার কবে আসব তার ঠিক নেই কিন্তু।

কেন গো? পিসাইয়ের অসুখ বলে?

হুম্।

পিসাইটা বড্ড ভুগছে। এবার তো সেরে উঠলেই পারে।

অ্যাই, থাম তো। চৈতালি ধমকে উঠেছে মেয়েকে, পিসিমণিকে একটু হাঁপ জিরোতে দে। কত দূর থেকে তেতেপুড়ে এল...

তানিয়া তবু নাছোড়বান্দা, পাপানদাদা আসেনি কেন?

ওর আজ নেমন্তন্ন। বন্ধুর জন্মদিন।

ভেরি ব্যাড। ছেলেকে নিয়েই মাকে আসতে হয়।

এবার চৈতালিও হাসছে। সোহিনীকে বলল, ইস, মুখটা তো পুড়ে কালো মেরে গেছে। দাঁড়াও, আগে এক গ্লাস জল আনি।

খুকুকে আমপোড়ার শরবত দাও না।

অত তরিজুত আমার সইবে না রে দাদা। আমি এখন রুশি সৈনিক, আমার জলই যথেষ্ট।...বাবা কোথায়?

খাচ্ছিলেন তো। নির্ঘাত তোমার গলা পেয়ে...। চৈতালি চোখে একটা ভঙ্গি করল। স্বর নামিয়ে বলল, যাও, চট করে গিয়ে মুখটা দেখাও।

চওড়া, ঢাকা ভেতরবারান্দাটি এ বাড়ির ডাইনিংহল। প্যাসেজ পেরিয়ে জায়গাটায় এল সোহিনী। খাওয়ার টেবিলে পূর্ণেন্দু সত্যিই হাত গুটিয়ে বসে। চশমা পরা চোখজোড়া মেয়েরই প্রতীক্ষায়।

বাবার পিঠে আলগা হাত রেখে সোহিনী বলল, কী, লাস্ট দিন তো দেখলাম ঘং ঘং কাশছিলে... এখন কেমন?

আমার কথা বাদ দে। আমাদের তো যাওয়ারই বয়স।...তুই কি হাসপাতাল থেকে?

নাহ্। সকালে আজ যাইনি। বাড়ি থেকেই।

খেয়ে বেরোসনি নিশ্চয়ই? ...বসে যা।

উঁহু, ভাত খাওয়া হয়ে গেছে। তুমি থেমে কেন, স্টার্ট করো।

অল্প করে খা। চৈতালি আজ মাংসটা খাসা রেঁধেছে।

প্লিজ বাবা... এখন ইচ্ছে করছে না।

ও কী, খুকু? ঘর থেকে হঠাৎই নমিতার গলা উড়ে এল, দুপুরে খাওয়ার সময়ে এসেছ, মুখে দুটো না দিলে গেরস্তর অকল্যাণ হবে না?

মা'র এধরনের বচন সোহিনীর কানসওয়া। বিয়ের পর থেকেই তো এ বাড়িতে সে যতটা মেয়ে, তার চেয়ে বেশি অতিথি!

গলা উঠিয়ে সোহিনী বলল, শুয়ে শুয়ে ডায়ালগ ঝাড়তে হবে না। যাচ্ছি, তোমার মজা দেখাচ্ছি।

কৌশিক বসে গেছে টেবিলে। বলল, তুই সত্যি কিছু মুখে দিবি না?

পরে। শুধু মাংসটা টেস্ট করব।

বলেই সোহিনী সোজা বড় ঘরে। সাবেকি আমলের খাটে আধশোওয়া হয়ে আছে নমিতা, পিঠে দু'খানা গোবদা গোবদা বালিশ।

চোখ নাচিয়ে সোহিনী বলল, বসতে পারছ তা হলে?

একটু একটু। বেশিক্ষণ পারি না। ব্যথাটা চাগাড় দেয়। ...পরশু অবধি যা অবস্থা...মনে হচ্ছিল চিরকালের মতো শয্যাশায়ী হয়েই কাটাতে হবে।

সেটাই তোমার উপযুক্ত শাস্তি। হাঁটু নড়ে না, ঠ্যাং চলে না, তবু উঠোনে ঘুরঘুর করছিলে কেন?

ঝি-টা এমন শ্যাওলা জমিয়ে রাখে...! রোজ বাসন মাজছে, একদিনও ভাল করে ঘষে না...

তাই তুমি নেমে ঝাঁটা চালাবে?

না রে। শুধু পা দিয়ে একটু ডলছিলাম। হঠাৎ এমন পিছলে গেলাম...

শুনলে গা-পিত্তি জ্বলে যায়। একবার ভেবেও দেখো না, তোমার সঙ্গে আর সকলেরও কত ভোগান্তি।

অত বকছিস কেন? জেনেবুঝে কেউ আপনজনকে ভোগায়?

সোহিনী পলক উদাস। সেও যদি মা'র মতো করে ভাবতে পারত!

নমিতা আপন মনে বলছে, সবই ভাগ্যের লিখন রে খুকু। বিধাতা যাকে যতটা কষ্ট বরাদ্দ করছে, তাকে তো সেটা পেতেই হবে। ...এই তো ধর না, তোর বাবা মুঠো মুঠো সিগারেট খায়...দু'-পাঁচ দিন নয়, আজ বোধহয় পঞ্চাশ

বছর... হাঁপের টানে ভোগে বটে, তবে বলতে নেই... সাংঘাতিক কিছু তো হয়নি! ওদিকে বেচারা আমার জামাইটা...

ঘুরেফিরে সেই একই প্রসঙ্গ! অসুস্থ মাকে দেখার অছিলায় একটু তাজা বাতাস নিতে এসেছিল সোহিনী, এখানেও বুঝি নিস্তার নেই।

নমিতা আঁচলে চোখ মুছছে। মা'র পাশে আরও দু'-এক মিনিট বসে থেকে উঠে গেল সোহিনী। পা টিপে টিপে পাশের ঘরে এসেছে। এখানে আগে থাকত সোহিনী, এখন ঘরখানা পূর্ণেন্দুর বইপত্র আর গানবাজনার সরঞ্জামে বোঝাই। আছে হারমোনিয়াম, আছে তবলা, পূর্ণেন্দুর সেতার, সোহিনীর তানপুরাটাও। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাবে ভেবেছিল, শেষমেশ আর ইচ্ছে করেনি।

শ্লথ পায়ে তানপুরাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সোহিনী, আঙুল ছোঁয়াল তারে। বাঁধা নেই, বেসুরো ধ্বনি বাজছে।

লম্বা একটা শ্বাস গড়িয়ে এল সোহিনীর বুক বেয়ে। পণ্ডিত বিশ্বম্ভর চক্রবর্তীর কাছে নাড়া বেঁধেছিল, কত মন দিয়ে শিখেছিল গান, কী ভাল ভাল বন্দিশ দিয়েছিলেন গুরুজি, ভেবেছিল উচ্চাঙ্গ সংগীতেই প্রাণমন সঁপে দেবে... তারপর গুরুজিও মারা গেলেন, বাবার খুব ইচ্ছে ছিল বলে সেও পড়তে চলে গেল বিশ্বভারতীতে... সোহিনীর জীবনটাই বয়ে গেল অন্য খাতে।

একেও কি মা ভাগ্যের লিখন বলবে? নাকি সোহিনীর তেমন জোরদার ইচ্ছে ছিল না বলেই ঘুরে গেল স্রোত? আর একবার কি ফেরা যায়? যদি অনুপম পাশে থাকে...!

চৈতালি ডাকছে। চিন্তাটা ছিঁড়ে গেল। সোহিনী ফিরল খাওয়ার টেবিলে। পূর্ণেন্দুর আহার শেষ, সম্ভবত বৈঠকখানায় গিয়ে সিগারেট ফুঁকছে। কৌশিক আর চৈতালি সোহিনীর অপেক্ষায় বসে।

চৈতালি এক বাটি মাংস বাড়িয়ে দিয়ে বলল, একটুও ভাত নেবে না?

না রে। শুধুই ভাল। ...এতটা দিয়েছিস কেন?

খাও না যতটা পারো। বাকিটার জন্য তোমার দাদা তো ওত পেতে রয়েছে।

কৌশিক হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, মাকে কেমন দেখলি?

ভাঙবে তবু মচকাবে না।

কোমর তো মা'র আসল প্রবলেম নয়। সাত দিনের ফিজিওথেরাপিই

কাফি। একটা মেয়েকে ফিট করেছি, কাল সন্ধেবেলা থেকে আসবে। মা'র মেন হচ্ছে হাঁটু। স্পেশালি রাইট নি একেবারেই গেছে।

তা হলে এবার অপারেশনটা করিয়ে নে। দরকার বুঝলে ডাক্তার হাঁটু বদলে দিক।

আমারও সেরকমই প্ল্যান। আগে ভাস্করের ব্যাপারটা মিটুক। একটা টেনশন চলতে চলতে আর একটাতে জড়িয়ে পড়ার দরকার কী।

মিটবে মানে? কী বলতে চায় দাদা? মরে যাবে ভাস্কর? নাকি সুস্থ হয়ে উঠবে? নাকি কিছুই ভেবে বলেনি, এও স্রেফ কথার মাত্রা? একটুকরো মাংস দাঁতে ছিঁড়ল সোহিনী। ভাস্কর মরুক, কি বাঁচুক, তার সঙ্গে মা'র হাঁটু বদলের কী সম্পর্ক? মা তো সোহিনী নয়, যে ভাস্করের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তার জীবনের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করবে? তা ছাড়া দাদার আবার টেনশন কীসের? ভাস্করের অসুখে দাদাকে কি কুটোটি নাড়তে হয়েছে? এক গিয়ে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া?

মুখে অবশ্য কিছু ফুটল না সোহিনীর। দু'-তিন টুকরো মাংস খেয়ে বাটি এগিয়ে দিল দাদাকে। কৌশিক হাত বাড়াল না, ভাবছে কী যেন। হঠাৎ বলল, তোর খরচখরচা কেমন হচ্ছে রে খুকু?

হাসপাতালে ভরতির উনচল্লিশ দিন পরে এই প্রশ্ন? যাক, তবু মনে জেগেছে তো শেষ পর্যন্ত!

ফিকে হেসে সোহিনী বলল, বড় হাসপাতালে যেমন হয়। জলের মতো।

প্যাকেজ নিয়েছিস না?

তার বাইরেও বিস্তর খরচ। এই তো, ডিপ্রেশানের ট্রিটমেন্টেই আঠেরো-বিশ হাজার বেরিয়ে গেল।

তুই ক্যাশলেসে যাসনি কেন?

এই একটা খচখচানি আছে বটে সোহিনীর। দুম করে তরুণদা এমন একটা সিদ্ধান্ত নিল....! হয়তো পাঁচ-দশ হাজার কম হয়েছে, কিন্তু সবটাই তো সোহিনীর গাঁট থেকে যাচ্ছে আপাতত। সোহিনীর সেভিংস তো প্রায় শূন্য হয়ে এল। ভাস্করকে নিশ্চয়ই এখন চেক সই করতে বলা যায় না! এবার হয়তো একটা-দুটো ফিক্সড ডিপোজিটে হাত দিতে হবে।

সোহিনী আলগাভাবে বলল, ঠিক আছে রে। হয়ে তো যাচ্ছে।

লাগলে আমায় বলিস কিন্তু।

সোহিনী ফের হাসল অল্প। চলে গেছে অন্য গল্পে। তানিয়াকে নিয়ে, পাপানকে নিয়ে, বনানীকে নিয়েও। তার মাঝেই পিসিকে টেনে নিয়ে গেল তানিয়া, দেখাল তার বার্বিডলের নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। অবশেষে মাকে আর একবার দেখে যখন বসার ঘরে এল, পূর্ণেন্দু তখন ঢুলুঢুলু চোখে টিভিতে খবর দেখছে।

মেয়ে পাশে বসতেই পূর্ণেন্দু টানটান। বড়ঘড়িটা দেখে বলল, কী রে, তুই এবেলাও হাসপাতাল যাবি না?

যাব। দাদার সঙ্গে বেরোব।

খোকন যাচ্ছে বুঝি?

হুঁ। ড্রাইভারকে তো কল দিল।

তা হলে অত তাড়া নেই। একটু গড়িয়ে নিলে পারতিস।

দুপুরে শোওয়ার অভ্যেস যে আমার নেই বাবা।

তোর কিন্তু একটু রেস্ট দরকার খুকু। বড্ড স্ট্রেন যাচ্ছে। ...এবার টানা ক'দিন ছুটি নে। তুই বিছানায় পড়লে আর দেখতে হবে না।

দেখি। ম্যানেজারকে বলি। অফিসের প্রসঙ্গে রূপকের সিডির কথা মনে পড়েছে সোহিনীর। উঠে ব্যাগটা এনে রাশি রাশি কাগজ হাতড়ে হাতড়ে একেবারে তলা থেকে বার করল সিডিটা। বাবাকে দিয়ে বলল, এটা শুনো তো। আমাদের ব্রাঞ্চের একটা ছেলে গেয়েছে। আমি তো সময় পাচ্ছি না...

ফ্ল্যাপ খুলে পূর্ণেন্দু দেখল সিডিখানা। বলল, বাহ্, ভাল ভাল গান। তুইই রেখে দে না। শুনলে ভাস্করের মন ভাল থাকবে।

ও রবীন্দ্রসংগীত তেমন পছন্দ করে না।

তবে থাক। টেবিলে সিগারেট-লাইটারের পাশে পূর্ণেন্দু সিডিটা রাখল। একটু চিন্তা করে বলল, হ্যাঁরে, ভাস্করের ডিপ্রেশানটা তো আর নেই, তাই না?

ওটা কি পুরোপুরি যায়, বাবা?

হুম্। আসলে কী জানিস খুকু, ক্যান্সার রোগটাই এরকম। যার হয়, একমাত্র সেই বোঝে অ্যাকসেপ্ট করা কত কঠিন। ...তবু খেয়াল রাখিস বাড়িতে ফিরলে আবার যেন না বাড়ে।

যেন বাবাকে নয়, সোহিনী নিজেকেই বলল, যথাসাধ্য করছি তো। করছি না?

তা তো বটেই। তোরা সবাই মিলে...। ভাস্করের ওই বন্ধুটাও খুব খাটছে। খুব ভাল ছেলে। এই বয়সে ইউনিভার্সিটির প্রফেসার...এতটুকু দেমাক নেই...একটা ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না শুনে সেদিন গাড়ি নিয়ে পিজি হসপিটালের কাছে দৌড়োল...ভাস্করের বন্ধুভাগ্য ভাল বলতে হবে।

শেষ বাক্যটি সোহিনীর কাছে প্রহসনের মতো ঠেকল। আবার এও মনে হল, পরিস্থিতির একটু এদিক ওদিকে ওই অনুপমই হয়তো বাবার চোখে শয়তান লম্পট হয়ে দাঁড়াত। মানুষ তো একই, দৃষ্টিভঙ্গির ফারাকই তাকে বদলে বদলে দেয়।

বিকেলে চা-টা খেয়ে বেরোতে একটু দেরিই হল সোহিনীদের। পৌঁছোল প্রায় পৌনে ছ'টায়। হাসপাতালে দর্শনার্থীর সংখ্যা অনেক কমে গেছে, আজ প্রায় নেইই। দিদি আর তরুণদা শুধু দুর্গ রক্ষা করছে।

সোহিনী-কৌশিককে একসঙ্গে দেখে তরুণ গাল ছড়িয়ে হাসল, বাহ্, বাহ্, বাপের বাড়ি মেরে এলে বুঝি?

মা'র একটা ছোট অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, দেখতে গিয়েছিলাম। অজান্তেই সোহিনীর গলায় যেন আত্মরক্ষার সুর। তাড়াতাড়ি ভাস্বতীকে বলল, তোমরা দু'জনেই নীচে কেন দিদি? ওপরে কেউ যাবে না?

এতক্ষণ তো আমি ছিলাম। এইমাত্র অনুপম গেল।

ও। সোহিনী নিজের কাছে রাখা কার্ডখানা বার করে কৌশিককে ধরিয়ে দিল, তুই তা হলে যা দাদা, তারপর নয় আমি...

না না, তুমি আগে যাও। ভাস্বতী তাড়া লাগাল, বাবুন তোমার জন্য অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করছে।

কেন?

সে কি আমাকে বলবে?

তরুণ মুচকি মুচকি হাসছে। কৌশিকও। সোহিনী তাড়াতাড়ি সরে লিফটের দরজায় গেল। পাঁচতলায় পৌঁছে কেজো পায়ে কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। অনুপম হাত নেড়ে কী যেন বোঝাচ্ছে ভাস্করকে, বিছানায় পা ঝুলিয়ে চোখ কুঁচকে শুনছে ভাস্কর...

আচমকাই দৃষ্টি সোহিনীতে। সঙ্গে সঙ্গে যেন জ্বলে উঠেছে চোখের মণি। শীর্ণ মুখমণ্ডল হঠাৎই উজ্জ্বল।

বিহ্বল গলায় ভাস্কর বলল, এত দেরি... কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

সোহিনী নিরুত্তাপ স্বরে বলল, মোবাইলে কল করলেই জানতে পারতে।

আমার মোবাইলে পয়সা নেই যে। কল আসছে, যাচ্ছে না।

কালই বলা উচিত ছিল। সোহিনী শান্তভাবে বেডের পাশের টেবিলটায় গেল। রোজকার রিপোর্ট চার্টখানা উলটোতে উলটোতে বলল, আজ রিচার্জ করে দেব।

আচ্ছা শোনো... আমার তো কালই রেডিয়েশান শেষ?

হ্যাঁ।

তা হলে কাল এরা আমায় ছাড়বে না কেন?

অনুপম বলে উঠল, আহা, তোকে বলছি না... আবার এক্স-রে হবে, আবার ব্রেনস্ক্যান... ডাক্তারকে তো দেখতে হবে কতটা সুস্থ হলি।

সেগুলো তো কালও হতে পারে।

সব কিছু তো তোমার ইচ্ছেয় হবে না। সোহিনী রিপোর্ট চার্টটা বন্ধ করল। অনুপম উঠে দাঁড়িয়েছে, তার জায়গায় টুলে বসে বলল, নিয়মকানুন বলেও তো একটা কথা আছে।

কবে তা হলে ছাড়বে?

বুধবার, কিংবা বৃহস্পতিবার...

না না, বৃহস্পতি নয়, বুধবারই। এখানে আমার আর একমুহূর্ত ভাল লাগছে না। বলেই খপ করে সোহিনীর কাঁধ চেপে ধরেছে ভাস্কর, তুমিও কিন্তু বুধবার থেকে ছুটি নেবে। সারাক্ষণ আমার কাছে কাছে থাকবে।

বললেই তো হয় না। ভাস্করের হাতটা নামাতে চাইল সোহিনী, পারল না। বড্ড জোরে চেপেছে। অস্বস্তিভরা গলায় বলল, যদি অফিস ছুটি দেয়, তবেই...

আমি কিচ্ছু শুনতে চাই না। ভাস্করের অন্য হাতখানাও খামচে ধরল সোহিনীর কাঁধ। অস্থিরভাবে মাথা ঝাঁকাচ্ছে, কেন বুঝছ না সোহিনী, তোমাকে ছাড়া বাড়িতে আমি একা থাকতে পারব না।

মা তো আছেন।

না। তুমি থাকবে, তুমি।

সোহিনী অসহায়ের মতো অনুপমের দিকে তাকাল। পলকের জন্য মনে হল, এই মুহূর্তে এখানে অনুপমের থাকাটা কি খুবই জরুরি!

দশ

ঘরে ফেরায় যে এত আরাম, আগে সেভাবে টের পায়নি ভাস্কর। বাড়ির বাইরে তো অনেকবার থেকেছে। বেড়াতে গেছে, অফিসের কাজেও থাকতে হয়েছে বাইরে বাইরে, কখনও বা টানা দু'-তিন মাস, তখন কিন্তু ফিরে এলে ঠিক এমন অনুভূতি জাগেনি। ভাল হয়তো লেগেছে, তবে এ ভাল লাগার প্রকৃতি যেন অন্যরকম। যেন এই বাড়ির প্রতিটি ঘর, প্রত্যেকটি আসবাব, দরজা জানলা বালিশ বিছানা আলো পাখা টিভি, এমনকী রঙিন পরদাগুলো পর্যন্ত মুখিয়ে ছিল, দিন গুনছিল, ভাস্কর কবে আসবে। একান্ত বালিশটির ওম, বিছানার আদর, সোফার নরম আপ্যায়ন, সবই বুঝি ভাস্করের নতুন নতুন ঠেকে। মনটা তর হয়ে যায়।

দশ-দশটা দিন পরেও আমেজটা রয়ে গেছে। সকালে জলখাবার খেয়ে আজ একটা ডিভিডি চালিয়ে বসে ছিল ভাস্কর। হিন্দি সিনেমা। পুরনো দিনের মজার ছবি। পাপানের গরমের ছুটি পড়েছে, সেও সেঁটে গেছে পাশে। বাপ ছেলেতে কিশোরকুমারের উদ্ভট কাণ্ডকারখানা দেখে হেসে কুটিপাটি।

সিনেমা প্রায় শেষ, ডিভিডি'র বাক্সখানা ঘাঁটছিল ভাস্কর। দেখছিল, পরে কোনটা চালানো যায়। হঠাৎই ঘাড় তুলে জোরে জোরে নাক টানল। সঙ্গে সঙ্গে কোটরে ঢোকা চোখজোড়া চকচক। আপন মনে বলে উঠল, বেড়ে গন্ধ ছেড়েছে তো!

ওমনি পাপানের মন্তব্য, ঠাম্মা মাছ ভাজছে।

ইলিশ! ইলিশ!

বলতে বলতে ভাস্কর সোফা ছেড়ে উঠেছে। অল্প দুলে গেল মাথা, স্থির দাঁড়িয়ে সামলালো নিজেকে। উফ, কবে যে এই দুর্বলতাটুকু কাটবে! আর খুকখুকে কাশিটা!

পায়ে পায়ে ভাস্কর রান্নাঘরের দরজায় এল। বনানী কড়ায় খুন্তি নাড়ছিল, ছেলেকে দেখে হাসল মৃদু। বলল, সোহিনী আজ মাছটা ভাল এনেছে রে।

কপাট ধরে ভাস্কর বলল, সে তো ঘ্রাণেই মালুম পাচ্ছি।

ও এখন আর তত আনাড়ি নেই। মাছ মাংস আলু পটল, সবই বেশ দেখে দেখে আনে।

আমার জন্যই তো অভ্যেসটা হল। বলে যেন একটু সুখ পেল ভাস্কর। ভুরু নাচিয়ে বলল, আজ তুমি হাত লাগিয়েছ যে বড়?

সুষমাকে দিয়ে সব হয় নাকি? রোজকার ডাল-ঝোলটাই ওর আসে।

তা কী বানালে?

যা তুই পছন্দ করিস। ঝিঙে-লঙ্কা-কালোজিরে দিয়ে পাতলা ঝোল। আর কাঁটাচচ্চড়ি। দু'পিস শুধু ভেজে রাখলাম, তোর আর সোহিনীর জন্য। কড়ার মাছ ছোট প্লেটে নামিয়ে গ্যাস নেভাল বনানী, আমার কাজ শেষ। এবার তোমরা টুকটুক করে স্নানে যাও।

দাঁড়াও, সোহিনী ফিরুক।

ডাক্তার কী বলেছে মনে নেই? ঘড়ি মেপে চলতে হবে। ঠিক সময়ে খাওয়া, ঠিক টাইমে ঘুম...। পৌনে বারোটা বাজে, কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে বারোটায় তোমায় ভাত দেব।

মা'র ছোট্ট শাসনটুকু মন্দ লাগল না ভাস্করের। আজকাল সকলেরই তার ওপর কড়া নজর। একটু অনিয়ম হল, কি হল না, ওমনি বকুনি। ভালর জন্যই বলে নিশ্চয়ই, ভাস্করের ভালই তো চাইছে সবাই। এই যে ভাস্কর খানিকটা খাড়া হয়েছে, সে তো এদেরই চেষ্টায়। ইচ্ছেশক্তির জোরে। নয় কী?

আনমনে সোফাতেই ফিরল ভাস্কর। সিনেমা শেষ হতেই কার্টুন চালিয়ে দিয়েছে পাপান। গোল্লা গোল্লা চোখে দেখছে রোডরানার শো। ভাস্করের একটু খুনসুটি করতে সাধ জাগল। টুকুস কেড়ে নিয়েছে রিমোট, পুটুস বন্ধ করল টিভি। পাপান রিমোটের জন্য ঝাঁপাতেই হাত পিছনে, চোখের ইশারায় বাথরুম দেখাচ্ছে ছেলেকে। কী আশ্চর্য, পাপান হাউমাউ জুড়ল না। একটুক্ষণ গা মোচড়াল, তারপর সুড়সুড় স্নানে গেছে।

খেলাটা জমল না, তবুও ভাস্কর খুশি। হাবভাব অনেক বদলে গেছে ছেলের। মাত্র দু'মাস বাবাকে অসুস্থ দেখে এখন সে কত বাধ্য! কী বুঝদার! সর্বদা খেয়াল রাখে, উত্তেজনা এখন বাবার জন্য ঠিক নয়। কাল তো রীতিমতো চোখ পাকিয়ে বলছিল, আর বেশিক্ষণ লুডো নয় বাবা, তোমার স্ট্রেন পড়বে! আত্মজের এই উদ্বেগটুকুও তো এখন ভাস্করের বেঁচে থাকার রসদ।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়েছে বনানী। খাওয়ার জায়গা থেকেই গলা ওঠাল, কী রে, এখনও বসে? গেলি না স্নানে?

ভাস্কর ফিক করে হাসল, তুমি দেখছি ফেউয়ের মতো লেগে আছ!

ছেলেমানুষি করিস না বাবুন। তোর কিন্তু লেট হয়ে যাবে।

তোমার নাতি ঢুকল যে।

অ্যাই, তোদের ঘরের বাথরুম তো ফাঁকা। বনানী কাছে এসে ঠেলল ভাস্করকে। স্নেহমাখা সুরে বলল, এমন করলে তো তোরই ক্ষতি।

ওই ঠেলাটুকুতে একটা নরম আবেগও মিশে আছে যেন। ভাস্কর উঠল। ধীর পায়ে ঢুকেছে শয়নকক্ষের লাগোয়া টয়লেটে। স্নানের জায়গাটা বড্ড ছোট, হাত ছড়ালে দেওয়ালে ঠেকে যায়। খানিক জড়সড় হয়েই যেন দাঁড়াতে হয় শাওয়ারের নীচে। তবু জল গায়ে পড়তেই বিচিত্র এক সুখানুভূতি। হাসপাতালে টানা দেড় মাস স্নান হয়নি, বুক মাথা বাঁচিয়ে শুধু হাত-পা মুছিয়ে দিত। এখন প্রতিটি জলকণা যেন রোমকূপে শিহরন জাগায়। স্নানে যে এত রোমাঞ্চ, এও তো ভাস্কর এবার বাড়ি এসে জানল।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে ভাস্কর দেখল সোহিনী ফিরেছে, ব্যাগ থেকে কীসব বার করে রাখছে আলমারিতে। জিন্‌সের ওপর সাদা টপ পরেছে সোহিনী, পোশাকটায় সোহিনীকে কেমন বাচ্চা বাচ্চা দেখায়। চড়া রোদ থেকে ফিরল, মুখটা লালচে হয়ে আছে। ঝুঁটিবাঁধা চুল ঈষৎ এলোমেলো।

চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে মুগ্ধ নয়নে বউকে দেখছিল ভাস্কর। না তাকিয়েও ঠিক টের পেয়েছে সোহিনী। আলমারি লাগিয়ে ঝট করে তাকিয়েছে, কিছু বলবে?

না তো। ভাস্কর দ্রুত ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ...হ্যাঁ তো।

কী?

এত দেরি করলে?

কম কাজ সারলাম? টেলিফোন বিল, ইলেকট্রিক বিল... ব্যাঙ্কেও একটু দরকার ছিল...। তোমার বমির ওষুধটাও তো ফুরিয়ে গিয়েছিল...

একদিনে এত কাজ করার দরকার কী সোহিনী? তুমি তো এখন ছুটিতে। রোজই নয় একটা একটা করে...

তাতে তো তোমারই অসুবিধে।

কেন?

বা রে, তা হলে তো আমায় রোজই বাইরে বেরোতে হয়। তখন তো তুমিই কাঁদুনি গাইবে, প্রতিদিন বেরিয়ে যাচ্ছ...! তারচেয়ে একদিনেই সব সেরে এলাম, সেটা ভাল নয়?

সোহিনীর স্বর বড্ড শীতল। উঁহুঁ, সোহিনীর তো এমনই বাচনভঙ্গি। ভাব আছে, অথচ তার প্রকাশ নেই। অন্তত ভাস্করের তো সেরকমটাই মনে হয় আজকাল। নইলে ছুটি নিয়ে কি সোহিনী ঘরে বসে থাকত!

ভাস্কর হেসে বলল, আমার কাজগুলো সব একে একে তোমার ঘাড়ে চাপছে।

কী করা যাবে? তুমি তো এখন ফিট নও।

ভাস্করের বলতে ইচ্ছে হল, যতটা আনফিট ভাবছ ততটা তো আমি আর নই সোহিনী। হাঁটাচলা তো করছি। একা হয়তো নয়, তবু বাড়ির বাইরে তো যাচ্ছি। তোমরাই তো বলো, রোগটা আমার কমার পথে। এক্স-রে আর স্ক্যান রিপোর্ট অনুযায়ী, লাম্পগুলো কিছু না হোক পাঁচ ভাগের এক ভাগ তো কমেছে। নির্ভুল চিকিৎসা হলে হয়তো পুরোপুরি...। তখন তোমার কাঁধের জোয়াল আমি সরিয়ে নেব, দেখে নিয়ো।

হাসিমুখেই ভাস্কর বলল, আমার অসুখে তোমার এক্সপিরিয়েন্স কত বেড়ে গেল, সেটাও একবার ভাবো।

তা বাড়ল।

মা আজ তোমার আনা ইলিশমাছের খুব তারিফ করছিল।

ওটা মাছওয়ালার দয়া। আমায় ঠকায়নি।

কার কাছ থেকে কিনেছ বলো তো? মাছের বাজারে ঢুকে ডানদিকে যে মোটা মতন লোকটা বসে...?

সেখান থেকেই তো নিতে বলেছ। বিশ্বনাথ, না কী যেন নাম...। চুলের গার্ডার খুলে ড্রেসিংটেবিলে রাখল সোহিনী। তেরচা চোখে টাইমপিসটা দেখে নিয়ে বলল, যথেষ্ট বকবক করেছ। এবার গিয়ে খেতে বসো। আর হ্যাঁ, ইলিশমাছে তোমার অম্বল হতে পারে। খেয়ে উঠে অবশ্যই অ্যান্টাসিড খাবে।

এই সতর্কতা কি নেহাতই কেজো হতে পারে? ভাস্কর ভালবাসে বলেই না ইলিশমাছ এনেছে সোহিনী! আবার খেয়ে যাতে ভাস্করের শরীর খারাপ না হয়, সেদিকটাও মাথায় রেখেছে! দুটো ভাবনাই কি সোহিনীর অন্তরের ছবিটা ফুটিয়ে তোলে না?

মনে মনে মুচকি হেসে ভাস্কর খাওয়ার টেবিলে গেল। সেখানে তখন পাপানের সঙ্গে একটা ছোটখাটো যুদ্ধ বেধেছে বনানীর। নাতি ইলিশমাছ ছোঁবে না, ঠাকুমা তাকে চাখাবেই।

ভাস্কর চেয়ার টেনে বসে বলল, নে না ব্যাটা, একদিন টেস্ট কর।

এঁহ্, আমার গন্ধ লাগে। আমি শুধু চিকেনই খাব।

কী যে চিকেন শিখেছিস! খাসির মাংসও তো ছুঁস না!

আই হেট মাটন।

আরে ব্যাটা, দুনিয়ায় মানুষ অনেক কিছুই হেট করে। আবার ঠিকঠাক টেস্ট করলে হয়তো সেটাই ফেভারিট হয়ে যায়।

ভাস্করের এ হেন মহৎ বাণীও মাঠে মারা গেল। পাপানের কোনও হেলদোল নেই, সে ঠোঁট টিপে আছে। অগত্যা ক্ষান্ত হল বনানী। ভাস্করের ভাত বাড়ছে। গলা নামিয়ে বলল, তোকে কি চচ্চড়িটা দেব?

ভাস্কর হাত উলটে বলল, জিজ্ঞেস করার কী আছে?

না...তোর তো শাকসবজি খাওয়া বারণ... ডাক্তার তো তোকে শুধু প্রোটিন দিতে বলেছে...

ছাড়ো তো। একদিন খেলে কী এমন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে!

খুব অল্প দিই তা হলে।

উৎসাহ নিয়েই চচ্চড়ি মুখে দিল ভাস্কর, তবে কেমন যেন গন্ধ লাগল। মাছও কেমন আঁশটে আঁশটে! বর্ষা এখনও আসেনি বলে মাছটাই কি স্বাদহীন? নাকি ভাস্করের জিভেই রুচি ফেরেনি? ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মাছ আনছে সোহিনী। কাল বড়ি-টোম্যাটো দিয়ে পাবদার ঝোলও পানসে পানসে ঠেকল। ভেটকির যা স্বাদ, তেলাপিয়ারও তাই। এমনটা চলতে থাকলে আহারের ইচ্ছেটাই হয়তো উবে যাবে।

নাহ্, ভেঙে পড়লে চলবে না। ভাস্করকে তো এই দশাটা কাটিয়ে উঠতেই হবে। কোনওক্রমে ভাতটুকু শেষ করল ভাস্কর, তাড়াতাড়ি ঘরে এসে অ্যান্টাসিড গলায় ঢালল। বমির ট্যাবলেটও গিলল একটা। বসেছে বিছানায়, বালিশে ঠেসান দিয়ে। গলাটা ফের খুশখুশ করছে। একটু কাফ সিরাপ খেয়ে নেবে নাকি?

সোহিনীর স্নান সারা। ভেজা চুল ঝাড়ছে। ভাস্করকে দেখতে দেখতে বলল, কী হল? আবার গা গুলোচ্ছে?

একটু একটু।

এইজন্যই ইলিশ কেনার আগে দশবার ভাবছিলাম। কোনও গুরুপাকই তোমার সহ্য হচ্ছে না।... কাল থেকে ফের পোনাই আনব।

চিন্তা কোরো না। সবে তো দশ দিন হল... আস্তে আস্তে তো প্রবলেমটা কমবে!

গুড থট্। এটাই বজায় রাখো। সোহিনী বিছানার ধারে এল। স্মিত মুখে বলল, এখনই শুয়ো না যেন।

ভাস্কর মিনতির সুরে বলল, একটু বোসো না কাছে!

বা রে, আমার বুঝি খিদে পায়নি?

এক মিনিট। একটু।

সোহিনীর হাতে চিরুনি। সামান্য ইতস্তত করে বসল বিছানায়।

ভাস্কর চোখ বুজেছে। ঈষৎ কাতর গলায় বলল, বুকটা বড্ড জ্বালা জ্বালা করছে। একটু হাত বুলিয়ে দেবে?

হাত বুলোলে কি জ্বালা কমে? হাত কি ওষুধ?

দাও না গো।

শুধু বুকে নয়, মাথাতেও আঙুল চালাচ্ছিল সোহিনী। আজকাল এই ধরনের আবদারে সোহিনী না করে না। কতকাল সোহিনীকে পায়নি ভাস্কর, দূরে দূরেই তো সরে থাকে। তবু এই স্পর্শে কোনও কামভাব জাগে না ভাস্করের, বরং অচেনা এক মনকেমন করা ভাল লাগায় ভরে যায় হৃদয়। এই সান্নিধ্যটুকুর জন্যই তো অনন্তকাল বেঁচে থাকার লোভ হয়।

তিন-চার মিনিট পর সোহিনীর কোমল স্বর শুনতে পেল ভাস্কর, এবার আমি যাই?

মুহূর্তের জন্য সোহিনীর হাতটা চেপে ধরল ভাস্কর, মুহূর্ত পরে ছেড়েও দিয়েছে। ফিসফিস স্বরে বলল, তুমি যা বলবে, আমি তাই মানব সোহিনী। শুধু তুমি পাশে থাকো। তা হলেই আমি ভাল হয়ে যাব।

সোহিনী উঠে যাওয়ার পর কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল ভাস্কর, সোহিনীর ডাকেই জাগল। চোখ খুলে দেখল, মাথার নীচে দুটো বালিশ নিয়ে সে দিব্যি পরিপাটি শুয়ে। কে তাকে এমন সযত্নে শোওয়াল? সোহিনী?

ভাস্কর চোখ রগড়ে উঠে বসল। বোধে আসতে তার একটু সময় লাগে এখন। বিড়বিড় করে বলল, ক'টা বাজে?

প্রায় পাঁচটা। আজ অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছ।

চা হয়ে গেছে?

বসিয়েছি। ...তোমার অফিসের একজন লোক এসেছে।

কে?

নাম জিজ্ঞেস করিনি। ...বুড়ো মতন। বলল, দরকারি কাজ আছে।

সামান্য ধন্দ নিয়ে ড্রয়িংহলে এসে ভাস্কর অবাক। বদ্‌রিপ্রসাদ! আড়ষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নামিয়ে সোফায় বসে।

ভাস্করকে দেখামাত্র বদ্‌রি উঠে দাঁড়িয়েছে। দু'হাত তুলে ভাস্কর বলল, আরে, বোসো বোসো। হঠাৎ তুমি?

আপনার মাইনের চেকটা নিয়ে এলাম স্যার।

ভাস্করের মনে পড়ল, অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফোন করেছিল। বলেছিল চেকটা বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে। প্রসন্ন মুখে ভাস্কর বলল, থ্যাঙ্ক ইউ। থ্যাঙ্ক ইউ বদ্‌রি। দাঁড়াও, তোমায় অথোরাইজেশন লেটারটা লিখে দিই।

ও ভি বানানো আছে। কালো ফোলিওব্যাগ খুলে বাদামি খাম বার করল বদ্‌রি। সসম্ভ্রমে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, চৌধুরীসাহেব সব রেডি করে দিয়েছেন।

সঞ্জয় চৌধুরীর কাজ সত্যিই নিখুঁত। শুধু অধিকার প্রদানপত্রই বানায়নি, যথাস্থানে দস্তখতও করিয়ে নিয়েছে বদ্‌রিপ্রসাদের। পাঠিয়েছে চেকপ্রাপ্তির রসিদও। শুধু তিন জায়গায় ভাস্করের সইটুকুই যা বাকি। গত মাসেও বলতে হয়নি, হাসপাতালেই তুহিন বেরা দিয়ে গিয়েছিল চেক।

নাহ্, সহকর্মীরা ভাস্করকে সত্যিই ভালবাসে। নইলে সোহিনী কিংবা তরুণদাকে তো ছুটতে হত অফিসে।

সইগুলো সারতে সারতে ভাস্কর বলল, কেমন আছ বদ্‌রি?

আপনি কেমন আছেন স্যার?

দেখে কী বুঝছ?

বহুৎ দুবলা হয়ে গেছেন। বলেই তাড়াতাড়ি শুধরে নিয়েছে বদ্‌রি, বিমারিতে তো এমন হয়ই।

উম্। কোত্থেকে একটা বাজে রোগ ধরল! কাগজ দু'খানা বদ্‌রিকে ফেরত দিল ভাস্কর, চা খাবে তো?

জিজ্ঞাসার প্রয়োজন ছিল না, সোহিনী এনেছে। বদ্‌রির জন্য প্লেটে সন্দেশও। ভাস্কর উল্লসিত স্বরে বলল, সোহিনী, একে চিনে রাখো। অফিসে বদ্‌রিই আমার গার্জেন। টিফিন খেতে দেরি হলে এমন বকে...

বদ্‌রি জিভ কাটল, কী যে বলেন! ...স্যার আমায় খুব ভালবাসেন। যখন

যা চাই, স্যারের কাছে মিলে যায়। বলতে বলতে হঠাৎ বুঝি খেয়াল হয়েছে, পকেট থেকে দুটো একশো টাকার নোট বার করে বলল, রেখে দিন স্যার। আপনার কাছে উধার ছিল।

আরে, ও আর লাগবে না। তুমি রাখো।

না স্যার। আপনার এখন খরচার সময়...

ভাস্কর হেসে ফেলল। সোহিনী-তরুণদা তাকে জানাতে চায় না, তবে বন্যার মতো টাকা বেরোচ্ছে এতে তো কোনও সন্দেহ নেই। সেখানে এই সামান্য... এ তো বালির বাঁধও নয়। তবু বদ্‌রিকে আর জোর করতে পারল না। বাধল। স্যারের বিপদের সময়ে ফেরত দিচ্ছে... এও কি কম প্রাপ্তি?

সোহিনী বসেছে সোফায়। বলল, নিন, একটু মিষ্টি খান।

বদ্‌রি তবু সংকুচিত, এসবের কী দরকার ছিল ম্যাডাম?

আরে, নাও, নাও। ভাস্কর প্লেটখানা বাড়িয়ে দিল, প্রথম আমার বাড়িতে এলে...

মনটা বহুৎ খারাপ ছিল স্যার। হাসপাতালে একদিনও যেতে পারিনি... আমার হাসপাতালকে বহুৎ ডর লাগে।

ঠিক আছে রে বাবা। এসেছ তো।

বদ্‌রি আর কিছু বলল না। চা-সন্দেশ শেষ করল চুপচাপ। তারপর হঠাৎই হাত মুছে ফোলিওব্যাগ থেকে একটা শালপাতার ঠোঙা বার করেছে। ভাস্করকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, পরসাদ আছে স্যার। কালীমা-কা। ঠনঠনিয়ার কালীমাতা স্যার বহুৎ জাগ্রৎ। আপনার জন্য আমি কালীমার কাছে মন্নত মেনেছি, জরুর বিমারি সেরে যাবে।

প্রসাদটা কপালে ছুঁইয়ে টেবিলে রাখল ভাস্কর। বদ্‌রিও উঠে পড়েছে। সোহিনীকে নমস্কার করে বলল, আজ তা হলে আসি ম্যাডাম?

আবার আসবেন।

জি।...স্যার যে কবে জয়েন করবেন, অফিসে দিল্ লাগে না।

আপন মনে বলতে বলতে চলে যাচ্ছে বদ্‌রি। ঈষৎ কুঁজো হয়ে হাঁটছে যেন। পিছু পিছু গিয়ে সোহিনী দরজা বন্ধ করল। ফিরে মিটিমিটি হাসছে, তোমার ভক্ত হনুমানটি তো বেশ।

ভাস্কর হেসে বলল, অফিসে ওরকম আরো দু'-চার পিস আছে। মানুষটা তো আমি খারাপ নই। তুমি তো আমাকে এক্সপ্লোরই করলে না!

খুঁড়লে সোনা-হিরে মিলত বুঝি?

কে জানে, হয়তো তার চেয়েও দামি কিছু।

সোহিনীর ঠোঁটে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটেও মিলিয়ে গেল। পরক্ষণে রসিকতা জুড়েছে, তুমি কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়েছ।

কীরকম?

যেভাবে প্রসাদ কপালে ঠেকালে... আমি তো জানতাম ঠাকুরদেবতায় তোমার বিশ্বাস নেই!

ভাস্করের হাসি নিভল। হয়তো সোহিনী ভুল বলেনি, কিন্তু এখন কেন যেন তার মনে হয়, একটু-আধটু বিশ্বাস থাকা ভাল। অবিশ্বাস-সন্দেহে কিছুই কি মেলে? বরং চোখকান বুজে ভরসা রাখতে পারলে খানিকটা বুঝি জোর পাওয়া যায়। এ কি তার মানসিক দৌর্বল্য? হতেও পারে। ভাস্কর তো এমন কিছু অতিমানব নয়, মৃত্যুর সঙ্গে দাবা খেলতে তার বুক কাঁপে বই কী। কত অজস্র ঘরের খেলা, চাল দেওয়া কি সোজা? ঈশ্বর গোছের কারওকে যদি সহযোগী হিসেবে মেলে, ক্ষতি কোথায়! তা ছাড়া এই প্রসাদ তো একজনের শুভকামনা। তাকে কেন মর্যাদা দেবে না ভাস্কর?

ঘরে মোবাইল বাজছে। সোহিনী পা চালিয়ে ধরতে গেল। দু'-এক সেকেন্ড তুম্বো মুখে বসে থেকে ভাস্কর গিয়ে দাঁড়াল ব্যালকনিতে। জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি, পড়ন্ত বেলায় এখনও সূর্যের কী ঝাঁঝ! বেশিক্ষণ তাকানো যায় না, চোখ ধাঁধিয়ে ওঠে। বাতাসও যথেষ্ট গরম। সূর্য ডুবলে নিশ্চয়ই খানিকটা ঠান্ডা হবে। তখন কি একবার বেরোবে সোহিনীর সঙ্গে? পরশুর মতো? কিছুই নয়, ধীরে ধীরে ছোট পার্কটা অবধি হেঁটে কিছুক্ষণ বসে থাকা। পাশে সোহিনী, চারপাশে এক চলমান পৃথিবী... কী যে ভাল লাগছিল! মনে হচ্ছিল, এভাবেই যদি বসে থাকা যেত সারাটা জীবন! বুড়ো হয়ে গেছে ভাস্কর, সোহিনী বুড়ি, তখনও দু'টিতে মিলে পাশাপাশি...!

অন্দর থেকে বনানীর ডাক, রোদ লেগে যাবে বাবুন, চলে আয়।

কল্পদৃশ্যটা আঁখিপাতায় নিয়ে ভাস্কর সোফায় ফিরল। দুধে প্রোটিনগুঁড়ো গুলে রেখে গেছে মা, সঙ্গে একটি ডিমসেদ্ধ। পানীয়টি মোটেই সুস্বাদু নয়, ভাস্কর গিলে নিল এক চুমুকে। মুখ ঈষৎ বিকৃত করে ডিমসেদ্ধয় কামড় দিয়েছে, অমনি স্মৃতির পলকা টোকা। কবে যেন ডিমসেদ্ধ খেতে ডাকছিল মা, ভাস্কর ভীষণ রাগ দেখাল? হাসপাতালে তো সেদ্ধ ডিম

ছুঁত না। এখন কেমন সোনামুখ করে খাচ্ছে! হা হা, ভাস্কর কি পালটে গেল?

নিজেকেই নিজে কটাক্ষ হেনে ড্রয়ার টেনে ডিভিডি'র বাক্সখানা বার করল ভাস্কর। চল্লিশ-পঞ্চাশটা সিনেমা, বেশির ভাগই হিট হিন্দি ফিল্ম। ওপরের গোটা সাত-আট শুধুই হাসির। অনুপমের উপহার। প্রায়ই বিকেল-সন্ধেয় আসছে অনুপম, হাতে একটা না-একটা ডিভিডি। কেন যে আনে রোজ? ভাস্কর তো অত দেখে উঠতে পারছে না। যতই হাসিমজার ছবি হোক, টানা দু'-তিন ঘণ্টা ঠায় পরদার দিকে তাকিয়ে থাকা... ওফ্, মাথা টনটন করে। তবু অনুপম বারণ শুনলে তো। তার থিয়োরি, পুরোটা কেন দেখবি, খালি ফানি সিক্সেয়েন্সগুলো চালা! প্রাণ খুলে হাসলে বডিতে নাকি অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ে, স্বাভাবিক প্রতিরোধক্ষমতা গড়ে ওঠে!

কে জানে, হতেও পারে। অনুপম নিশ্চয়ই না জেনে, না বুঝে বলছে না! ভাস্করকে চাঙ্গা করতে কতভাবেই না চেষ্টা চালাচ্ছে সবাই, তার তো উচিত যথাযোগ্য প্রতিদান দেওয়া! নাহ্, ভাস্করকে লড়তেই হবে।

ডিভিডি প্লেয়ারে একটা ইংরেজি ছবি ঢোকাল ভাস্কর। শুরু থেকেই বেদম হইহুল্লোড়। প্রতিটি দৃশ্যেই পেট গুলিয়ে হাসি আসে। ভাস্কর বেশ জমে যাচ্ছিল, সোহিনী এসেছে পাশে। পরদায় দৃষ্টি রেখেই ভাস্কর আলগোছে জিজ্ঞেস করল, তখন কার ফোন এল?

তরুণদা।

কী বলে?

মেডিকেল ইনশিয়োরেন্সের ক্লেম ফর্ম নিয়ে আসার কথা ছিল, আজ পারবে না। কোন এক উকিল নিয়ে নাকি সল্টলেকে ছোটমামার বাড়ি যাচ্ছে। কী সব উইল-টুইলের ব্যাপার।

ও। তা ক্লেম জমা দিতে দেরি হলে তোমার টাকাপয়সাও তো আটকে থাকবে।

এক দিনে আর কী তফাত? কাল হবে।

তবু...। তুমি আমার অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে নাও না, চেক লিখে দিচ্ছি।

সে দেখা যাবেখন। সোহিনী যেন খানিক আনমনা, কাল একবার ডাক্তারের চেম্বারে যেতে হবে।

কেন?

তোমার ব্লাডের কী কী টেস্ট হবে, জেনে আসব। পরশুই করাতে দেব। সোহিনী ঘাড় ফিরিয়ে ভাস্করকে দেখল, হাতে তো বেশি সময় নেই, কামিং বৃহস্পতিবারে তো তোমার কেমো।

ভাস্কর একটু যেন নড়ে গেল। আপন মনে বলল, একটা কেমোতে কি কিছু উন্নতি হবে?

খানিকটা তো বটেই। তবে মোট ছ'টা হলে তখনই...

কেমোথেরাপি তো খুব পেনফুল। ...আমি নিতে পারব, সোহিনী?

মনে জোর আনো। কঠিন অসুখের জন্য কড়া ওষুধ তো লাগবেই।

আর কোনও কথা নেই। নিজের মনে চলছে হাসির ছবি, বিচিত্র এক ঠাট্টার মতো। ভাস্করের দৃষ্টি মেঝেয়। বারান্দা দিয়ে একফালি রোদ্দুর এসে পড়েছে ঘরে। মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে।

হলুদ রশ্মিটা বুঝি চোখে লাগছিল সোহিনীর। ভুরু কুঁচকে বলল, পরদাটা টেনে দিই?

থাক না। ভাস্কর যেন নিজেকেই শোনাল, আলোটুকু আসতে দাও।

এগারো

বিন্দু বিন্দু তরল প্রবেশ করছে কবজি দিয়ে। শিরাপথ বেয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে গোটা দেহে। মাথার পিছনে মনিটরের বিপ বিপ। লম্বা সরু রেখা ঢেউ খেলছে পরদায়। উঠছে, নামছে, উঠছে নামছে।

দৃশ্যটা একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল অনুপম। টমাস মুলবেরিকে মনে পড়ছে। টমাসের মতোই ভাস্কর চোখ বুজে শুয়ে। মাঝে মাঝে বিকৃত হচ্ছে মুখ, একটু যেন কেঁপে কেঁপেও উঠছে ভাস্কর। ভয় থেকে? নাকি যন্ত্রণায়? টমাস তো বলত, কেমোথেরাপি চলার সময়ে তেমন ব্যথাবেদনা হয় না। তবে কি অন্য কোনও প্রতিক্রিয়া? ভাস্করের অবচেতনার?

কেবিনে নার্স ছাড়াও সাদা অ্যাপ্রনধারী এক মধ্যবয়সি। ডাক্তার নয়, ডাক্তারকে অনুপম চেনে। ফার্মাসিস্ট? যে ভাস্করের কেমোথেরাপির ডোজটা বানিয়েছে? অনুচ্চ স্বরে অনুপম লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, আর কতক্ষণ চলবে?

লোকটা ঘড়ি দেখল, তিনটে তো বাজবেই।

কখন স্টার্ট হয়েছে?

ন'টা নাগাদ।

মোট ক'টা সাইকল্ যাচ্ছে?

তিরিশটা। এখনও আরও চারটে বাকি।

কোনও প্রবলেম ডেভেলাপ করেনি তো?

নাহ্। উনি তো বেশ স্টেডিলি নিচ্ছেন।

আশা করি ভিজিটিং আওয়ারে দেখা করা যাবে!

এমনিতে কোনও অসুবিধে নেই। তবে বেশি কথা না বলানোই ভাল।

লোকটা উঠে রবার-পাইপ পরীক্ষা করছে। আর তাকে বিরক্ত না করে অনুপম বেরিয়ে এল। চিন্তিত মুখে লিফটে নামছে। লাউঞ্জে এসে সোহিনীদের খুঁজল। বিশাল হলে এখন লোকজন নেই বিশেষ। কাউন্টারের মেয়েগুলো খানিক গল্পগাছা করছে। সোজা গেলে হাসপাতালের বহির্বিভাগ। সেখানেই যা একটু ভিড় দেখা যায়। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত জায়গাটায় উচ্চকিত শব্দ নেই, শুধু অস্পষ্ট এক মিশ্র ধ্বনি কানে বাজে।

তরুণই দেখেছে অনুপমকে। অল্প গলা তুলে ডাকল, এই যে...এদিকে।

কোনায় স্টিলের চেয়ারে সোহিনী, তরুণ আর ভাস্বতী। সোহিনীর মুখ অসম্ভব রকমের শুকনো, বোঝাই যায় সে ভারী উদ্বেগে আছে। ভাস্বতীর মধ্যেও কেমন এক বিহ্বল ভাব। একমাত্র তরুণেরই খুব বেশি বিকার নেই।

অনুপম মুখোমুখি বসতেই ভাস্বতীর প্রশ্ন, কেমন দেখলে?

নরমাল। বলেও অনুপম যেন হোঁচট খেয়েছে। স্বাভাবিক শব্দটা কি আর ভাস্করের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? ঝটিতি সংশোধন করে বলল, চলছে তো।

তোমার দিকে তাকাল? কিছু বলল?

উঁহুঁ।

বাবুন তো চোখ খুলছেই না। কথা তো বন্ধই। তরুণ সহজ সুরেই বলল, বেজায় ঘাবড়েছে বেচারা। ট্যাক্সিতে আসার সময় থেকেই তো স্পিকটি নট।

সকালে আমি গাড়িটা নিয়ে গেলে বোধহয় সুবিধে হত, তাই না? অনুপম কুণ্ঠিতভাবে বলল, আসলে একদম মাথায় আসেনি...

স্বাভাবিক। তোমায় কত কিছুর মধ্যে থাকতে হয়...! তরুণের স্বরে যেন আবছা বিদ্রূপ, ফেরার সময়ে যদি নিয়ে যেতে পারো। দেখো।

ভাস্বতী জিজ্ঞেস করল, কাল বাবুনকে ছাড়বে কখন?

সকালেই তো রিলিজ করার কথা। তবে তখন শুনলে তো, ডাক্তারবাবু বললেন, আই অ্যাম কিপিং মাই ফিঙ্গার্স ক্রস্‌ড। যদি রাতে এভরিথিং গোজ রাইট... মানে কেমোজনিত কোনও সাইড এফেক্ট যদি না দেখা দেয়...

তোমার কী ধারণা? সাইড এফেক্ট হবে?

কী করে বলব! শরীরটা তো আমার নয়, বাবুনের। ও কতটা সহ্য করতে পারে, না পারে...

বমি-টমি হবে নাকি? রেডিয়েশানের পর যেমন...?

অনেক কিছুই হতে পারে। হয়তো অ্যাকিউট কাশি শুরু হল, সঙ্গে জ্বর... কিংবা ডায়রিয়া...। ইনফ্যাক্ট, পেশেন্টের তো এখন খুবই ডেলিকেট কন্ডিশন, যে-কোনও ইনফেকশন ওকে ধরে নিতে পারে। আর একটা জিনিস স্মরণে রেখো, বাবুনের ক্যান্সারটা ইজ ইন ফোর্থ স্টেজ। অনেকটাই ছড়িয়েছে। ব্রেনেও সেকেন্ডারি লাম্প গ্রো করেছে। সুতরাং কেমোটাও পড়ছে সবচেয়ে কড়া ডোজে। তাই বুঝতেই পারছ, এই কেসে কিছুই প্রেডিক্ট করা সম্ভব নয়। এক ঘণ্টা পরে কেমন থাকবে, তাও বলা মুশকিল।

থামো তো। ভাস্বতীর ভুরুতে বিরক্তি, তুমি এমন ক্যাজুয়ালি বলো!

যা ফ্যাক্ট তা তো শুনতেই হবে ভাস্বতী। এবং তা মানতেও হবে।

ভাস্বতীর মুখ কালো হয়ে গেছে। অনুপম লক্ষ করল, সোহিনীও নীরক্ত প্রায়। ভাস্করের এই জামাইবাবুটি যেন কেমন কেমন। দুষ্পাচ্য কথাগুলো মুখের ওপর না বললেই কি নয়?

তরুণকে থামাতে অনুপম তড়িঘড়ি বলে উঠল, ভাস্করের কেমোতে কী ড্রাগ ইউজ করছেন ডাক্তারবাবু?

ট্যাক্সল, আর সিস্‌প্ল্যাটিন। আমারই কোম্পানির ওষুধ। টোটাল কিটে টোয়েন্টি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পেয়েছি। এখানে অবশ্য আজ ওষুধের ডবল খরচা লেগে যাবে।

গায়ে পড়ে টাকাপয়সার কথা বলছে কেন তরুণদা? নিজের কেরামতি জাহির করা নাকি? লোকটা জান লাগিয়ে করছে, তবে বড় দেখানেপনা আছে। কী আর করা, যে মানুষ যেরকম।

ভাবল বটে অনুপম, সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হল, পারতপক্ষে তার সামনে খরচখরচার প্রসঙ্গ তোলে না সোহিনী। কেন? এখনও কি সোহিনী তাকে

আপন ভাবে না? অনুপম কি এখনও নিছক পারিবারিক বন্ধু? বাইরের লোক? নাকি সোহিনী দাঁতে দাঁত কষে গোটা লড়াইটা একাই লড়তে চায়? যেন গোটা দুনিয়ার সঙ্গে অনুপমকেও দেখাবে, ভাস্করকে বাঁচাতে সে একাই প্রাণপাত করছে!

এমন ভাবনায় যত না দুঃখ, তার চেয়ে বেশি বুঝি থাকে অসহায়তা। মনে হয় যেন সোহিনী তাকে বিশ্বাস করে না। হয়তো ধারণা জন্মেছে, ভাস্করের শারীরিক সুস্থতা অনুপমের কাম্য নয়।

ভাবনাটা কি ভুল? অনুপম জানে না। এই মুহূর্তে জানতে চায়ও না। মাথা নামিয়ে বসে আছে চুপচাপ।

ভাস্বতী উসখুস করছে। অনুপমকেই বলল, ওপরে গিয়ে আর একবার দেখে আসবে ভাই, বাবুনের আর কদ্দূর?

অনুপম উঠতে যাচ্ছিল, তরুণ বাধা দিল, তুমি বোসো। আমি দেখছি।

তরুণ লিফ্‌ট অভিমুখে এগোতেই ভাস্বতী অপ্রস্তুত স্বরে বলল, আসলে কী হয়েছে জানো? আমরা আজ থাকতে পারব না। একটু তাড়া আছে।

অনুপম ভদ্রতাবশে জিজ্ঞেস করল, যাবেন কোথাও?

আমি না, যাবে তোমাদের তরুণদা। রাজা তো নর্থ বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে চান্স পেয়েছে... আজই নিউ জলপাইগুড়ি যাওয়া... সাড়ে ন'টায় ট্রেন... তোমাদের তরুণদাও থাকছে সঙ্গে...। রাজার হস্টেল অ্যাডমিশনের বন্দোবস্ত সেরে কাল রাতের গাড়িতে ফিরবে। এখনও প্যাকিং-ট্যাকিং কিছু হয়নি...

ও।

আমার যে কী বিচ্ছিরি লাগছে... বাবুনের এই ক্রিটিকাল টাইমটাতেই...

কিচ্ছু হবে না দিদি, তোমরা যাও। কিছুক্ষণ নয়, যেন বহু যুগ পর সোহিনীর স্বর ফুটল, আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব।

ভাস্বতী বলল, তুই একা কেন, অনুপমও তো আছে। ও পাশে থাকাটাও তো বড় নিশ্চিন্দি।

ভাস্বতীর বলার ভঙ্গিটি যথেষ্ট আন্তরিক। ক'দিন আলাপে মহিলাকে বেশ পছন্দই করে ফেলেছে অনুপম। মাঝে মাঝে তরুণের কথাবার্তায় তাও একটা বাঁকা সুর থাকে, কিন্তু ভাস্করের দিদি অনেক সোজাসরল। অকারণ কৌতূহলে অনুপমকে বিব্রত করার চেষ্টা নেই কখনও।

অনুপম আগ্রহ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, রাজা কী নিয়ে পড়বে?

সিভিল পেয়েছে। ওটাই ওর ইচ্ছে ছিল। খারাপ হবে?

না না, খুবই ভাল। এখন তো চারদিকে আবার প্রচুর কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক চলছে, সিভিলদের বাজার যথেষ্ট হাই।

তোমাদের তরুণদাও তাই বলে। সবাই কম্পিউটার নিয়ে পড়লে ঘরবাড়ি বানাবে কে!

অনুপম হেসে ফেলল, শুধু ঘরবাড়ি বানানোই কি সিভিলদের কাজ? রাস্তাঘাট, ব্রিজ, নতুন টাউনশিপ, কোনও কিছুই তো সিভিল ছাড়া হবে না। তা ছাড়া এটা তো বেসিক সাবজেক্ট, এতে অনেক গবেষণার সুযোগ থাকে।

বলছ? কিন্তু ভাই আমার যে মন খুঁতখুঁত করছে।

কেন?

ছেলেটা দুম করে অত দূরে চলে যাবে...

কাছেপিঠে কোথাও পেল না?

সে তো পাচ্ছিলই। আজেবাজে কলেজে। কোথাও টিচার নেই, কোথাও এখনও বিল্ডিংই ওঠেনি...। তোমাদের যাদবপুরে চান্স পেলে কী ভালই না হত। তুমি রাজাকে চোখে চোখে রাখতে পারতে। কোনও উড়নচণ্ডীপনা ওর চলত না।

ওটা আপনার ধারণা দিদি। অনুপম হেসে বলল, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ঢুকে ছেলেরা এমন লায়েক হয়ে যায়, মাস্টারমশাইদের উলটে ট্যাঁকে গোঁজে।

তবু...পলিটিক্স-ফলিটিক্সে জড়িয়ে পড়লে...

কেউ আটকাতে পারবে না। এখানকার এডুকেশনে এখন এমন একটা পরিবেশ...। এই তো, লাস্ট সেমেস্টারের যখন রেজাল্ট বেরোল... যারা ফেল করেছে তাদের পাশের দাবিতে ইউনিয়ন বসে গেল ধর্নায়। কেউ যদি পড়াশোনায় ফাঁকি মারতে চায়, লিডাররা এখন তাদের আশ্রয়।

রাজা অবশ্য ওরকম নয়। লেখাপড়াটা করে। বলে থেমেছে ভাস্বতী, ছেলেটার জন্য আমার খুব ভয় করছে, জানো।

কেন?

নর্থ বেঙ্গলে শুনি খুব র‍্যাগিং হয়...

কতটা কী হয়, ঠিক বলতে পারব না দিদি। তবে...। অনুপম সামান্য ইতস্তত করে বলল, একেবারে র‍্যাগিং নেই এমন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বোধহয় পাওয়া যাবে না।

তাই? না?

হুম্। ব্যাপারটা খুবই খারাপ, থাকা উচিত নয়। নিষেধ করে আইনও তৈরি হয়েছে। তবু আছে। এ যেন অনেকটা পণপ্রথার মতো। ...আমাদের সময়েও র‍্যাগিং ছিল।

তা বটে। বাবুন তো প্রথম প্রথম বাড়ি এসে বলত, শিবপুরের হস্টেলে ফিরতে ওর পা কাঁপছে।

খুবই টর্চার হত তখন। আমার বরাত ভাল, এক ভদ্রসভ্য সিনিয়ার শেল্টার দিয়েছিল। বিনিময়ে তার শয়ে শয়ে পাতার নোট কপি করতে হয়েছে। ...আর ভাস্করের কপাল মন্দ, ও পড়ে গেল একদল ড্রাগখোরের খপ্পরে। তারা তো একদিন ভাস্করকে ঘুম থেকে তুলে দোতলার ছাদ থেকে লাফ দিতে বাধ্য করেছিল।

ওমা, তাই? কখনও বলেনি তো?

তেমন চোট পায়নি বলে জানতে পারেননি। খুব ভাল অ্যাথলিট ছিল তো...

হুম্। স্কুলে হাইজাম্প, লংজাম্পে বরাবর ফার্স্ট হয়েছে। ফুটবলও খেলত। স্কুল টিমের হয়ে। ভাস্বতী ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল, সেই বাবুনের আজ কী হাল! তখনকার বন্ধুরা যদি এখন বাবুনকে দেখে...

আচমকা কথা খেই হারিয়ে ফেলল। অনুপমও শব্দহীন সহসা। ঠান্ডা লাউঞ্জে যেন পলকা গুমোট। সোহিনী তাকিয়ে আছে সম্মুখপানে, তাকিয়েই আছে। দৃষ্টিতে কোনও ভাষা নেই। নাকি অনুপমই পড়তে পারছিল না সোহিনীকে?

তরুণ ফিরতে স্বস্তি মিলল। গটগট পায়ে এসে তরুণ বলল, ওভার।

সব ঠিকঠাক তো?

নইলে এখনই নামতাম নাকি? তোমরা তো আমার ফোন পেতে।

কী করছে বাবুন?

নয়ন মেলেছে। কথাও বলল আমার সঙ্গে।

আমি একবার যাব?

না গেলেও চলে। রেস্ট নিতে দাও।

বাবুনকে বলেছ, কাল তুমি থাকবে না?

পেশেন্টের সঙ্গে অত গালগল্পের কী দরকার! যদি কোনও রিঅ্যাকশান

হয়!... সোহিনীই জানিয়ে দেবে। বলতে বলতে তরুণের চোখ অনুপমে, তোমরা দু'জন নিশ্চয়ই এখন থাকছ?

হ্যাঁ। ভিজিটিং আওয়ার পর্যন্ত আছি।

গুড। তরুণের দৃষ্টি এবার সোহিনীতে, তুমি তা হলে কাল বাবুনকে নিয়ে অনুপমের গাড়িতেই ফিরছ?

সোহিনী ঠোঁট ফাঁক করার আগে অনুপম বলল, অবশ্যই। আমি তো আসবই।

জানি ব্রাদার। তুমি সোহিনীর পাশে আছ বলেই তো শান্তিতে যেতে পারছি।

কথাটার কোনও গূঢ় অর্থ আছে কি না বুঝতে পারল না অনুপম। হাসল অল্প। তারপর তরুণ-ভাস্বতীকে এগিয়ে দিতে এল বাইরেটায়।

আষাঢ় মাস পড়ে গেল, এখনও সেভাবে বৃষ্টির দেখা নেই। ঘন মেঘ জমে আকাশে, দু'-এক পশলা ঝরিয়ে উবে যায়, তারপর আকাশ ঝকঝকে নীল। আজও আছে মেঘ, তবে হাওয়াও চলছে জোর, ঝাপটা দিচ্ছে এলোমেলো। বোঝাই যায়, পর্জন্যদেব স্থায়ী হবেন না। কবে যে পাকাপাকি বর্ষা নামবে!

তরুণদের ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে অনুপম লাউঞ্জে ফিরল। বসেছে সোহিনীর পাশে। সোহিনী একই রকম স্থির। থুতনিতে হাত রেখে ভাবছে কী যেন, আবার যেন ভাবছেও না।

দুপুরে আসার পর থেকেই অনুপম দেখছে সোহিনী আজ আশ্চর্য রকমের নীরব। ঝড়ের আগে সমুদ্রতল যেমন নিস্তরঙ্গ হয়ে যায়, এ কি তেমনই? নাকি বলার মতো আর কথাই নেই সোহিনীর? হারিয়ে গেছে কথা? নাকি ফুরিয়ে গেছে?

সোহিনীকে সবাক করার চেষ্টা করল অনুপম। গলা নামিয়ে বলল, একবার ওপরে ঘুরে আসবে?

সোহিনীর ঠোঁট ফাঁক হল সামান্য, প্রয়োজন আছে কোনও?

না...জাস্ট একবার দাঁড়িয়ে আসা...। ভাস্কর হয়তো এক্সপেক্ট করছে।

করুক একটু। আমি ভিজিটিং আওয়ারে যাব।

ভুরু কুঁচকে সোহিনীকে দু'-এক পল দেখল অনুপম। গলা আরও নামিয়ে বলল, এসেছ তো সেই কোন সকালে...খাওয়াদাওয়া করেছ?

দুপুরে ক্যাফেটেরিয়ায় টোস্ট-ওমলেট নিয়েছিলাম।

ব্যস?

ইচ্ছে করছিল না। দিদি এমন জোর করল...

ঠিকই করেছেন। সারাদিন উপোস থাকলে ভাস্কর ভাল হয়ে যাবে নাকি?

চকিতে ঘুরেছে সোহিনী। চোখ অনুপমে। কী মর্মভেদী দৃষ্টি! হঠাৎই শীতল স্বরে বলল, আমার খিদে মরে যাচ্ছে অনুপম।

কথাটার ব্যঞ্জনা যেন আঘাত করল অনুপমকে। আধফোটা স্বরে বলল, টেনশনে ওরকমটা হয় সোহিনী।

হয়তো তাই।

চলো, কফি খেয়ে আসি।

উঠেছে সোহিনী। ক্যাফেটেরিয়াটা লনের ওপারে। সোহিনীর পাশাপাশি সবুজটুকু মাড়িয়ে অনুপম এল সেখানে। দু'জনে বসেছে টেবিলে। মুখোমুখি।

অনুপম জিজ্ঞেস করল, শুধু কফি নেবে?

বলো না যা হয় কিছু।

আমার কিন্তু খিদে আছে। গলায় একটু রসিকতা আনল অনুপম। বুঝি বা সমে ফেরাতে চাইল সোহিনীকে। হাসিমুখেই বলল, সেই সকাল দশটায় দুটো ভাত খেয়ে বেরিয়েছি...

তুমি এলে কোত্থেকে? ইউনিভার্সিটি?

ইয়েস ম্যাডাম। তিনখানা ক্লাস ছিল। একটা নিয়েই পালিয়ে এলাম। খুব ডিসটার্বড লাগছিল। জলের গ্লাসে ছোট্ট চুমুক দিল অনুপম, বার্গার বলে দিই তা হলে?

অর্ডার দিয়ে অনুপম বলল, সকালে ক'টায় ভাস্করকে নিয়ে এলে?

কখন যেন বেরোলাম...? সাড়ে সাতটা।

ওর লাস্ট ব্লাড রিপোর্টগুলো তো ভালই ছিল। হিমোগ্লোবিন ইলেভেন পয়েন্ট এইট...

ডব্লুবিসি কাউন্টও চার হাজারের নীচে নামেনি...

আফটার রেডিয়েশান... যথেষ্ট এনকারেজিং। কফি-বার্গার রেখে গেছে বেয়ারা। কাপটা ঠোঁটে ছুঁইয়ে অনুপম বলল, ভাস্করের মেডিকেল ইনশিয়োরেন্সের টাকা পেলে?

সবে তো ক্লেম জমা পড়ল। ধরো আরও দেড়-দু'মাস।

তার মধ্যে আরও তো দুটো কেমো আছে। জোর করেই টাকার প্রসঙ্গে আজ ঢুকল অনুপম, হিউজ এক্সপেন্স। গোটা খরচটাই তোমার একার ঘাড়ে।

নাহ্, এবারের চেকটা ভাস্কর সই করেছে। আপাতত ওতেই চলবে।

সঙ্গে সঙ্গে চুপসে গেছে অনুপম। মাথা নিচু করে কফি খাচ্ছে। নিজেকে খুব বোকা বোকা লাগছে কি?

হঠাৎই সোহিনীর প্রশ্ন, কী বুঝছ অনুপম?

কীসের কী?

এই... ভাস্করের ব্যাপারে?

অনুপম ধাঁধায় পড়ল। ঠিক কী জানতে চায় সোহিনী? সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ভাস্কর জীবনের দিকে উঠবে কিনা? নাকি নেমেই যাবে অতল অন্ধকারে? অথবা দুটোর একটাও নয়? এ শুধুই এক অসুস্থ মানুষের ব্যাধি সম্পর্কে সরল অনুসন্ধিৎসা? কোন জবাবটা সোহিনীর মনোমত হবে?

আচমকা অনুপমের চোখে ছবিটা ঝলসে উঠল। হাসপাতালে সোহিনীর কাঁধ চেপে ধরে আছে ভাস্কর... অসহায়ভাবে তাকাচ্ছে সোহিনী...!

কেন যে ওই দৃশ্য ঘুরেফিরে দেখা দেয়!

ফের সোহিনীর গলা, কী হল? চুপ যে?

অনুপমের স্বর ঘড়ঘড় বেজে উঠল, সবে তো আজ প্রথম কেমো গেল। এখনও আরও পাঁচটা। তারপর তো বোঝাবুঝি।

অর্থাৎ ভাল হয়ে যেতে পারে?

ওর যা স্টেজ... সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তবে ক্যান্সারে কিছুই অসম্ভব নয়। বিশেষত ওর শরীর যেভাবে রেডিয়েশান অ্যাকসেপ্ট করল... ভয়ংকর কোনও সাইড এফেক্ট ছাড়াই...। জাস্ট ক'দিন একটু ডিপ্রেশন, বমি বমি ভাব, মাথা ঘোরা...। লাস্ট পাঁচ-ছ দিন তো সেগুলোও অনেক কম।

হ্যাঁ। সোহিনী যেন আনমনে বলল, সেই হাল-ছাড়া ভাবটা গেছে। এখন বাঁচার ইচ্ছেটা প্রবল।

এবং ওই ইচ্ছেটাই ওকে শক্তি জোগাচ্ছে। ফার্স্ট কেমোটা আজ সুষ্ঠুভাবেই হল, এটাও একটা পজিটিভ সাইন। সুতরাং আশা করতে তো দোষ নেই, ওর লাইফস্প্যান প্রলম্বিত হবে।

সোহিনী নিঝুম। বেশ খানিকক্ষণ পর স্বগতোক্তির মতো বলল, ভাল। বাঁচুক। সেরে উঠুক।

অনুপমও যেন জোরের সঙ্গে বলল, আমরা সবাই তো তাই চাই সোহিনী।

এর পর আর কোনও কথা থাকে না। থাকলেও কি অনুপম তা উচ্চারণ করতে পারে? কিংবা সোহিনী? করা যায়?

লাউঞ্জে ফিরে অনুপম দেখল, সোহিনীর দাদা এসেছে। কৌশিককে নিয়ে ওপরে গেল সোহিনী। অনুপমও দাঁড়াল না আর। কোত্থেকে একটা বিশ্রী অবসাদ ভর করছে শরীরে, হাসপাতালে আর একমুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করছে না। সটান গিয়ে বসল স্টিয়ারিং-এ। সোহিনীকে না জানিয়েই বেরিয়ে পড়েছে।

অন্যমনস্ক হাতে গাড়ি চালাচ্ছিল অনুপম। সিগনাল না দেখে জেব্রা লাইন পেরোল দু'-দুবার, ধমক খেল সার্জেন্টের। একবার তো আগের গাড়িটায় প্রায় ধাক্কা মারছিল, কোনওক্রমে ব্রেক কষে সামলাল। আশ্চর্য, হলটা কী তার?

বাড়ি পৌঁছে সবে দরজা খুলে নামছে, সামনে ফুলদা-ফুলবউদি। মেজাজ আরও খিঁচড়ে গেল অনুপমের। যুগল মূর্তির একত্রে দর্শন তো মোটেই শুভ নয়। বোধহয় কোনও নেমন্তন্নবাড়ি চলেছে। ফুলদার পরনে ধোপদুরস্ত পাজামা, কারুকাজ করা চকচকে পাঞ্জাবি। ফুলবউদির অঙ্গেও বাহারি সিল্ক, হাতে উপহারের রঙিন প্যাকেট।

আড়ে তাদের দেখে নিয়ে অনুপম গ্যারেজের শাটার ওঠাচ্ছিল, রন্টু গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে এসেছে, তোর কাছে একটা ক্যুরিয়ার এসেছিল রে অন্তু। একখানা আমেরিকান ম্যাগাজিন দিতে। আমি সই মেরে রেখে দিয়েছি।

'দিয়ে যেয়ো,' বলতে গিয়েও কোঁৎ করে গিলে নিল অনুপম। ফুলদা বাড়িতে ঢোকা মানে মহা অশান্তি। এটা ঘাঁটবে, ওটা শুঁকবে, ফসফস গায়ে ডিয়োডরেন্ট স্প্রে করবে...! অবলীলায় বলবে, তোর আফটার-শেভটার দারুণ গন্ধ, এটা আমি নিলাম...!

গলা ঝেড়ে অনুপম বলল, থাকুক তোর কাছে, কোনও এক সময়ে গিয়ে নিয়ে নেব।

কেয়া পাশ থেকে বলে উঠল, তুমি পায়ের ধুলো দেবে! অত সৌভাগ্য কি হবে আমাদের?

বউকে ইশারায় থামতে বলে রন্টু গলা নামাল, হ্যাঁরে, দাদা তোকে কিছু বলেছে?

কোন দাদা?

আমার দাদা, ঝন্টুবাবু।... ওর সঙ্গে তো মেজদার জোর বেধে গেছে।

তোদের কোনও ঝুটঝামেলায় আমি নেই। আমার বিরক্ত লাগে।

তা বললে তো চলবে না চাঁদু। তুমিও একটা ফ্ল্যাট বাগাচ্ছ!

প্লিজ ফুলদা, যা না কোথায় যাচ্ছিস।

তাড়া নেই গো। সামনেই যাব। কেয়া একখানা আহ্লাদি হাসি ছুড়ে দিল, তেকোনা পার্ক। ওর এক বন্ধুর দামড়া মেয়ের জন্মদিন।

কেয়াকে আদৌ পাত্তা না দিয়ে গাড়িতে বসল অনুপম। ব্যাক করে গ্যারেজে ঢোকাবে। দ্যাবাদেবী তবু দাঁড়িয়ে। ঈষৎ খর গলাতেই অনুপম বলল, কী হল? আরও কথা আছে নাকি?

কেয়া মিষ্টি করে হাসল। গলায় দরদ মাখিয়ে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁগো, তোমার বন্ধুর বউটিকে তো আর দেখি না!

এখন আসছে না। ব্যস্ত আছে।

বরের অসুখ নিয়ে?

এও জেনে গেছে? নিশ্চয়ই মেজদার রটনা। ভায়া মেজদা মেজবউদি, সেখান থেকে আর একজন...। পরচর্চা ছাড়া এদের কি আর কাজ নেই?

অনুপম রূঢ় স্বরে বলল, ঠিকই ধরেছ।

এতদিন লাগছে... খুব কঠিন রোগ বুঝি?

একটা বাক্যে কতগুলো যে প্রশ্ন লুকিয়ে! কেয়া বুঝি ঘ্রাণ পেতে চায়, অসুখটা সত্যি, না ভাঁওতা... সোহিনী-অনুপমের সম্পর্কটা আদৌ আছে কি না... বরের সঙ্গে সোহিনীর ঝামেলা বেধেছিল কি...!

এক ফুঁয়ে কেয়াকে নিভিয়ে দিল অনুপম। থমথমে মুখে বলল, জেনে করবেটা কী, অ্যাঁ?

সরাসরি ঠোক্করটা দিয়ে একটা বিজাতীয় পুলক অনুভব করল অনুপম। গাড়ি তুলল গ্যারেজে। হনহন ফ্ল্যাটে ঢুকে টের পেল মুখফোঁড় জবাব দেওয়ার তৃপ্তিটুকু আর নেই। বরং মেজাজ যেন আরও তিতকুটে। পণ্ডিতিয়ার বাড়িতে থাকতে থাকতে সেও যেন কেমন একটা হয়ে যাচ্ছে! কারও সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করা তো তার স্বভাব নয়!

নাকি অনুপমের মেজাজটাই আজ চঞ্চল? না হলে সোহিনীকে একবার জিজ্ঞেসও করল না কাল কখন তার গাড়িটা প্রয়োজন? ফোন করবে এখন? থাক, এখনও ভিজিটিং আওয়ার চলছে, রাত্তিরেই না হয়...

পোশাক বদলে একটা স্নান সারল অনুপম। তারপর এক কাপ কালো কফি বানিয়ে অভ্যেস মতো ই-মেল খুলেছে। কী কাণ্ড, আবার লীনার চিঠি! সপ্তাহে দ্বিতীয়বার! এমনটা তো ঘটে না!

চিঠিটা পড়ে অনুপম গুম। আগের পত্রে আভাস ছিল, এবার খোলাখুলি লিখেছে মেয়ে। মারিয়া আর জোহানের একেবারেই বনিবনা হচ্ছে না, প্রতি রাতে তুমুল ঝগড়া চলে দু'জনের, হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায়। স্বাভাবিক কারণে লীনা সন্ত্রস্ত। বাবার কাছে জানতে চায়, তার এখন কী করা উচিত।

চিঠির শেষটুকু বড্ড পীড়াদায়ক। লিভিং ইন হেল্ পাপা। কোয়াইট ইন আ ফিক্স। ডোন্নো হোয়াট টু ডু।

কী পরামর্শ দেবে অনুপম? মেয়েকে বলবে হস্টেলে গিয়ে বাস করো? নাকি লিখবে, আমি তো আছি রে, তোর ভয় কী, এখানে চলে আয়, এটাই তোর আসল বাড়ি...? কিন্তু মেয়ে আর পুঁচকেটি নেই, টিন-এজে পড়ল বলে। ও দেশ ছেড়ে এই শহরে তার পক্ষে কি মানিয়ে নেওয়া সম্ভব? রণবীর-সুনেত্রা তো চলে এসেছিল, মেয়ে কলকাতায় এমন মনমরা হয়ে পড়ল, বাধ্য হয়ে পাততাড়ি গুটিয়ে বেচারাদের আবার ছুটতে হল নিউ ইয়র্ক। অনুপমও কি মেয়ের জন্য ফের শিকাগোয়...? এখানে আর কীসের টান? সোহিনী তো তদ্গতচিত্তে স্বামীসেবায় আকণ্ঠ ডুবে, যেন সাবিত্রীকেও হার মানাবে! যমকে ঘেঁষতেই দেবে না ভাস্করের কাছাকাছি! এদিকে অনুপম যে...! কিন্তু অনুপমই তো সোহিনীকে বলেছিল, সে যেন লড়াইয়ের ময়দান থেকে সরে না আসে! কথাটা কি তবে অনুপম মন থেকে বলেনি?

জ্বালা ধরানো চিন্তা। অনুপম জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল। সোহিনী কিংবা লীনা, কাউকে নিয়েই ভেবে বুঝি লাভ নেই। অনুপমের অধিকারই নেই ভাবার। আঠেরো বছর বয়স অবধি লীনার ওপর মারিয়ারই ষোলো আনা হক, আইন মোতাবেক। অতএব অনুপমের মেয়েকে চাওয়া, না-চাওয়া তো নিতান্তই মূল্যহীন। আর মারিয়ার যা জেদ, মেয়েকে ছাড়লে তো।

কী যে করছে মারিয়া! অনুপম একটা হতাশ শ্বাস ফেলল। মেয়ের মুখ চেয়েও তো দ্বিতীয় বিয়েটায় খানিক মানিয়ে-গুছিয়ে চলতে পারত। ওফ্,

কত যে পাগলামি করেছে একসময়ে। মতের অমিল হল, তো ওমনি আছড়ে আছড়ে ডিশ ভাঙছে, গ্লাস ভাঙছে...। এবারকার মতো মারপিটটা করতে পারেনি অবশ্য। আহা রে, অনুপমের মেয়েটা খুব কষ্ট পাচ্ছে। খুউব।

মারিয়াকে দু'ছত্র লিখলে হয়। এখন তো অনুপম আর তত শত্রু নয়, তার সঙ্গে মেয়ের ব্যাপারে ঠান্ডা মাথায় আলোচনা করে...। থাক গে, ওতে আবার ঝালটা না মেয়ের ওপর পড়ে। বাবার কাছে কাঁদুনি গেয়েছে বলে। বুঝবেও না, মেয়ের কাছে বাবা ব্যাপারটা মোটেই ফেলনা নয়।

বরং দু'-চারটে দিন যাক। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে তারপর না হয় লীনা আর মারিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

মেলবক্স বন্ধ করে এবার অনুপমের কাজে বসার পালা। একখানা প্রশ্নপত্র বানাতে হবে। আজই করে আসা উচিত ছিল, হয়নি। যেভাবেই হোক কাল ডিপার্টমেন্টে পৌঁছোনো চাই। প্রশ্ন তৈরির হ্যাঙ্গাম আছে। বেশ কয়েকটা নতুন প্রবলেম দেওয়া দরকার, যাতে টোকাটুকির পরিমাণটা কমে।

কাজ চুকতে চুকতে গাঢ় হল সন্ধ্যা। বাইরে বৃষ্টি নেমেছে ঝমরঝম। আওয়াজটা কান পেতে একটুক্ষণ শুনল অনুপম। তারপর প্রেশার কুকারে খিচুড়ি বসিয়ে দিল। মশলা মাখানো পমফ্রেট মাছ বার করল ফ্রিজ থেকে। ভাজছে তেলে।

তখনই ফোন এল। সোহিনীর।

সোহিনীর স্বরে যেন অভিমান, তুমি চলে গেলে কেন?

যাইনি তো, বলতে গিয়েও অনুপম গিলে নিল। জিভে ছোট্ট মিথ্যে, হঠাৎ একটা দরকারি কাজ মনে পড়ল...

একটা ফোন করে দেবে তো। নেমে আমি তোমায় খুঁজছি, শেষে গাড়ি নেই দেখে বুঝলাম...। সোহিনী ক্ষণকাল নীরব থেকে বলল, কাল আসছ তো?

ক'টায় যেতে হবে?

সাড়ে আটটা। আমি লাউঞ্জে থাকব।

যদি চাও, তোমায় তুলে নিতে পারি।

না না, কষ্ট করে উলটোপথে আসবে কেন। আমার প্র্যাকটিস হয়ে গেছে। চলে যাব।

বেশ।

দেরি কোরো না, প্লিজ। তুমিও না থাকলে বড় হেল্‌পলেস ফিল করব।

অনুপম কি তরুণের পরিবর্ত? আস্তে করে অনুপম বলল, ডোন্ট ওরি। আমি টাইমেই পৌঁছোব। ...ভাস্করকে কেমন দেখলে?

একটু যেন অ্যাজিটেটেড। বাড়ি আসার জন্য খুব বায়না করছিল। ভুলিয়ে-ভালিয়ে শান্ত করেছি।

অনুপমের চোখে আবার সেই ছবি! সোহিনীকে আঁকড়ে ধরেছে ভাস্কর... সোহিনী সরতে পারছে না...!

নাকি সোহিনীই চাইছে না সরতে?

নিরুত্তেজ স্বরে অনুপম বলল, ভালই করেছ। রেস্ট নাও। ছাড়ছি।

রাতে খিচুড়িটা কেমন আলুনি আলুনি ঠেকল। মাছভাজাও যেন পোড়া পোড়া। খেয়ে উঠে অনুপম একটা সিগারেট ধরাল। এখনও বৃষ্টি পড়ছে। যান্ত্রিক লয়ে। শব্দটায় কোনও মাধুর্য নেই, কান দুটোকে বড় ক্লান্ত করে দেয়। গরমও যেন কমছে না, গুমোট গুমোট লাগছে।

সিগারেট নিভিয়ে হঠাৎই ল্যাপটপ খুলল অনুপম। ক্যান্সারের তথ্যপঞ্জিতে বোঝাই ওয়েবসাইটে ঝটিতি প্রবেশ করেছে। আগেও ঢুকেছে কয়েকবার, রোগ আর রোগীদের হালহকিকত খুঁজতে। আজ শুধু পরিসংখ্যান ঘাঁটছে। জীবন নয়, মৃত্যুর। একটা গবেষণাপত্রে এসে থামল আঙুল। দুশো চুরানব্বই জন ফুসফুস আক্রান্ত ফোর্থ স্টেজ ক্যান্সার পেশেন্টদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে একদল গবেষক। সাতানব্বই জন দ্বিতীয় দফার কেমোটাও পেরোতে পারেনি! ছ'টা কেমো শরীরে গ্রহণ করে দু'বছরের বেশি বেঁচেছে মাত্র সতেরো জন!

ভাস্কর কোন দলে পড়ে? সাতানব্বই? না সতেরো?

অনুপম দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। এই অনুপমকে তুই চিনিস অনুপম!

বারো

বিকেলে ম্যানেজারের চেম্বারে একটা মিটিং ছিল আজ। সোহিনীদের শাখায় আর এক দফা আধুনিকীকরণের কাজ আরম্ভ হচ্ছে, তাই নিয়ে খানিক কচকচানি। গ্রাহক পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটলে স্টাফদের কী কী করণীয়, তার

একটা লম্বা ফিরিস্তি আওড়াল শুভঙ্কর গুপ্ত। বেশিক্ষণ লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে বলে কেউ যদি কটু মন্তব্য করে, নো চটাচটি... কাউন্টার যেন কদাচ ফাঁকা না থাকে, সর্বদা মাথায় রাখতে হবে গ্রাহকরাই লক্ষ্মী... ইত্যাকার ছেঁদো উপদেশ। পরিশেষে এক কাপ চা, দুটো থিন অ্যারারুট বিস্কুট, এবং পূর্ণ সহযোগিতার আবেদন, ব্যস সভা সমাপ্ত।

একে একে বেরোচ্ছিল সবাই। টেবিলে ফিরতে ফিরতে সোহিনী বিরক্ত মুখে বলল, পাঁচটার সময়ে ডেকে এই ফাজলামির কোনও মানে হয়? অকারণে দেরি করিয়ে দিল!

মালবিকা চোখ নাচাল, মিটিং-এর আসল উদ্দেশ্যটা বুঝলি? ইনডাইরেক্টলি শোনাল, এখন যেন কেউ ছুটি-টুটি না নেয়।

সর্বনাশ। সোহিনীর মুখ পলকে আমসি, আমাকে হয়তো পরের উইকে আবার...। ওর থার্ড কেমোর সময় তো এসে গেল।

তোর কেস আলাদা। তোকে তো ছাড়তেই হবে। মালবিকা নিজের সিটে বসল। ব্যাগ গোছাতে গোছাতে বলল, তুই তা হলে তিন নম্বরটা করাচ্ছিস? বলছিলি যে, পিছিয়ে যেতে পারে!

সেই সম্ভাবনাই বেশি। তবু... ডাক্তারবাবু টেন্টেটিভ ডেট দিয়ে রেখেছেন।...

অনুশ্রী ব্যাগ কাঁধে সোহিনীর কাছেই আসছিল। মালবিকার টেবিলে ব্যাগটা নামিয়ে বলল, হ্যাঁরে, তোর হাজব্যান্ড এখন আছেন কেমন? প্রবলেমগুলো কমল?

কই আর। একদিন একটু বেটার, তো পরদিন তিনগুণ খারাপ। বমি বমি ভাবটা তো সারাক্ষণ। জল খেলেও এখন ওয়াক তোলে। পাতলা পাতলা ঝোল, হালকা স্টু, স্যুপ, কিচ্ছু হজম করতে পারছে না। খেতেই চায় না। একটা আতঙ্ক জন্মে গেছে, খেলেই বুঝি ডায়রিয়া হবে।

সেকেন্ড কেমোটা বোধহয় শরীর নিতে পারেনি রে।

তাই তো দেখছি। লাস্ট ব্লাড রিপোর্টটাও তো খারাপ। ডব্লুবিসি কাউন্ট মিনিমাম চার হাজার থাকার কথা। মেডিসিন-টেডিশিন পড়েও এখন ছাব্বিশশো। হিমোগ্লোবিন তো সাতে নেমেছে।

ডাক্তাররা কী বলছে?

ওষুধ দিয়েছে গাদাখানেক। তাদের অভিমত, সিম্পটমগুলো কন্ট্রোলে

আনতেই হবে। ওদিকে উলটো ভয়ও দেখিয়ে রাখছে। টাইমলি কেমো না হলে হয়তো মূল ডিজিজটা...। সোহিনী দু'দিকে মাথা নাড়ল, আমি আর ভাবতে পারছি না রে।

মালবিকা সোহিনীর পিঠে হাত রাখল, সময় যখন খারাপ চলে, এরকমই হয় রে। কিচ্ছু ঠিকঠাক থাকে না।

এ কথা সোহিনীর চেয়ে বেশি আর কে বোঝে দুনিয়ায়! জীবনটাই তো চটকে ঘ্যাঁট হয়ে যাচ্ছে। প্রথম কেমোর পর থেকেই যা চলছে...। ভাস্করকে হাসপাতাল থেকে এনে ভেবেছিল, এবার হয়তো ক'টা দিন হাঁপ জিরোতে পারবে। কোথায় কী, আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে বদলে গেল পরিস্থিতি। ধুম জ্বর, বমি, পেট খারাপ...। ডিহাইড্রেশানে এমন নেতিয়ে পড়ল, হাসপাতালে নিয়ে স্যালাইন দিতে হল। তারপর ক্রমে ক্রমে বিগড়োচ্ছে রক্তের হাল। শ্বেতকণিকা কমে গেল, হিমোগ্লোবিন নামছে...। তাও প্লেটলেট ব্লাড আর তাজা রক্ত দিয়ে কোনওমতে ঘাটতি পূরণ করা গিয়েছিল। দ্বিতীয় কেমোটাও হয়ে গেল মানে মানে। কিন্তু এবার যে কী হবে! পেটের গোলমাল তো যখন তখন। মাড়িতেও বিশ্রী ঘা হয়েছে। লেই লেই করে না দিলে কিচ্ছু মুখেই দিতে পারে না। দুর্বলতা এতই প্রকট, বাথরুমটা যাওয়ার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই। কাঁহাতক আর ছুটি খোয়ানো যায়, দিনের বেলার জন্য সোহিনীকে একজন নার্স রাখতেই হল। তাতেই বা কতটুকু ছাড়, সারারাত সোহিনীর কীভাবে যে কাটে! হঠাৎ হঠাৎ ধড়মড় বসে হ্যা হ্যা হাঁপায় ভাস্কর, বলে শ্বাস নিতে পারছি না... তক্ষুনি ওষুধ দাও, পিঠ ডলো, বুকে হাত বোলাও...। আধঘণ্টা পর পর বাথরুম পাবে, অথচ ইউরিনালে অনীহা। তাকে তখন ধরে ধরে নিয়ে চলো...। গলা শুকোচ্ছে অহরহ, জল চাই, আবার দু'ঢোক গিললেই মুখের সামনে গামলা এগিয়ে দাও...। ভাগ্যিস তেমন ঘেন্নাপিত্তি নেই সোহিনীর, নইলে কবে যে নিজেই বিছানায় পড়ে যেত।

তা এত বিশদ বর্ণনা কি সহকর্মীদের দেওয়া যায়? যেটুকু বলে, তাতেই যা আহা উহু-র বান ছোটে, সোহিনী কুঁকড়ে থাকে। সমবেদনাও কৃপা বলে মনে হয়। এই যে সোহিনীকে ক্যাশ থেকে সরিয়ে লোনে দেওয়া হল, ভার খানিকটা তো লাঘব হয়েছে, তবু এর জন্যেই যেন মরমে মরে থাকে সোহিনী। কবে যে সে ফের বুকভরে নিশ্বাস নিতে পারবে!

অফিস থেকে বেরোল সোহিনী। হাঁটছে অন্যমনস্ক পায়ে। ভাবার চেষ্টা

করল, বাড়ি ফেরার পথে আজ কী কী কাজ আছে। তুলোর একটা বড় প্যাকেট কিনতে হবে, ভাস্করের জন্য নরম দেখে একখানা টুথব্রাশ, ভাস্করের ঘুমের ওষুধ... আর কী যেন? আর কী যেন? হ্যাঁ, শাশুড়ি বলছিলেন বেদানা আনতে। বেদানার রস নাকি রক্ত বাড়ায়। বাজারেও ঢুকতে হবে একবার। বাড়িতে একজন শয্যা নিলে বাকি পেটগুলো তো বসে থাকে না, তাদের জোগাড়জাঁতিও তো করতে হয়। বাবা বলছিল, স্প্রিং চিকেন ভাস্করের হজম হলেও হতে পারে। তবে সেটি সর্বত্র মেলে কি? গড়িয়াহাট বাজারে নেমে খুঁজবে?

অটো ধরতে সোহিনী দাঁড়াল, ফুটপাথের ধার ঘেঁষে। কখন যেন পিছনে রূপক আর জয়দেব। রূপককে দেখলে সোহিনী কেমন যেন অসহজ বোধ করে ইদানীং। অফিসে যখনই সোহিনীর টেবিলে আসে, ওমনি মনে পড়ে রূপকের সিডিটা সম্পর্কে কিছু তো জানানো হল না! হয়তো রূপক জানতে চায়ই না, তবু সোহিনীর অমনটাই লাগে। চিন্তার এ এক বিচিত্র মতিগতি।

আলগা হেসে রূপক বলল, ম্যানেজারের লেকচার শুনলেন সোহিনীদি?

হুঁ।

এদিকে কোর ব্যাঙ্কিং হচ্ছে, ওদিকে পে-রিভিশনের নামটি নেই।

তা তোমরা স্ট্রাইক ডাকছ না কেন? একদিন তা হলে ছুটি পাই।

জয়দেব বলল, হবে, হবে। ডিসেম্বরে একটা বড় ঝাঁকুনি দেওয়ার চান্স আছে। টানা তিন দিন।

সোহিনীর মুখ ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তখন আমার ছুটির প্রয়োজন থাকবে তো? ঠোঁট টিপে বলল, ঝাঁকাও। ঝাঁকাও। যাতে ঝুলিতে কিছু পড়ে। অন্তত আমার পিএফ লোনটা যেন এক লপ্তে শোধ করে দিতে পারি।

আপনার সত্যি খুব খরচা যাচ্ছে সোহিনীদি।...এ অসুখ যেন শত্রুর বাড়িতেও না ঢোকে।

অসুখ কি কারও পারমিশান নিয়ে আসে ভাই? না কারও ইচ্ছে শোনে?

তা ঠিক। জয়দেব পলক ভাবল কী যেন, বলল, যদি কিছু মাইন্ড না করেন, একটা কথা বলব?

কী?

এন্টালিতে আমাদের পাড়ায় এক কবিরাজ আছেন। খুব নাম। লোকে বলে ধন্বন্তরি। যদি দাদার কাগজপত্রগুলো একটু জেরক্স করে দেন, সঙ্গে এখনকার

সমস্ত উপসর্গ... তা হলে একবার ওঁকে দেখাতে পারি। আপনাদের যেমন ট্রিটমেন্ট চলছে চলুক, সঙ্গে যদি ওঁর ওষুধও...বলা তো যায় না, কাজ হতেও তো পারে।

অন্য ধরনের চিকিৎসায় সোহিনীর তেমন আস্থা নেই। তবু মুখের ওপর না বলতে পারল না। মা সেদিন কোন এক সাধুবাবার মন্ত্রপূত কবচ পাঠাল, সেটাকেই কি সে প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছে? সে মনস্থির করেছে, ভাস্করের আরোগ্য কামনায় যে যা করতে চায়, কোনওটাতেই বাধা দেবে না। শাশুড়ি তো প্রতি শনি-মঙ্গলবার কালীঘাট ছুটছেন, সুষমার জিম্মায় সংসার ফেলে। কী ভক্তিভরে ছেলেকে প্রসাদী পেঁড়া খাওয়ান, যেন ওটি এক কুচি জিভে দিলেই ভাস্করের লাম্পগুলো মিলিয়ে যাবে—ওই যুক্তিহীন ক্রিয়াও তো সোহিনী নির্বিবাদে মেনে নিচ্ছে।

কেন মানছে? সোহিনী ভাস্করের মঙ্গল চায় বলে? ভাস্করকে সুস্থ দেখতে চায় বলে? হতে পারে। নাকি পরে যাতে তাকে কেউ কোনওভাবে দুষতে না পারে...? তাও হতে পারে। কোনটা যে সঠিক, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবার মতো ক্ষমতাও বুঝি এখন নেই সোহিনীর।

ঠোঁটে একটা ভাঙা হাসি টেনে সোহিনী বলল, বেশ তো, দেব। চেষ্টায় তো লোকসান নেই।

কালই আনছেন তা হলে?

জবাব দেওয়া হল না। একখানা অটো এসে দাঁড়িয়েছে। পিছনটা ভরতি, ড্রাইভারের পাশে আধঝোলা হয়ে বসল সোহিনী। দুপুরে আজ জোর বৃষ্টি নেমেছিল, রাস্তায় এখনও জায়গায় জায়গায় জল। বর্ষা এবার দেরিতে এল বটে, তবে শ্রাবণ যেন পুষিয়ে দিচ্ছে। গত সপ্তাহে একদিন তো পুরো শহর থইথই। আজ সে তুলনায় কিছুই নয়, তাও বেপরোয়া অটোর চাকায় ছিটকে ছিটকে যাচ্ছে জল, সোহিনীর সালোয়ারে কাদার ছিটে। নোংরা নোংরা দাগ।

গড়িয়াহাট বাজারও কাদায় কাদা। পা টিপে টিপে হাঁটছিল সোহিনী। যা যা চাইছিল, পেয়ে গেল ঘুরে ঘুরে। বাড়তির মধ্যে নিল গোটা চারেক শিঙিমাছ। কেটেকুটে, টুকরো করে। হড়হড়ে আঁশবিহীন শিঙি-মাগুর দেখলে সোহিনীর গা শিরশির করে। কিন্তু ওতেও নাকি রক্ত হয়। কর্নফ্লেক্স নেবে একটা? বাবা ছেলে দু'জনেই খেতে পারে। দুধে ভিজিয়ে ন্যাতা ন্যাতা করে দিলে ভাস্করের

গলা দিয়ে কি নামবে না? থাক, বোঝা বেশি ভারী হয়ে যাচ্ছে। কর্নফ্লেক্সটা নয় পাড়া থেকেই কিনবে।

বাকি পথটুকু আর অটো মিনিবাস নয়, ট্যাক্সি। শরীর জুড়ে ভয়ানক ক্লান্তি, বাস-অটোর গাদাগাদি আর সয় না। সিটে হেলান দিয়ে সোহিনী বাইরে তাকাল। দোকানপাট, গাড়িঘোড়া, মানুষজন, আলোআঁধার, সব মিলিয়ে পৃথিবীটা কী সুন্দর চলছে। শুধু সোহিনীর জীবনটাই কেমন উলটেপালটে গেল। জয়দেবের কথামতো আয়ুর্বেদিক করে দেখবে? যদি ফল মেলে! অনুপম বলে, দেহের প্রতিটি কোষই নাকি এক একটি জীবন। কোষের মধ্যে আছে জিন, সেই জিনেই লেখা থাকে কখন ভাঙবে কোষ, তৈরি হবে আর একটা নতুন প্রাণ। ক্যান্সারে আক্রান্ত কোষ এসব নিয়মশৃঙ্খলা কিছুই নাকি মানে না। অবিরাম বাড়িয়ে চলে সংখ্যা, নতুন কোষগুলোও হয় অপরিণত, জিনের লিখন ফোটার আগেই তারা বেড়ে যায় বহুগুণ। ফলে গড়ে ওঠে মাংসপিণ্ড, ছড়িয়ে যায় যত্রতত্র, স্বাভাবিক কোষগুলো ক্রমশ কোণঠাসা হতে থাকে। কোষের এই বিভাজন বন্ধ করতেই নাকি কেমোথেরাপি। কিন্তু গোটা শরীরের যেখানে যে কোষ ভাঙছে, তাকেই সে মেরে দেয়। স্বাভাবিক কোষ, অস্বাভাবিক কোষ, বাছার তার ক্ষমতা নেই। আর সেই কারণেই নাকি বেশ কিছু স্বাভাবিক কোষ মরে গিয়ে নানান বিপত্তি ঘটে। তাই না ভাস্করের শরীরে আজ এত গন্ডগোল। আয়ুর্বেদিক ওষুধ কি এই কোষ ভাঙাভাঙি রুখতে পারে না? কে জানে, হয়তো আরও ভালই পারবে। এই তো সেদিনই অনুপম কোথায় পড়েছে, এখন জৈব ওষুধেও নাকি চিকিৎসা হচ্ছে ক্যান্সারের। গাছগাছালি, শিকড়বাকড়ও তো এক ধরনের জৈব ওষুধ, নয় কি?

অনুপমকে আজ জিজ্ঞেস করতে হবে। যদি আসে অবশ্য। নিয়ম করে প্রতি সন্ধ্যায় আজকাল ঢুঁ মারতে পারে না অনুপম, কীসব গবেষণাপত্রের কাজ চলছে। তবে সপ্তাহে দু'-চার দিন ঘুরে যায়ই। বন্ধুর কাছেই বসে থাকে, সোহিনীর সঙ্গে দু'-চারটের বেশি কথা হয় না, তবু অনুপমের উপস্থিতিটুকু সোহিনীকে অনেকটা বল জোগায়। মনে হয়, আছে, আছে, অনুপম পাশে আছে।

ফ্ল্যাটে ফিরে সোহিনী দেখল ড্রয়িংহলে আজও গুচ্ছের লোক। প্রায়ই এখন কেউ না কেউ হাজিরা দিয়ে যাচ্ছে। অধিকাংশই ভাস্করের আত্মীয়স্বজন। দর্শন দিয়ে কর্তব্য সারে বোধহয়। আজ কেওড়াপুকুরের পিসি, আর পাটুলির জ্যাঠতুতো দাদা-বউদি। ভাস্বতীও বসে বনানীর পাশে।

জমায়েতে চিলতে হাসি বিলিয়ে সোহিনী ডাইনিং টেবিলে রাখল মালপত্রগুলো। বনানীও সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসেছে। জিনিসগুলো রাখছে যার যার জায়গায়। অনুচ্চ স্বরে সোহিনীকে বলল, তরুণ শিঙাড়া এনেছিল। এখনও গরম আছে। খাবে?

একটু পরে। আগে হাতমুখ ধুয়ে নিই।

চা-ও খাবে তো?

পরে।... সিস্টার চলে গেছে?

ড্রেস-টেস বদলে তো রেডি। বোধহয় তোমার জন্যেই ওয়েট করছে।

কারণটা সোহিনী জানে। চটপট কমন বাথরুমটায় ঢুকে হাতে-মুখে সাবান দিয়ে নিল। এখানে এক সেট ঘরোয়া সালোয়ার-কামিজও রাখা আছে, বদলে নিল কাদামাখা পোশাক। রোগীর কাছে যথাসম্ভব পরিচ্ছন্ন হয়েই যাওয়া উচিত। কাহিল শরীর সহজেই বাইরের জীবাণু টানে।

শোওয়ার ঘরে গিয়ে সোহিনী দেখল, তরুণ গল্প করছে কালো মতন রোগাসোগা নার্স মেয়েটির সঙ্গে। ভাস্কর পাশ ফিরে শুয়ে, একটু যেন কুঁকড়ে-মুকড়ে। মুখ দেওয়ালে ফেরানো।

ভুরুতে হালকা ভাঁজ নিয়ে ভ্যানিটিব্যাগ থেকে পার্স বার করল সোহিনী, আপনারা কতক্ষণ তরুণদা?

তোমার ননদ তো সেই দুপুর থেকে। আমি আধ ঘণ্টাটাক। তরুণ নার্স মেয়েটিকে দেখাল, ওকে বোধহয় আজ...

জানি। উইক্‌লি পেমেন্টটা দিতে হবে। সোহিনী এক গোছা একশো টাকার নোট মেয়েটিকে বাড়িয়ে দিয়েছে, দেখুন তো ভাই, ঠিক আছে কিনা।

নোট গুনে মেয়েটি ঘাড় নাড়ল, রসিদ সই করা আছে। টেবিলে।

সোহিনীর চোখ ভাস্করে। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, ওভাবে শুয়ে কেন? জ্বর এসেছে নাকি?

না, না। দাদা তো ওইভাবেই রয়েছেন। সেই বিকেল থেকে।

খেয়েছে ঠিকঠাক?

দুপুরে অতি সামান্য গলা ভাত। তাও মাসিমা অনেক কাকুতি-মিনতি করার পর।

বমি হয়নি তো?

তখন তো করেননি। তবে চারটে নাগাদ হরলিক্সের সঙ্গে বিস্কুট

খাইয়েছিলাম, সেটা পুরোটাই...। তারপর থেকে তো ঝিম মেরে পড়ে। মুখ ফেরাচ্ছেনই না মোটে। রাতের খাবারটা তো এখনও দেওয়া গেল না।

অর্থাৎ ঝক্কিটা সোহিনীকেই নিতে হবে। এখন বসে বসে... পোষায়?

মেয়েটি বলল, আমি তা হলে যাই?

আজ কিন্তু আপনি লেট করেছিলেন ভাই। প্লিজ টাইমটা মেনটেন করবেন। আমার অফিস থাকে, আপনার দেরি হলে আমি টেনশনে পড়ে যাই।

কিছু একটা বলতে গিয়েও যেন বলল না মেয়েটি। দু'-এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে গেছে।

তরুণ মুচকি হেসে বলল, তোমার তো বেশ উন্নতি হয়েছে! পট করে শুনিয়ে দিলে!

সোহিনী মলিন হাসল। রোগের সান্নিধ্যে থেকে তার যে কত বদল ঘটেছে, তরুণদা তার কতটুকু খবর রাখে!

চুপচাপ বিছানার ধারে এল সোহিনী। কোমল স্বরে ভাস্করকে ডাকল, কী গো, তাকাবে না?

সাড়া নেই।

স্যুপ আনব। খাবে?

টুঁ শব্দটি নেই।

তরুণ ফিসফিস করে বলল, চেপে যাও। সিস্টার বোধহয় বকেছে টকেছে। গোঁসা হয়েছে বাবুর। খানিক বাদে না হয়...

অগত্যা ড্রয়িংহলে এল সোহিনী। সঙ্গে তরুণ। কেওড়াপুকুরের পিসি উঠি উঠি করছিল, সোহিনীকে দেখে বসেছে ফের। ভারী দরদি গলায় বলল, আহা রে, বউটার চোখমুখ একেবারে বসে গেছে গো!

পাটুলির বউদি ওমনি পোঁ ধরেছে, বেচারার ধকলটা কী যাচ্ছে একবার ভাবুন। একাধারে সংসার, ওদিকে অফিস, সঙ্গে বর হাসপাতাল ডাক্তার...

বাবুনের জন্য বউ যা করছে, ভাবা যায় না গো। এমন প্রাণঢালা সেবা আমিও পারতাম কিনা সন্দেহ।

সত্যি, শয্যা নেওয়া রোগীর যত্ন কি যে সে কাজ! শ্বশুরমশাই তো সেরিব্রাল হয়ে মাত্র মাসখানেক ছিলেন, তাতেই আমার জিভ বেরোনোর দশা। আপনার ভাইপো তো তখনই বলত, কী করে পারছ...! এখন সোহিনীকে দেখে মাথা হেঁট হয়ে যায়।

পাটুলির দাদা বলল, একে বলে হৃদয়ের টান, বুঝলে। ওটা যদি থাকে, মানুষ সব পারে।

এধরনের পিঠ চাপড়ানো আদৌ বরদাস্ত হয় না সোহিনীর। তবু শুনতে হচ্ছে ইদানীং। লোকে বাড়ি বয়ে এসে বলে যাচ্ছে। সোহিনী নিঃশব্দে সরে গেল। ঢুকেছে ছেলের ঘরে। মাথা নিচু করে কী যেন করছে পাপান। বোধহয় অঙ্ক। সোহিনীর আজকাল ছেলেকে নিয়ে বসাই হয় না, ছেলে নিজের পড়াশোনা নিজেই সারে। খুব শান্ত হয়ে গেছে পাপান। এতালবেতাল বায়নাক্কা নেই, যখন তখন টিভি খোলে না, ঘরেই থাকে, খুটুরখাটুর করে নিজের মনে। বোঝাতে হয়নি, পাপান জানে বাড়িতে এখন গভীর সংকট। উচ্ছ্বাস হইচই এখন মানায় না।

সোহিনী ছেলের মাথায় হাত রাখল, কী রে, অঙ্ক পারছিস তো?

হচ্ছে। পাপান ঘাড় নাড়ল। নাক কুঁচকে বলল, ডেসিম্যালে একটু প্রবলেম।

দশমিক শেখাচ্ছে?

স্টার্ট হয়েছে।

তাই?

অঙ্ক বইটা হাতে নিল সোহিনী। দেখছে। সহজভাবেই শেখানো, তবে একটু বুঝিয়ে দিলে বোধহয় পাপানের সুবিধে হয়।

মিনিট পনেরো বুঝি ছেলেতে ডুবে ছিল সোহিনী, দরজায় ছায়া। বনানী। হাতে চা-শিঙাড়া।

কুণ্ঠিত স্বরে বনানী বলল, লোক ছিল বলে দিতে পারছিলাম না... খেয়ে নাও। শিঙাড়া চাটুতে গরম করে দিয়েছি।

বনানী আজকাল বুঝি একটু বেশিই খেয়াল রাখছে পুত্রবধূর। এ যেন এক ধরনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। রুগ্ণ ছেলের দেখাশোনা করার প্রতিদান। নাকি এ এক ধরনের অসহায়তা? অজান্তেই সোহিনীর ওপর একটা নির্ভরতা চলে আসছে বনানীর?

সোহিনী শুধু চা-টা নিয়ে বলল, শিঙাড়া থাক মা। আর ইচ্ছে করছে না।

সেই ভাল। ছেড়ে দাও। অম্বল হবে।

দিদিরাও চলে গেল?

ওরা বাবুনের ঘরে। বুলু বাবুনকে খাওয়ানোর চেষ্টা করছে। বনানী খানিক

ইতস্তত করে বলল, বুলু আজ থাকবে। ছেলে ছেড়ে ওরও একা একা লাগে, আমারও সারাটা দিন...

অর্ধসমাপ্ত বাক্যটা যেন চোরা হাহাকারের মতো বাতাসে ছড়িয়ে গেল। পাক খাচ্ছে। সোহিনীকেও ছুঁয়ে রইল একটুক্ষণ।

সোহিনী বলল, আজ কেন, দিদি ক'দিন থাকুক না। আপনারও একটা সঙ্গী হয়।...তরুণদা তো রোজই আসে, এখান থেকেই নয় রাতে খেয়ে যাবে।

আমিও তাই বলছিলাম। তরুণের তো শুধু সকালটাই অসুবিধে। তা সে না হয় একবেলা একটু কষ্ট করে...

কথার মাঝেই ভাস্বতীর প্রবেশ। দু'হাত নেড়ে বলল, ওফ্, কিছুতেই পারলাম না...! দেখো, একমাত্র হয়তো তোমার হাতেই...

বনানী তাড়াতাড়ি বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, যাও সোহিনী। পাপানকে আমরা দেখছি।

কাপ রান্নাঘরে রেখে সোহিনী ফের ভাস্করের কাছে এল। বসেছে ভাস্কর। হাঁটু মুড়ে। কুঁজো হয়ে। কী রোগা যে হয়ে গেল ভাস্কর! মাত্র দু'মাস আগে যে দেখেছে, সেও বুঝি চিনতে পারবে না। কণ্ঠার হাড় উঁচু, পাঁজরগুলো যেন গোনা যায়। প্রায় সব চুল ঝরে গিয়ে বয়স লাফিয়ে বিশ বছর বেড়ে গেছে। হাত দুটো সরু সরু। কাঠি কাঠি।

টেবিল থেকে চিকেন স্যুপের বাটিটা নিয়ে সোহিনী বিছানায় বসল। চামচে স্যুপ তুলে ভাস্করের মুখের সামনে ধরেছে, দেখি, হাঁ করো।

ঠোঁট টিপে আছে ভাস্কর। চোখ দুটো তার অদ্ভুত রকমের ঘোলাটে। শীতল।

হল কী তোমার? এমন করছ কেন?

জবাব নেই।

এমন করলে শরীর টিকবে কী করে?

এবার ঘঙঘঙে স্বর বেজেছে, টিকে কী হবে? আবার তো হাসপাতালে পুরে বিষ ঢালবে।

ওহ্, এক্ষুনি তো তোমায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না।...নাও, এবার মুখ খোলো।

একটু বুঝি কাজ হল। গিলছে ভাস্কর। ধীরে, অতি ধীরে। প্রায় অর্ধেকটা খেয়ে নিল। আর সম্ভব নয়, বাটি সরিয়ে রাখল সোহিনী। তোয়ালেতে মুখ মুছিয়ে দিচ্ছে।

তখনই ভাস্বতীর গলা কানে এল। মা আর মেয়ের কথা চলছে ডাইনিং টেবিলে। তেমন উচ্চস্বরে নয়, তবে শোনা যায়।

ভাস্বতী বলল, ও বাবুনের জন্য সত্যিই জান লড়িয়ে দিয়েছে। অথচ তুমি বলতে, ও নাকি বাবুনকে ভালবাসে না।

আমার ভুল ভেঙেছে রে বুলু। বিপদের ক্ষণেই তো মানুষের আসল রূপটা দেখা যায়। গোটা রাত জেগে জেগে ও যেভাবে বাবুনকে সামলায়...

বাবুন যদি বাঁচে, সোহিনীর জোরেই বাঁচবে।

শুনতে শুনতে সোহিনীর বুক উত্তাল সহসা। এ সব কী বলে মা-মেয়ে? ভাস্করের এত কাছের মানুষ এরা, এখনও টের পায়নি, সোহিনী শুধু কর্তব্য করছে! ভেতরে যে কী চরম ফাঁকি, তা কি কেউ দেখতে পাচ্ছে না? এও কি সম্ভব?

নাকি গোপন সোহিনীকে এরা চিনে ফেলেছে? ওই প্রশংসা হয়তো নিছকই শ্লেষ! হয়তো ইচ্ছে করেই সোহিনীর শ্রবণে ধাক্কা দেওয়া!

ভাস্কর ফের মুখ ঘুরিয়ে শুয়েছে। দম বন্ধ করে ভেতরের ঝড়টাকে সামলাল সোহিনী। নিজেকে যথাসম্ভব স্থিত করে ঘর ছাড়ল।

পাপানের আহার শেষ। টেবিলে বাকিদের খাবার-দাবার সাজাচ্ছে বনানী। ভাস্বতী সাহায্য করছে হাতে হাতে। বনানী ডাকল জামাইকে। তরুণ সোফায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিল, উঠে ডাইনিং টেবিলে এল।

ভাস্বতী সোহিনীকে বলল, তুমি দাঁড়িয়ে কেন? বসে পড়ো।

হ্যাঁ, বসি। ...তোমরা?

সবাই খাব।

সরল মেনু। রুটি, আলুচচ্চড়ি, মুরগির ঝোল, স্যালাড। পাতে শসা-পেঁয়াজ নিয়ে তরুণ বলল, আজ বাবুনের অন্‌কোলজিস্টকে মিট করেছিলাম। উনি একটা সাজেশন দিলেন।

সোহিনী চোখ তুলল, কী?

বলছিলেন, ওরাল মেডিসিনে তো বাবুন তেমন রেসপন্ড করছে না... ব্লাড কাউন্ট বেটার করতে হলে... যাতে ডব্লুবিসি, হিমোগ্লোবিন বাড়ে... একবার হসপিটালে দিলে ভাল হত। আবার একবার প্লেটলেট আর হোল ব্লাড দিয়ে কতটা কী হয় উনি দেখতে চান। রেজাল্ট যদি আশাপ্রদ লাগে, মোটামুটি টাইমলি থার্ড কেমোটা করা যাবে। প্রয়োজন বুঝলে কেমো স্টার্ট করার আগে আর একবার ব্লাড দেবে।

কিন্তু এখন আবার ওকে হসপিটালে...? যেরকম শেকি হয়ে গেছে...!

বুঝতে পারছি। ...নইলে যে কেমোটাও অনির্দিষ্টকাল পিছিয়ে যাচ্ছে! সেটাও তো খুব কাজের কথা নয়। সেকেন্ড কেমোর পর এক্স-রে তো দেখলে... শ্যাডো এবার মোটেই কমেনি। সুতরাং কেমোর সাইকল্ ব্রেক করাটাও ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে যাবে। ...সেকেন্ড কেমোর পরে একুশ দিন কবে যেন হচ্ছে? নেক্সট ফ্রাইডে না?

হ্যাঁ...। সোহিনী একবার বনানীর পাংশু মুখখানা দেখে নিল। দ্বিধান্বিত গলায় বলল, তবু তরুণদা...এখনও ওর এতরকম সাইড এফেক্ট...বড় কষ্ট পাচ্ছে...

মাঝে আট-ন'টা দিন তো রইল। ওষুধ যা চলছে... কমতেও তো পারে।

তাও ধরুন, রক্ত দিয়েও তেমন ইমপ্রুভ করল না... প্লাস, যদি সাইড এফেক্টগুলোও থেকে যায়...

তখন হবে না কেমো। আমরা আরও অপেক্ষা করব। তা বলে ট্রিটমেন্টটা প্রপার ছন্দে রাখার ট্রাই কেন নেব না? ব্লাড নিতে তো বাবুনের কোনও কষ্ট নেই।

তরুণের প্রস্তাব অযৌক্তিক নয়। তবু যেন সোহিনী সাহস পাচ্ছিল না। অনুপম কেন যে আজই এল না? অনুপমের মতামতটা নিলে হত।

তরুণ কি অন্তর্যামী? মুরগির ঝোলে রুটি ডুবিয়ে ফস করে বসে বসল, একবার অনুপমের সঙ্গে ডিসকাস করে নেবে নাকি?

সোহিনী চমকে তাকাল, কেন?

কারণ অনুপম অনেক কিছু জানে। বোঝে। ওর অ্যাডভাইসটা নিশ্চয়ই মূল্যবান।

সূক্ষ্ম একটা বিদ্রূপের কাঁটা অনুভব করল কি সোহিনী? একই সঙ্গে অনুপমের পরামর্শ নেওয়ায় একটা বেড়িও পড়ল, নয় কি?

সোহিনী গম্ভীর মুখে বলল, না না, আপনি যা ভাল বোঝেন, তাই করুন।

বলছ? ...তা হলে কাল-পরশু-তরশু বাদ দাও। শুক্রবার ওকে অ্যাডমিট করি।

তিন দিন দেরি কেন? ভাস্বতী অবাক, বাবুনের ব্লাড তো 'এ' পজিটিভ। রক্ত পাওয়ার তো অসুবিধে নেই।

আহা, কাল ছোটমামার কাজ না? বৃহস্পতিবার নিয়মভঙ্গ। আমি শ্মশানযাত্রী, দু'দিনই আমায় থাকতে হবে। ...তুমিও তো যাচ্ছ।

হুম্। কাল দুপুরে একবার ঘুরে আসব। ভাস্বতীকে একটু যেন দুঃখী দেখাল, সত্যি, তোমার ছোটমামার কী লাক! এই সবে উইল করলেন... দুটো মাসও বোধহয় কাটেনি... সজ্ঞানে চলে গেলেন।

আগেই বুঝেছিল আয়ু ফুরিয়েছে।

বোঝা যায়?

কী জানি। হয়তো যার ফুরোয়, সে সিগনাল পায়। তরুণ হো হো হাসছে, আমি অবশ্য তেমন কিছু এখনও পাইনি।

ননদ-নন্দাইয়ের লঘু আলাপচারিতা সেভাবে শুনছিল না সোহিনী। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করল। আঁচিয়ে নিয়ে একবার দেখে এল পাপানকে। ঘুমিয়ে পড়েছে। টেবিল খালি হতে এঁটো বাসনগুলো নামাল রান্নাঘরে। বনানী খাবার তুলছে। ভাস্বতী টেবিল মুছে নিল।

তরুণ জুতোমোজা পরে তৈরি। সোহিনীকে বলল, তা হলে ওই কথাই রইল? পাক্কা? বাবুনকে তুমি মেন্টালি রেডি করে ফেলো।

সোহিনী কলের পুতুলের মতো ঘাড় নাড়ল, দেখছি।

বলা সহজ, কিন্তু কাজটা যে কী দুরূহ! ভাস্করকে ওষুধ খাওয়াল সোহিনী, বাথরুম নিয়ে গেল, কিন্তু কিছুতেই কথাটা মুখে আনতে পারল না। বিজবিজে একটা চিন্তা নিয়ে শুয়েছে।

মাঝরাতে হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি। জানলা দিয়ে ছাট আসছে। খাট থেকে নেমে কাচের পাল্লাগুলো টেনে দিল সোহিনী। ঘরে এখন জোরালো রাতবাতি। হলদেটে আলোয় নিরীক্ষণ করল ভাস্করকে। স্লিপিং পিল পড়েছে, চক্ষু দুটি নিমীলিত, তবে ঘুমোচ্ছে কিনা ঠাহর হয় না। হয়তো এখনই উঠে বলবে...!

সোহিনীর তেষ্টা পাচ্ছিল। ড্রয়িংহলে এসে ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা জল ঢালল গলায়। গোটা ফ্ল্যাট আশ্চর্যরকম নিঃসাড়, বৃষ্টির ধ্বনি ছাড়া কিছুই কানে আসে না। একা একা দাঁড়িয়ে থাকলে কেমন গা ছমছম করে।

পায়ে পায়ে সোহিনী ব্যালকনির দরজায়। বাইরে বুঝি আরও গভীর নিশুতি। জলকণার পরদার ওপারে চরাচর আবছা। অপার্থিব। সামনের রাস্তায় পথবাতির বিচ্ছুরণ কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে। তীব্র তরঙ্গ হেনে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। ক্ষণপরে বিকট শব্দে কড়কড়াৎ বাজ।

কান চেপে দৌড়ে ঘরে ফিরল সোহিনী। যা ভেবেছিল তাই, ভাস্কর হাঁটু জড়িয়ে বসে। থুতনি প্রায় বুকে ঠেকেছে।

সোহিনী নরম গলায় বলল, আওয়াজে ঘুম চটকে গেল তো! নাও, আবার শুয়ে পড়ো।

ভাস্কর ক্ষীণ স্বরে বলল, আমার গলা ব্যথা করছে।

এ আবার কী নতুন উপসর্গ? অ্যাদ্দিন তো মাড়িতে...

হচ্ছে। ভাস্কর শিশুর মতো বলল, হলে আমি কী করব!

টিউবলাইট জ্বালিয়ে সোহিনী ড্রয়ার থেকে পেনসিল টর্চ বার করল। ভাস্করের থুতনি ঠেলল সামান্য, দেখি আবার কী বাধালে। হাঁ করো।

মুখগহ্বরে আলো ঘুরিয়ে পর্যবেক্ষণ করল সোহিনী। উঁহু, মাড়িতে একটা ঘা ছাড়া কিছুই তো দৃশ্যমান নয়। টর্চ সরিয়ে বলল, ধুৎ, ও তোমার মনের ভুল। কিচ্ছু নেই।

তুমি সব সময়ে আমার কষ্ট কমিয়ে কমিয়ে দেখতে চাও। বলছি, আছে। বলছি, আছে।

অস্থিরভাবে মাথা ঝাঁকাচ্ছে ভাস্কর। সোহিনী একটু ঘাবড়ে গেল। কাঁধে হাত রেখে বলল, আচ্ছা, আচ্ছা, মানছি। কিন্তু এগুলো তো সারাতে হবে।

আমি কীভাবে সারাব?

তোমার রক্তের জোর কমে গেছে। একটু রক্ত বাড়লেই দেখবে সব প্রবলেম চলে গেছে।

মিথ্যে কথা। আমার আর এসব সারবে না।

তা বললে চলে! তোমাকে না বাঁচতে হবে!

আমার বাঁচা মরা কোনও কিছুর আর ইচ্ছে নেই। শুধু দয়া করে আমায় আর ওই বিষটা দিয়ো না।

ঠিক আছে, তাই হবে। তুমি না চাইলে আর কেমো নয়। কিন্তু শরীরে রক্ত তো নিতেই হবে।

অকস্মাৎ যেন বিস্ফোরণ ঘটল। ভাস্করের ভাঙা ভাঙা গলা আছড়ে পড়েছে, ও, তুমি আমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কেমো দিতে চাও? ...আমি জানি, আমি জানি, তুমি কোনওদিন আমায় সহ্য করতে পারোনি। ঘেন্না করো। ঘেন্না করো। যাকে চাও, সে এখন এসে গেছে তো... তাই তুমি এখন

আমাকে দগ্ধে দগ্ধে মারবে। সব বুঝি। সব বুঝি। আমি তোমাদের পথের কাঁটা। টেনে হিঁচড়ে যেভাবে হোক আমাকে উপড়ে ফেলতে চাইছ...

সোহিনী নিস্পন্দ। সোহিনী পাথর। মনের কোন অন্ধ কুঠুরিতে সন্দেহটা পুষে রেখেছিল ভাস্কর!

সোহিনীর হাত থেকে টর্চটা পড়ে গেল। কাচ চুরমার।

তেরো

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রবেশ করেই অনুপমের মনে হল, হাওয়া আজ অন্যরকম। বাতাসে যেন বারুদের ঘ্রাণ।

অনুমানটা ভুল নয়। গাড়ি পার্ক করতে করতে অনুপমের নজরে পড়ল, অফিস বিল্ডিং-এর সামনে পুলিশ ভ্যান। চতুর্দিক পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। শিরস্ত্রাণ চাপিয়ে, ঢাল-লাঠি-বন্দুক নিয়ে যত্রতত্র টহল দিচ্ছে উর্দিধারীরা। নিজেদের বিভাগের দোতলা বাড়িটায় পৌঁছোনোর আগেই কান ফাটিয়ে বোমার আওয়াজ, সঙ্গে চিৎকার, কোলাহল, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটাছুটি করছে তরুণ-তরুণীর দল। এরপর কি বুঝতে বাকি থাকে কী ঘটছে!

অনুপমের মেজাজটা দড়কচা মেরে গেল। নিত্যি নিত্যি ছাত্রদের এই মারপিট কি সহ্য করা যায়? কী নিয়ে আজ বাধল? এখন তো ছাত্র ইউনিয়নের ইলেকশনও নেই! নতুন ছেলেমেয়ে ভর্তির সময়ে গোলযোগ খানিক হয়েছিল, তবে সেও তো থেমে গেছে! আজকাল অবশ্য ইস্যু লাগে না, যে-কোনও সামান্য বিবাদই হাতাহাতি মারামারির পর্যায়ে যায়। কে যে কোত্থেকে আনে ঈশ্বরই জানেন, বোমা সর্বদাই মজুত। সংঘর্ষ বাধলেই মুড়িমিছরির মতো পড়তে থাকে। এদেশে লেখাপড়ার যে কী হবে? কলেজ ইউনিভার্সিটিতে এবার তালা ঝুলিয়ে দিলেই হয়।

বিরস মনে নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিল অনুপম, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। প্যাসেজে চার-পাঁচটা ছেলেমেয়ে নিজেদের মধ্যে ভারী উত্তেজিতভাবে কী যেন বলাবলি করছে। একটা ঢ্যাঙা মতো ঝাঁকড়াচুলো লাফিয়ে লাফিয়ে নামল দোতলা থেকে। তির বেগে ছুটছিল, হঠাৎ থমকে থেমে দু'হাত নেড়ে ডাকছে বন্ধুদের।

ছেলেটা শুভম না?

অনুপম গলা উঁচিয়ে ডাকল, এই, শোনো।

শুভম জটলাটার পানে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে এসেছে, কিছু বলছিলেন স্যার?

হচ্ছেটা কী, অ্যাঁ? কী নিয়ে লাগালে আজ?

আমরা লাগাইনি স্যার। তিনটে ফ্রেশার মেয়েকে টিজ্ করছিল, আমাদের ছেলেরা প্রোটেস্ট করতেই ওরা অ্যাটাক করেছে। বোমায় আমাদের চারজন ইনজিয়োওর্ড হয়েছে স্যার। একজন হসপিটালে। ...আজ ওদের ছাড়া নেই।

কী করবে? ওদের আটটাকে ফেলবে? তারপর ওরা তোমাদের ষোলোটাকে? তোমরা ওদের বত্রিশটাকে?

দু'-এক সেকেন্ড বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল শুভম। তারপর চুল ঝাঁকিয়ে বলল, আপনি জানেন না স্যার, ওরা আমাদের ক্যাম্পাসটাকে গন্দা করে দিচ্ছে।

কিন্তু তেড়ে যে যাচ্ছ... পুলিশ তো ধরবে।

ফুঃ। পুলিশের সেই ক্ষমতা আছে নাকি? একজনকে ছুঁয়ে দেখুক। অ্যাইসান কড়কান খাওয়াব...! অদূরে পরপর কয়েকটা বোমা ফাটল, সঙ্গে সঙ্গে শুভমের চোখ চঞ্চল। খানিকটা যেন উদভ্রান্ত স্বরে বলল, চলি স্যার। কমরেডদের পাশে দাঁড়াতে হবে। প্রতিরোধ গড়তে হবে।

কোনওক্রমে কথা ক'টা বলে দৌড়েছে শুভম। পলক ফেলার আগেই দৃষ্টিসীমার বাইরে। জটলাটাও যাচ্ছে পিছন পিছন।

খানিকক্ষণ হতভম্ব দাঁড়িয়ে থেকে অনুপম বিচিত্র মুখভঙ্গি করল। বিরক্তি, বিস্ময়, অসহায়তা আর হতাশা মেশানো। তালা খুলে ঢুকল নিজের কক্ষে। চেয়ারে বসে দু'হাত ছড়িয়ে দিয়েছে। আজ ক্লাস হওয়ার তো কোনও সুযোগই নেই, গোটা দিনটাই বেকার। কী করবে এখন? প্রমিত রায় নামে একটি ছেলে সম্প্রতি তার অধীনে গবেষণা শুরু করেছে, কাজের একটা খসড়া মতন দিয়ে গেছে ছেলেটা, সেটা নিয়ে বসবে? যা ধুন্ধুমার কাণ্ড চলছে, ঠান্ডা মাথায় কাজে মনোযোগী হওয়া কঠিন। খসড়াটা নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবে? কিন্তু বাড়ি গিয়ে কাগজপত্র নিয়ে বসে গেলে আর বেরোতে ইচ্ছে করে না। তা ছাড়া বিকেলে আবার তো যাদবপুরেই আসবে, সোহিনীদের বাড়ি। আজ ভাস্করকে

রক্ত দিতে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, বিকেলে ভাস্করের চলে আসার কথা, গিয়ে একবার বেচারাকে তো দেখে আসতেই হয়।

পরশু সোহিনীদের বাড়ি গিয়েছিল অনুপম, তখনই রক্ত দেওয়ার কথাটা শুনল। তার আগের দিন ফোন করেছিল সোহিনী, অনুপমকে অবশ্য তখন বলেনি। যাক গে, ব্যাপারটা সোহিনীর, যদি সে অনুপমকে জানানোর প্রয়োজন না মনে করে, অনুপমের কীই বা করার আছে! তবে ভাস্করকে বারবার এভাবে টানাহেঁচড়া করাটা কি ঠিক? দিন দশেক পর একবারই ভরতি করে, রক্ত-টক্ত দিয়ে, তৃতীয় দফার কেমোটা কি সেরে নেওয়া যেত না?

সোহিনীদের প্ল্যানটা বোধহয় ভাস্করেরও মনঃপূত নয়। মুখে অবশ্য কিছু বলছিল না ভাস্কর, তবে পরশু একদম চুপ মেরে ছিল। একটু যেন বেশিই নিশ্চুপ। ফোর্থ স্টেজ ক্যান্সার রোগীর দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার তিনটে উদাহরণ শোনাল অনুপম, তবু ভাস্করের যেন কোনও প্রতিক্রিয়াই হল না। এত কীসের নিরাসক্তি? বাঁচার স্পৃহা আছে নিশ্চয়ই। নইলে কেমোথেরাপির প্রসঙ্গ যখন আলতোভাবে একবার তুলল অনুপম, অন্য দিনের মতো ভাস্কর হাঁউমাউ তো করলো না!

সোহিনীকে পরশু বড় উদাস দেখাচ্ছিল। যেন দূরমনস্ক। অনুপম যখন ভাস্করের ঘরে, একবার মাত্র ঢুকেই বেরিয়ে গেল। অনুপম যখন রওনা দিচ্ছে, সোহিনী ব্যালকনিতে। ডেকে জিজ্ঞেস করা হয়নি, আজ সকালে অনুপম গাড়ি নিয়ে যাবে কিনা। সোহিনী কি তাতে আহত হয়েছে? কী যে করে অনুপম, আগ বাড়িয়ে কিছু করতে যাওয়াও তো ঝকমারি। ভাস্করের তরুণদাটি এমন চিমটি কাটা কথা বলে! যেন বিপদের সময়ে সোহিনীর পাশে দাঁড়ানোর পিছনে অনুপমের কোনও উদ্দেশ্য আছে! তরুণ ব্যানার্জি লোকটা মহা ধূর্ত। একটা কিছু আঁচ করেছে বোধহয়।

দরজায় টকটক আওয়াজ। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খাটো পরদা সরিয়ে একটা গোল মুখ, আসতে পারি স্যার?

অনুপম নড়ে বসল, আসুন।

খর্বকায় পুরুষ্টু লোকটা ব্রিফকেস হাতে ভেতরে এল। বছর পঞ্চাশ বয়স, ভরাশ্রাবণেও স্যুটেড-বুটেড, কালো ডাই করা চুল চকচক করছে। মাথা ঝুঁকিয়ে অনুপমকে অভিবাদন জানাল লোকটা। সপ্রতিভ স্বরে বলল, আমার নাম অজিত সাহা। কনস্ট্রাকশনের ব্যাবসা করি।

ও। কোনও অর্ডারের ব্যাপারে এসেছেন বুঝি? কিন্তু আমি তো ডিপার্টমেন্টাল হেড নই। ওসব ডক্টর চাকলাদার দেখেন।

আমি কোনও অফিশিয়াল কাজে আসিনি স্যার। একটা পারসোনাল প্রয়োজন ছিল।

আমার সঙ্গে?

হ্যাঁ স্যার। বসব?

লোকটার কথায় বিশেষ ঘোরপ্যাঁচ নেই। মিনিট তিনেকের মধ্যে অনুপমকে সমঝে দিল, সে এক বিল্ডিং প্রোমোটার। এবং অনুপমদের পণ্ডিতিয়ার বাড়িটা ভেঙে ফ্ল্যাট বানাতে ইচ্ছুক।

শুনে আদৌ প্রীত হল না অনুপম। ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, তা আপনি এখানে কেন? মাই পারসোনাল ম্যাটার শুড নট বি ডিস্‌কাসড্ হিয়ার।

তা হলে কোথায় মিট করব বলুন? আপনাদের বাড়িতে তো দেখা করা সম্ভব নয়। প্রচুর বখেড়া আছে। আমি আপনার সঙ্গে একটু নিরিবিলিতে বসতে চাই।

অ। অনুপম ভুরু কুঁচকে দু'-এক সেকেন্ড ভাবল। তারপর হেসে ফেলেছে, আপনার উৎসাহ তো কম নয়! এই হট্টগোলের মাঝে হাজির হয়েছেন!

গন্ডগোলের ভয় পেলে আমাদের চলে না স্যার। যে লাইনে কাজ... বোমা ছুরি পিস্তল, অনেক কিছুই সামলাতে হয়।

অজিত সাহা লোকটিকে মন্দ লাগছিল না অনুপমের। হেসেই বলল, বুঝেছি। আপনি অকুতোভয়। এবার আপনার আগমনের হেতুটা শোনা যাক।

বাহ্, ভারী সুন্দর ভাষায় বললেন তো! অজিতের চোখে মুগ্ধতা, আপনার দাদারাও যদি আপনার মতো হতেন...

দেখুন, আমি কারও নিন্দেমন্দ শোনা পছন্দ করি না। কাজের কথা বলুন।

প্রথমেই তা হলে একটা ইনফর্মেশন দিই স্যার। আপনি জানেন না... সম্ভবত জানতেও পারবেন না... কামিং সানডের পরের সানডে আপনার দাদারা, এবং দুই দিদি আমার অফিসে বসছেন।

তাই বুঝি? তা আমার কাছে লুকোনো হবে কেন?

কারণ আপনার দাদাদের ধারণা, এসব ঝুটঝামেলায় আপনি নিজেকে জড়াতে চান না। এবং তাঁরা যে ডিডই করুন, আপনি তাতে এগ্রি করবেন।

ঠিকই তো বলে। আমি ওসব বুঝিও না, ওসব নিয়ে মাথাও ঘামাই না।

খুবই স্বাভাবিক। আপনি জ্ঞানীগুণী মানুষ...বিদ্যাচর্চায় ডুবে থাকেন... বৈষয়িক ব্যাপারে কেন নিজেকে জড়াবেন! কিন্তু স্যার, আমি যে আপনাকে চাই।

মানে?

আমার আন্তরিক বাসনা, ওই মিটিংটিতে আপনি পায়ের ধুলো দিন।

তাতে লাভ?

আছে। একা আমার নয়, সবার। অজিত সাহা গলা ঝাড়ল, আসলে হয়েছে কী...আপনার দিদি-দাদারা প্রত্যেকেই স্বাধীন মতবিশিষ্ট নাগরিক। আপনার মতো বিদ্বান মানুষকে আর কী বলব, আপনি তো জানেনই... আমাদের এই গণতান্ত্রিক দেশে প্রতিটি স্বাধীন নাগরিকের মত ভিন্ন ভিন্ন হয়।...এটা খুবই ভাল। অতি স্বাস্থ্যকর লক্ষণ। তবে আমার মতো একজন ব্যাবসাদারের পক্ষে অতগুলো মতকে একসঙ্গে গুরুত্ব দেওয়া তো সম্ভব হবে না।

বুঝেছি। প্রত্যেকেরই চাহিদা আলাদা।

কী সহজে আপনি ধরে ফেললেন স্যার!

কিন্তু আমি মিটিং-এ থাকলে তফাত কী হবে?

বিস্তর ফারাক হবে স্যার। আপনার দাদারা আপনাকে খুব সমীহ করেন। আপনার মতো লার্নেড ম্যান যদি উপস্থিত থাকেন, আর আমার প্রস্তাবগুলো যদি ন্যায্য হয়... তা হলে আপনার খাতিরেই সবাই সেটা মেনে নেবেন। আপনার মতো ব্যক্তির সামনে তাঁরা তো অন্যায্য কিছু বলতে পারবেন না।

বটে? তা হলে আপনার প্রস্তাবগুলো তো আমার আগে শুনে রাখা দরকার।

ফ্ল্যাট তো স্যার সবার মিলবেই। আপনার দিদিদেরও। হয়তো দু'-পাঁচ-দশ স্কোয়্যার ফুট ছোট-বড় হবে...

তাতে কী আসে যায়! আমি না হয় ছোট ফ্ল্যাটই নেব।

এটা তো আপনার মহানুভবতা। সবাই তো আপনার মতো উদার নন। আমি... ফ্ল্যাটের সঙ্গে টাকাও দেব। তবে ওঁরা যা চাইছেন, ততটা বোধহয় পারব না। কারণ বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট বানাতে না হোক এইটিন্থ মান্থ টাইম...।

এই দেড় বছর আপনাদের পাঁচ ভাইকে তো কোথাও থাকার বন্দোবস্ত করে দিতে হবে। আর আপনার মতো রেসপেক্টেবল মানুষকে তো যে সে জায়গায় রাখা যায় না... এতেও তো একটা খরচ আছে স্যার। না হোক, পার হেড দেড়-দু'লাখ। ওই টাকাটুকুই যা কনসেশন চাই। ...ভেবে দেখুন স্যার, সাত-সাতখানা ফ্ল্যাট আপনাদের দেওয়ার পর আমার আর কত প্রফিট থাকে? আপনার যা ব্রেন...ডেটা দিয়ে দিলে দু'মিনিটে হিসেব কষে নেবেন।

অজিতের সরল স্তুতিবাক্যগুলো দিব্যি উপভোগ করছিল অনুপম। সে যে তার দাদাদের চেয়ে অনেকটাই পৃথক গোত্রের, এটা বুঝতে পেরেছে বলে অজিতকে যেন আরও বেশি করে পছন্দ হচ্ছিল। স্মিত মুখে অনুপম বলল, বেশ তো আপনি তা হলে দাদাদের বলুন, যেন আমাকে প্রেজেন্ট থাকতে অনুরোধ জানায়।

অবশ্যই। অবশ্যই। আপনি সেধে যাবেন কেন? আপনার সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে। শুধু ডেট আর টাইমটা খেয়াল রাখবেন। এই সানডের পরের সানডে। সকাল দশটা।

অজিত বিদায় নেওয়ার পর অনুপম মিনিট কয়েক চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রইল। তৃপ্ত মুখে। গুণ আছে লোকটার, তিতকুটে মেজাজটা চমৎকার ঝরঝরে করে দিল। এবার নিশ্চয়ই কাজে বসা যায়।

প্রমিতের খসড়ার প্রিন্ট-আউটখানা সবে খুলেছে অনুপম, ওমনি মোবাইল বাজছে। ও প্রান্তে বিভাগীয় সহকর্মী ডক্টর বিজন ঘোষ রায়।

হ্যাঁ বিজনবাবু, বলুন? দিনটা তো পুরো বরবাদ, তাই না?

সে আর বলতে! ...আপনি নাকি এখনও ডিপার্টমেন্টে?

হ্যাঁ, আমার রুমে। কেন?

ওফ্, আপনাদের মতো ভালমানুষদের নিয়ে হয়েছে মুশকিল। ...করছেনটা কী?

একটা ড্রাফ্‌ট দেখছি...

রাখুন আপনার পড়াশোনা। এত আত্মভোলা হলে চলে! ...শুনেছেন কি, স্টুডেন্টদের একটা গ্রুপ মেন গেট অবরোধ করতে চলেছে? টিচিং, ননটিচিং, কোনও স্টাফকে তারা বেরোতে দেবে না।

তাই?

ইয়েস স্যার। আপনি সাতেপাঁচে থাকেন না, তাই বলছি... ইমিডিয়েটলি

লিভ দ্য ক্যাম্পাস। আমি রেজিস্ট্রারের চেম্বারে। আমিও দু'মিনিটে বেরিয়ে পড়ছি।

থ্যাঙ্কস। থ্যাঙ্কস ফর দ্য নিউজ।

ঝটপট খসড়াটা বগলে নিয়ে অনুপম ঘরে তালা মারল। বিল্ডিং-এর বাইরে এসে দেখল, পুলিশের গাড়ি আর নেই, ছাত্রছাত্রীরা জমছে একে একে। লম্বা লম্বা পা ফেলে ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসল অনুপম। তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে গেটের বাইরে।

প্রায় বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে, আবার মোবাইলে কুককুক। গাড়ি চালাতে চালাতে ফোন ধরে না অনুপম, তুলে মনিটরটা দেখল ঝলক।

এবং দেখেই চমকেছে। সোহিনী!

হঠাৎ সোহিনী? এই দুপুরবেলায়? সোহিনীর তো এখন হাসপাতালে থাকার কথা...!

মগজে ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের বিপবিপ। ঝটাকসে গাড়ি সাইড করল অনুপম। ফোন কানে চেপেছে, হঠাৎ আমায় স্মরণ? এই মেঘলা দিনে।

ওপারে সোহিনীর কম্পিত স্বর, সব বুঝি শেষ হয়ে গেল অনুপম।

হোয়াট?

ব্লাড নেওয়ার সময়ে হঠাৎ কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট... সঙ্গে সঙ্গেই বোধহয়...। সোহিনীর গলা বুজে এল, ওরা অবশ্য তাও আইসিসিইউ-তে নিয়ে গেল। বলল, ভেন্টিলেশনে রাখছে...

ক্ষণিকের জন্য অনুপমের স্বর নেই। তারপর অস্ফুটে বলল, আর কেউ আছে ওখানে?

শুধু তরুণদা।

আমি আসছি। এক্ষুনি।

ফোন অফ করে স্টিয়ারিং-এ নিশ্চল বসে আছে অনুপম। ভাস্করের মৃত্যুটা তো অবধারিতই ছিল। আজ, না হলে কাল, নয়তো তার ক'দিন পরে...। কিন্তু কী আশ্চর্য, কণামাত্র দুঃখ হচ্ছে না কেন? বরং যেন এক অপরূপ মুক্তির বাতাস...!

অনুপম থরথর কেঁপে উঠল। ছি, ছি, তার বন্ধু এক্ষুনি মারা গেছে, আর সে কিনা...! সভ্য, সুশিক্ষিত, মহানুভব অনুপম আদতে তবে এক নরাধম? কীটস্য কীট? যে কিনা বন্ধুর স্ত্রী হস্তগত হচ্ছে, এই চিন্তায় বন্ধুর মৃত্যুতে পুলকিত হয়?

অনুপমের ভীষণ কান্না পাচ্ছিল। নিজের ক্ষুদ্রতায়। হীনতায়।

যদি সোহিনী কোনওদিন এই মুহূর্তটাকে জানতে পারে? যদি পারে...!

চোদ্দ

পুজোর পর থেকে এবার বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। সকাল-সন্ধে হিম পড়ছে রীতিমাফিক। শীতঋতু এখনও খানিক দূরে, তবু যেন বাতাসে তার পদধ্বনি শোনা যায়।

অফিস থেকে বেরিয়ে আজ পণ্ডিতিয়ায় এল সোহিনী। আসে মাঝে মাঝে। নীল কুয়াশামাখা অন্ধকার অন্ধকার গলিটুকু পেরিয়ে অনুপমের দরজায় এসেছে। কলিংবেলে হাত রাখল। ঘণ্টি বাজিয়ে ঘড়ি দেখল একবার।

পাল্লা খুলতে অনুপমের যেন একটু সময় লাগল। শান্ত গলায় ডাকল, এসো।

শয়নকক্ষে নয়, বাইরের ঘরে বসেছে সোহিনী। ভ্যানিটিব্যাগ সেন্টারটেবিলে রেখে জিজ্ঞেস করল, আজ কেমন? জ্বরটা ছেড়েছে?

সিজন চেঞ্জের জ্বর ক'দিনই বা থাকে!

রাতে শোওয়ার সময়ে এবার ফ্যানটা কমিয়ে দিয়ো।

আলতো হাসল অনুপম। জিজ্ঞেস করল, কফি খাবে?

ইচ্ছে করছে না।

প্রত্যাশিত উত্তর। অনুপম জোর করল না। বসেছে দূরের সোফায়।

ঘরে টিউবলাইটের ফ্যাকাশে সাদা আলো। সোহিনীর চোখ ঘুরল আলোটায়, টিউবটায় তেমন জ্যোতি নেই।

হুম্। বদলাতে হবে।

পালটাবে? বাড়ি তো ছেড়েই দিচ্ছ।

এখনও দেরি আছে। ভাঙাভাঙি শুরু তো সেই জানুয়ারিতে।

কোথায় থাকবে কিছু ঠিক হল?

সাহা তো বলছে পাড়াতেই দেবে। দেখি কী করা যায়। অনুপম মাটির দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবল। চোখ তুলে বলল, ভাবছি ক্রিসমাসে একবার শিকাগো ঘুরে আসি।

মেয়ে ডাকছে বুঝি?

ঠিক সেভাবে নয়। তবে লাস্ট মেলটাতে মনে হল, গেলে হয়তো খুশিই হবে।

মেয়ে তো এখন মায়ের সঙ্গেই...

হ্যাঁ। আলাদা অ্যাপার্টমেন্টে উঠে গেছে। জোহানের সঙ্গে ডিভোর্সটা পেয়ে গেলে ওরা সম্ভবত অন্য জায়গায় চলে যাবে। সামটাইম ইন নেক্সট ইয়ার। বোধহয় দেশটাই ছাড়ছে।

তাই নাকি? কোথায় যাবে?

কানাডা। কুইবেক সিটি। মারিয়া আদতে ফ্রেঞ্চ তো, কানাডার ওই সাইডটা ওর খুব প্রিয়। আমাকেও কয়েকবার বলেছিল, চলো ফ্রেঞ্চ কানাডায় শিফ্‌ট করি।

এখনও তো যেতে পারো।

অনুপম আবার একটু হাসল। বড় অনুজ্জ্বল হাসি। বোধহয় একটা শ্বাসও পড়ল। কিছুই বলছে না আর। সোহিনীও নীরব। এমনই হয় আজকাল। কথা থাকে না। কথা খুঁজতে হয়।

সোফায় হেলান দিয়ে বসেছে অনুপম। ডান হাতের চেটোয় ঘষছে বাঁ হাত, আপন মনে। হঠাৎই বলল, তা শ্রীমান পাপানের লেখাপড়া চলছে কেমন?

এই তো... গিয়ে ওকে নিয়ে বসব। কিছু একটা বলতে পেরে সোহিনী যেন স্বস্তি পেল, সামনেই তো পরীক্ষা।

পাপানের জন্য একটা টিউটর দেখো এবার। তুমি আর কত...

যদ্দিন পারছি, করি। তারপর না হয়...

ছেলেটাকে অনেকদিন দেখিনি।

গেলেই পারো।

যাব।

আবার কথারা নিখোঁজ। আবার নিঃশব্দ বসে থাকা। বাতাসের শব্দ শোনা। ফ্যাকাশে আলোর তাপটুকু নেওয়া।

হঠাৎ সোহিনী বলল, মা'র হাঁটুর অপারেশনটা হচ্ছে।

কবে?

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি।

হুঁ। সার্জারি শীতে করানোই ভাল। তাড়াতাড়ি হিলিং হয়।

ফের ঘর জুড়ে দুঃসহ স্তব্ধতা। এক-দু' মিনিট। নাকি অনন্তকাল? অন্তত সোহিনীর তো তাই মনে হচ্ছিল। অনুচ্চ স্বরে সোহিনী বলল, এবার তা হলে উঠি?

অনুপম সোজা হয়ে বসল, যাবে?

আমার দেরি হলে মা খুব উতলা হয়ে পড়েন। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন ব্যালকনিতে।

মাসিমার শরীর ঠিক আছে? কী একটা চোখের প্রবলেম হচ্ছে বলছিলে...

হুঁ। দেখাতে হবে। ছানি পড়ছে বোধহয়। সোহিনী ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়াল। এক পা গিয়েই থমকেছে। চেন খুলে অনুপমের দরজার চাবিটা বার করল। ম্লান হেসে বলল, এটা রাখো। প্রায়ই ভাবি দিয়ে যাব, ভুলে যাই।

টেবিলেই থাক।

চাবিটা নামিয়ে দিয়ে সোহিনী পায়ে পায়ে দরজায়। অনুপমও এসেছে সঙ্গে। পাল্লাটা ধরে বলল, তুমি কিন্তু বেশ রোগা হয়ে গেছ সোহিনী।

তাই? হবে হয়তো। ...যাই।

বলেও কে জানে কেন একটুক্ষণ অপেক্ষা করল সোহিনী। আগে এই সময় অনুপম বলত, যাই নয়, বলো আসি।

এখন আর বলে না অনুপম। সোহিনীও কি শুনতে চায়?

অনুপম আর সোহিনীর মাঝে এখন এক ছায়ার প্রাচীর। একজন মৃত মানুষ। যার অবয়বই নেই, তাকে অতিক্রম করা যায় কি?

সোহিনী জানে না। অনুপমও না।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের জন্ম ভাগলপুরে, ২৫ পৌষ ১৩৫৬ (১০ জানুয়ারি, ১৯৫০)। স্কুল ও কলেজ জীবন কেটেছে দক্ষিণ কলকাতায়। কলেজে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বিবাহিত জীবনের শুরু। আবার কলেজে পড়তে পড়তেই চাকরিজীবনে প্রবেশ। বহু ধরনের বিচিত্র চাকরির পর এখন সরকারি অফিসারের পদ থেকে স্বেচ্ছা-অবসর নিয়েছেন। ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করতেন। তবে লেখালেখিতে মনোযোগী হয়েছেন সত্তর দশকের শেষ ভাগ থেকে। নারীদের একজন হয়ে তাদের নিজস্ব জগতের যন্ত্রণা, সমস্যা আর উপলব্ধির কথা লিখতে আগ্রহী তিনি। সুচিত্রার লেখাতে বারবারই ঘুরে-ফিরে আসে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের আত্মিক দিক, নানান জটিলতা। এ যাবৎ প্রকাশিত তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'কাছের মানুষ' বৃহত্তম রচনা। নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। 'দহন' উপন্যাসের জন্য কর্নাটকের শাশ্বতী সংস্থা থেকে পেয়েছেন নন্‌জনাগুড়ু থিরুমালাম্বা জাতীয় পুরস্কার ১৯৯৬। অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে আছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবনমোহিনী পদক, শরৎ সাহিত্য পুরস্কার, দ্বিজেন্দ্রলাল পুরস্কার, শৈলজানন্দ পুরস্কার, তারাশঙ্কর পুরস্কার, কথা পুরস্কার, সাহিত্যসেতু পুরস্কার প্রভৃতি।

.....

প্রচ্ছদ সুব্রত চৌধুরী

বিদেশে বিয়ে ভেঙে যায় অনুপমের। অধ্যাপনা শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভাস্করের স্ত্রী সোহিনীর সঙ্গে গড়ে ওঠে তার বিশেষ অন্তরঙ্গতা। একসময় তারা সিদ্ধান্ত নেয় একত্রে বাকি জীবন কাটাবার। এই সময় জানা যায়, ভাস্কর ক্যানসারে আক্রান্ত। কী হবে সোহিনী-অনুপমের সম্পর্ক? ভাস্করের মৃত্যু কি কোনও মুক্তি আনবে সোহিনীর জীবনে?

9 788177 569735

গহিন হৃদয় • সুচিত্রা ভট্টাচার্য